ADMINISTRATIVE REFORM

নির্বাচিত সরকার এবং জাতীয় সংসদ কর্তৃক দেশের ভবিষ্যত উন্নয়ন নীতিমালা নির্ধারণ ও বিরাজমান সমস্যাবলী সমাধান সহায়তা-দানকল্পে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে—

পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন টাস্ক ফোর্সের প্রতিবেদনসমূহের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ।

Administration Training Centre Library

সূচীপত্র

বিষয় ঃ	পৃষ্ঠা
ভূমিকা ঃ	১
টাস্ক ফোর্স প্রণীত প্রতিবেদনসমূহের নির্বাহী সার–সংক্ষেপ ঃ	
১। জাতীয় অর্থনীতির ব্যবস্থাপনাঃ নীতিমালার সংস্কার ও সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা	৫
২। কৃষি উৎপাদন কৌশল	১১
৩। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রক্রিয়া পরিকল্পনা ঃ একটি মূল্যায়ন	২৫
৪। ভূমি নীতি	৩০
৫। দারিদ্র্য দূরীকরণ	৩৩
৬। শিল্প নীতি	৩৬
৭। বেসরকারী খাতের ভূমিকা	৪৩
৮। বাংলাদেশের সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন	৫১
৯। ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের ভূমিকা ও উন্নয়ন কৌশল	৬০
১০। নগরায়নে সামাজিক প্রভাব	৭৪
১১। বিকেন্দ্রীকরণ	৮২
১২। শক্তি সেক্টর উন্নয়ন	৯১
১৩। পরিবহন সেক্টর	১০৯
১৪। পরিবেশ	১১২
১৫। স্বনির্ভরতা অর্জন	১২৪
১৬। অসরকারী সংগঠনসমূহ (এন, জি, ও)	১২৮
১৭। উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা	১৩৩
১৮। বৈদেশিক বিনিয়োগ নীতি	১৪১

বিষয় ঃ		পৃষ্ঠা
১৯।	উন্নয়ন প্রশাসন	১৪৪
২০।	খাদ্য নীতি	১৪৮
২১।	যমুনা বহুমুখী সেতু	১৫২
২২।	উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কঃ ইস্যুসমূহ ও অভিমত	১৫৬
২৩।	প্রযুক্তি	১৬০
২৪।	জনসংখ্যানীতি	১৬৯
২৫।	উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা	১৭৪
২৬।	সরকারী পর্যায়ে দূর্নীতি	১৭৯
২৭।	বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের সদ্ব্যবহার	১৮৪
২৮।	অর্থ খাত সংস্কার	১৮৬

ভূমিকা

'টাস্ক ফোর্স'সমূহের গঠন ঃ

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহ্‌মদের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই পরিকল্পনা কমিশন নব নির্বাচিত জাতীয় সংসদের সদস্য এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক গঠিতব্য সরকারের আশু বিবেচনার জন্য উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিকল্প সমাধানসমূহ চিহ্নিতকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সরকার এবং জাতীয় সংসদ কর্তৃক আলোচনার জন্য উন্নয়নের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার্থে ২৯টি 'টাস্ক ফোর্স' গঠন করা হয়। সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন, উন্নয়নে অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ এবং জাতীয় অর্থনীতির দীর্ঘস্থায়ী ও স্বনির্ভর উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের জন্য বিকল্প নীতিমালাসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হইবে।

নতুন নির্বাচিত সরকার এবং জাতীয় সংসদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নীতিমালা প্রণয়ন কার্য্যক্রমকে সহায়তার লক্ষ্যে সরকারের ভিতরে এবং বাহিরে কর্মরত বাংলাদেশী প্রতিভাবান বিশেষজ্ঞদের সম্পূর্ণ নির্দলীয় এবং স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে সেবা প্রদানের জন্য 'টাস্ক ফোর্স'সমূহ গঠন করা হয়। এই 'টাস্ক ফোর্স'সমূহের প্রতিবেদনগুলি জাতীয় সংসদে নব নির্বাচিত সকল রাজনৈতিক দল এবং দেশের জনগণের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য প্রণয়ন করা হয়, যাহাতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির বিষয়ে সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং সমস্যাসমূহ সমাধানের বিষয়ে ব্যাপক আলোচনায় উৎসাহিত করা যায়।

'টাস্ক ফোর্স'সমূহের আহবায়ক এবং সদস্যদের নাম সম্বলিত তালিকা প্রতিটি সার–সংক্ষেপের সহিত প্রদত্ত হইয়াছে। এই তালিকা হইতে এই কাজ সম্পাদনের জন্য গৃহীত কার্য্যাবলীর ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য এবং টাস্ক ফোর্সের সদস্যদের অভিজ্ঞতা ও মতামতের বিভিন্নতা সম্বন্ধেও সম্যক ধারণা পাওয়া যাইবে। টাস্ক ফোর্সে সরকারী কর্মকর্তা, পেশাজীবী, বিশেষজ্ঞ, ব্যবসায়ী ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্মরত বিভিন্ন মতামতের প্রতিনিধিত্বকারী ২৫০ জনেরও বেশী অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাহাতে ভবিষ্যৎ নীতি প্রণয়নকারীগণ সকল ধরণের মতামত ও বিকল্প নীতিমালা সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারেন।

ইহা ব্যতীত অনেক বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ যাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা সত্বেও টাস্ক ফোর্সে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই তাহাদিগকেও টাস্ক ফোর্সের নিকট সুপারিশমালা প্রেরণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। ইহার ফলে সংশ্লিষ্ট টাস্ক ফোর্সের প্রতিবেদনগুলিতে আরও বিস্তৃত মতামত প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

টাস্ক ফোর্সের উদ্দেশ্যাবলীঃ

টাস্ক ফোর্সগুলির কাজের সুনির্দিষ্ট কোন শর্তাবলী ঠিক করিয়া দেওয়া হয় নাই। কাজ শুরু করার আগেই আমি প্রতিটি টাস্ক ফোর্সের সহিত পৃথক পৃথকভাবে আলোচনায় মিলিত হই। দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল ঘোষিত এবং ধারাবাহিকভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহের উন্নয়ন কৌশলের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ তিনটি উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হইবার কথা আমি তাহাদের জানাই। এই উদ্দেশ্যগুলি হইতেছেঃ

১। দারিদ্র্য বিমোচন,

২। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অধিকতর স্বনির্ভরতা অর্জন; এবং

৩। স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রক্রিয়াকে সুনিশ্চিতকরণ।

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার ঢাকা

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার জন্য একটি চতুর্থ দিক নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট কয়েকটি টাস্ক ফোর্সের জন্য স্থির করা হয়। বিশদভাবে কাজের শর্তাবলী প্রস্তুত করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রতিটি টাস্ক ফোর্সকে প্রদান করা হয়। তাহারা তাহাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার, সম্ভাব্য প্রতিকারমূলক প্রক্রিয়া ও বিকল্প নীতিমালাসমূহ চিহ্নিত করিবেন বলিয়া ঠিক করা হয়। টাস্ক ফোর্সগুলিকে আমি পরামর্শ প্রদান করি যে, প্রথমে তাহারা তাহাদের নিজ নিজ বিষয়ে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ উন্নতি বিধানের উপর আলোকপাত করিবেন। তাহারা সমাধানের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং বিকল্প নীতিমালার সুপারিশ করিবেন যেগুলি নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিগণের জন্য তাহাদের নিজস্ব নীতিমালা নির্ধারণের সুযোগ সৃষ্টি করিবে। দেশের উন্নয়নে আন্তরিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে কোন গণতান্ত্রিক সরকার যাহাতে টাস্ক ফোর্সগুলির সুপারিশমালায় দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য উপরে বর্ণিত ৪টি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনকল্পে উদ্বুদ্ধ হইয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারে সেই জন্য আমি উপদেশ দিয়াছি। আমি নিজে প্রায় সব কয়টি প্রতিবেদন পাঠ করিয়া দেখিয়াছি যে, সেইগুলি বাস্তবসম্মত উপদেশপূর্ণ এবং ইহাদের অনেকগুলি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে বাস্তবায়ন করা যাইতে পারে।

'টাস্ক ফোর্স'সমূহের অবদানঃ

'টাস্ক ফোর্স'সমূহের প্রতিবেদন প্রণয়ন মধ্য–ফেব্রুয়ারীর মধ্যে শেষ করিবার প্রচেষ্টা লওয়া হয় যাহাতে এইগুলি মার্চ, ১৯৯১ এর প্রথমেই নব নির্বাচিত জাতীয় সংসদ এবং জনগণের নিকট উপস্থাপন করা যায়। বাস্তবে সকল টাস্ক ফোর্স এই নির্ধারিত সময় সূচী রক্ষা করিতে পারে নাই। ৭ই মার্চের মধ্যে ২৯টি টাস্ক ফোর্স প্রতিবেদনের ২৩টি পাওয়া গিয়াছে, ইহা ছাড়া বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর একটি বিশেষ প্রতিবেদনও পরিকল্পনা কমিশনে পাওয়া গিয়াছে। সর্বশেষ পর্যায়ে বিলম্বে প্রাপ্ত আরো ৪টি প্রতিবেদনসহ মোট ২৮টি প্রতিবেদন এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হইয়াছে।

'টাস্ক ফোর্স'সমূহের প্রতিবেদনগুলি প্রত্যাশার চাইতেও অনেক উঁচু মানের। দেশের প্রয়োজনে সাড়া দিয়া টাস্ক ফোর্সের সদস্যগণ যথাসাধ্য তাহাদের মেধা/দক্ষতার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। কোনরূপ পুরস্কার বা প্রতিদানের প্রত্যাশা ছাড়াই তাহারা স্বেচ্ছায় দীর্ঘ সময় নিরলস পরিশ্রম করিয়াছেন। তাহাদের কাজের প্রেরণা ছিল শুধুমাত্র গভীর দেশপ্রেম এবং নব উন্মেষিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সংরক্ষণে অবদানের অঙ্গীকার। টাস্ক ফোর্সের অনেক সদস্য প্রতিবেদন সম্পন্ন করিবার জন্য নিজস্ব অফিস, যানবাহন ও অন্যান্য আনুষংগিক সহায়তা প্রদান করিয়াছে। কয়েকটি টাস্ক ফোর্সের কার্য্য সম্পাদনে পরিকল্পনা কমিশনও কিছু আনুষংগিক সহায়তা প্রদান করিয়াছে।

ছয় হইতে আট সপ্তাহের মধ্যে 'টাস্ক ফোর্স' সমূহ কর্তৃক সম্পাদিত কার্য্যের পরিমাণ এবং গুণগত মান বাংলাদেশের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। যদি এই কাজ বিদেশী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সম্পাদন করানো হইত তাহা হইলে বাংলাদেশের অন্ততপক্ষে কয়েক মিলিয়ন ডলার ব্যয় হইত। 'টাস্ক ফোর্স' কর্তৃক সম্পাদিত এই কাজ দেশে এবং বিদেশে ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে দেশের উন্নয়নের জন্য নীতিমালা নির্ধারণে স্বদেশী বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট পেশাগত দক্ষতা রহিয়াছে। এই সকল দক্ষ বিশেষজ্ঞদেরকে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান এবং উদ্বুদ্ধ করা হইলে তাঁহারা প্রয়োজনের মুহূর্তে দেশের কল্যাণমুখী কাজে অংশগ্রহণ করিতে আগ্রহী হইবেন।

টাস্ক ফোর্সগুলির কার্য্য সম্পাদনে পরিকল্পনা কমিশনের কোন ধ্যানধারণা যাহাতে প্রভাব বিস্তার না করিতে পারে সেইজন্য পরিকল্পনা কমিশন টাস্ক ফোর্সগুলি কর্তৃক পেশকৃত প্রতিবেদনগুলির মধ্যে কোন প্রকার সমন্বয় সাধন করা হইতেও বিরত থাকে। সেইজন্য টাস্ক ফোর্স কর্তৃক সম্পাদিত প্রতিবেদনগুলি চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিকল্প নহে বরং ইহাতে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্যে ন্যূনতম করণীয় বিষয়গুলির উল্লেখ রহিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, টাস্ক ফোর্সগুলির প্রতিবেদনগুলিতে তাহাদের প্রণেতাগণের মতামতই প্রতিফলিত হইয়াছে, এইগুলি অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার, পরিকল্পনা কমিশন অথবা পরিকল্পনা উপদেষ্টার মতামত নহে।

সরকারী এবং বেসরকারী উভয় খাতে কর্মরত বিভিন্ন পেশা এবং বৃত্তির প্রায় দুইশত পঞ্চাশ জন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে উনত্রিশটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে তাহাদের স্ব স্ব মতামত ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করিলে স্বভাবতঃই নানা ধরণের মত প্রকাশিত হইতে বাধ্য যাহার সবগুলির সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা না থাকাও অস্বাভাবিক নহে।

বস্তুতঃ বিভিন্ন টাস্ক ফোর্সের প্রতিবেদন ইহার সদস্যগণের সামগ্রিক মতৈক্য এবং অনেক ক্ষেত্রেই দেশের জনগণের মতামত প্রতিফলিত হইয়াছে। তবু অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন প্রতিবেদনের কিছু কিছু অভিমত বিভিন্ন তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মতামত তথা প্রতিষ্ঠিত কারিগরী ধ্যানধারণার পরিপন্থী বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারে।

এখন এই সকল টাস্ক ফোর্স কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনগুলিতে সন্নিবেশিত বিভিন্ন ধ্যানধারণা এবং তথ্যের সুষ্ঠু ব্যবহার করিবার দায়িত্ব হইতেছে নির্বাচিত সরকারের। এই ক্ষেত্রে তাহারা প্রতিবেদনসমূহের যে সকল অংশ গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবায়নযোগ্য বলিয়া মনে করেন সেইগুলির জন্য তাহাদের নিজস্ব নীতিমালার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করিতে পারেন। এই প্রতিবেদনগুলি সরকারের বাইরে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণের নিকটও প্রাপ্য হওয়া উচিত যাহাতে সংসদের কার্যক্রমে তাহারা এইগুলি ব্যবহার করিতে পারেন। বস্তুতঃ উন্নয়ন সমস্যা সম্পর্কে তথ্য ভিত্তিক আলোচনা বিস্তারের লক্ষ্যে এই প্রতিবেদনগুলির বক্তব্য জনগণের কাছেও প্রচারিত হওয়া উচিত।

এই সকল প্রতিবেদন দেশের নীতি নির্ধারক এবং জনপ্রতিনিধিদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ যাহা তাহাদিগকে প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা তথ্য সমৃদ্ধ থাকিতে সহায়তা প্রদান করিবে। বস্তুতঃ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বজায় রাখা এবং অর্থনীতিকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য তথ্যাভিজ্ঞ সরকার, জাতীয় সংসদ এবং সর্বোপরি ওয়াকিবহাল নির্বাচকমন্ডলী তথা দেশের জনগণ অপরিহার্য।

টাস্ক ফোর্সগুলির বক্তব্য বাংলাদেশের জনগণের জন্য আশার সঞ্চার করিবে। এইগুলি পাঠে বুঝা যায় যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ অসমাধানযোগ্য নয় এবং সমস্যগুলির সম্ভাব্য সমাধান নিরূপণ ও ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা ঠিক করার জন্য আমাদের নিজস্ব যোগ্যতা রহিয়াছে। এই সমস্ত সমাধান বৈদেশিক সম্পদের অত্যধিক ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল নয় বরং দেশীয় সম্পদ, দক্ষতা ও মূলধনের অধিকতর উৎপাদনশীল ব্যবহারের মাধ্যমেই সম্ভব। প্রয়োজন হইতেছে বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃত্বের যাহার মধ্যে থাকিবে বাংলাদেশের সুদীর্ঘকাল যাবৎ দুর্দশাক্লিষ্ট জনগণের জন্য আমাদের নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে অঙ্গীকার ও ঐক্যমত।

(অধ্যাপক রেহমান সোবহান)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের
দায়িত্বে নিয়োজিত
রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা।

তারিখঃ ঢাকা, ১০ই মার্চ, ১৯৯১ইং

টাস্ক ফোর্স ঃ জাতীয় অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা ঃ নীতিমালার সংস্কার ও সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহ্‌মুদ	অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	আহবায়ক
২।	ডঃ সালাহ উদ্দিন আহমেদ	পরামর্শক, পরিকল্পনা কমিশন।	সমন্বয়কারী
৩।	জনাব মাহবুবুর রহমান	ডেপুটি গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক।	সদস্য
৪।	**ডঃ এ, কে**, এম, মশিউর রহমান	অতিরিক্ত সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।	ঐ
৫।	ডঃ তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী	যুগ্ম-সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়।	ঐ
৬।	জনাব এ, এম, শামসুল হক	বিভাগীয় প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন।	ঐ
৭।	ডঃ সুলতান হাফিজ রহমান	বি, আই, ডি, এস।	ঐ
৮।	ডঃ ওমর হায়দার চৌধুরী	বি, আই, ডি, এস।	ঐ
৯।	ডঃ ওসমান হায়দার চৌধুরী	বি, আই, ডি, এস।	ঐ
১০।	ডঃ সেলিম জাহান	অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	ঐ
১১।	সৈয়দ আলী কবির	প্রাক্তন ডেপুটি গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক।	ঐ
১২।	ডঃ এম, সোহরাবউদ্দিন	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক।	ঐ

জাতীয় অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা ঃ নীতিমালার সংস্কার ও সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা

সূচনা ও পটভূমি ঃ

দারিদ্র্য, সাহায্য নির্ভরশীলতা ও দুর্যোগ প্রবণতার সমন্বয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি এককভাবে বৈশিষ্ট্যময়। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতঃই সামগ্রিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হবে একদিকে অর্থনীতির স্বল্পমেয়াদী স্থিতিশীলতা বা ভারসাম্য রক্ষা করা এবং অন্যদিকে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে স্বয়ংভর ও দারিদ্র্য নিরসনকারী প্রবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া। বিগত দশকে বিশ্বব্যাংক ও আই, এম, এফ–এর উদ্যোগে তদানীন্তন সরকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সংস্কারমালা প্রবর্তন করে। মূলতঃ তথাকথিত কাঠামোগত বিন্যাসের আওতায় গৃহীত এসব সংস্কারের মধ্যে রয়েছে বাজেটের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, ভর্তুকী হ্রাস, করনীতির সংস্কার, বিরাষ্ট্রীয়করণ, উদার আমদানী নীতি, বৈদেশিক মুদ্রার নমনীয় বিনিময় হার, বেসরকারী খাতকে (বিশেষ করে রপ্তানী খাতকে) উৎসাহ প্রদান এবং সার্বিকভাবে সরাসরি নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে বাজারমুখী নীতিমালার উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি। দাতাগোষ্ঠীর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্যের শর্ত হিসাবেই এই সংস্কারমালা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত রয়েছে।

আশির দশকের প্রারম্ভে রপ্তানী বাণিজ্যে মন্দা ও বৈদেশিক সাহায্য হ্রাসের ফলে বহির্বাণিজ্য ও বাজেটের যে ঘাটতি দেখা দিয়েছিল (এবং যা স্বল্পমেয়াদী বৈদেশিক ঋণ ও বৈদেশিক মুদ্রার জমা তহবিল থেকে কেবল সাময়িকভাবে মেটানো সম্ভব ছিল) তার পরিপ্রেক্ষিতেই অর্থনৈতিক সংস্কারের সূচনা করা হয়। পরবর্তী সময়ে এ ঘাটতি জাতীয় আয়ের প্রায় ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৭ শতাংশের কাছাকাছি নামিয়ে আনা হয়েছে–বৈদেশিক সাহায্যের বর্তমান স্বাভাবিক প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এ ঘাটতি কমানো সম্ভব হয়েছে বিনিয়োগের হার এবং বিশেষ করে সরকারের উন্নয়ন ব্যয়কে সঙ্কুচিত করে, এর ফলে অর্থনীতির স্বল্পমেয়াদী ভারসাম্য রক্ষা হলেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সত্তরের দশকে (অর্থ বছর ১৯৭৩ থেকে ১৯৮০) যেখানে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল বছরে ৬ শতাংশের কাছাকাছি, আশির দশকে তা কমে ৪ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। বিশেষতঃ কৃষি ও শিল্পের মত উৎপাদনশীল খাতে প্রবৃদ্ধির হার আরও লক্ষ্যণীয়ভাবে হ্রাস পায়। প্রবৃদ্ধির এ শ্লথ গতি স্পষ্টতঃই দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। দশকের শেষ বছরে (১৯৮৯–৯০) বিশেষতঃ খাদ্যশস্যের অভূতপূর্ব ফলনের কারণে প্রবৃদ্ধির হার ৫·৮ শতাংশে বৃদ্ধি পেলেও একে দীর্ঘমেয়াদী উচ্চতর প্রবৃদ্ধির ইঙ্গিত বলে ধরে নেয়া যায় না। এছাড়া ১৯৮৯–৯০ সালে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সত্ত্বেও অর্থনীতির স্বল্পকালীন ভারসাম্যহীনতার সঙ্কট প্রকট হয়ে ওঠে, যার ফলে সরকারের সার্বিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন সত্ত্বেও অর্থনীতিতে কেন গতিশীলতা সৃষ্টি হয়নি তা গভীরভাবে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। দাতাগোষ্ঠীর মূল্যায়নে সাম্প্রতিক বন্যার নেতিবাচক প্রভাব ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত সংস্কারমালা বাস্তবায়নে বিলম্ব ও দ্বিধা–দ্বন্দ্বকেই মূলতঃ এর জন্য দায়ী করা হয়েছে। ব্যাপক দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক রীতি–নীতির যথেচ্ছ লংঘনকেও এ সব সংস্কারের ইপ্সিত ফল লাভের বাঁধা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে অর্থনৈতিক সংস্কারের ঢালাও ব্যবস্থাপত্র এবং এর মূল্যায়ন প্রায় একতরফাভাবে দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকেই এসেছে। এর ফলে জাতীয় সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর মধ্যে প্রস্তাবিত নীতিমালার প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন ও সংশোধনের ব্যাপারে অর্থবহ সংলাপের সুযোগ সৃষ্টি হয় নি এবং এ সব নীতিমালা বাস্তবায়নের স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টিও সম্ভব হয় নি। বর্তমানের পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এবং দেশের অর্থনীতির বাস্তব অবস্থার নিরিখে এ সব বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে গভীর চিন্তা–ভাবনার সময় এখন এসেছে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের গতি –প্রকৃতি ঃ

জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অতি নিম্নহার বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতির সম্ভবত সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। বিনিয়োগের হার আশির দশকের শুরুতে জাতীয় আয়ের ১৫–১৬ শতাংশ থেকে বর্তমানে ১১–১২ শতাংশে নেমে এসেছে যেখানে এ অঞ্চলে অন্যান্য অনেক উন্নয়নশীল দেশে এ হার জাতীয় আয়ের এক চতুর্থাংশ থেকে এক তৃতীয়াংশ। জাতীয় সঞ্চয়ের হার বর্তমানে মাত্র ৪–৫ শতাংশ এবং এর একটা বড় অংশই আসে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো উপার্জন (যা জাতীয় আয়ের ৩–৪ শতাংশ) থেকে উদ্ভূত সঞ্চয় থেকে। বৈদেশিক সাহায্যের প্রাপ্তি সাধারণতঃ জাতীয় আয়ের ৮–৯ শতাংশের কাছাকাছি ওঠানামা করেছে, যদিও ক্রমবর্ধমান সুদ–আসল পরিশোধের কারণে (যা এখন বছরে জাতীয় আয়ের প্রায় ২ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে) নীট সাহায্য প্রাপ্তির হার হ্রাস পেয়েছে।

যদিও বেসরকারী খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদানই অর্থনৈতিক সংস্কারমালার মূল লক্ষ্য ছিল, বাস্তবে এ ধরণের ইতিবাচক প্রভাব এখনও দৃশ্যমান নয়। জাতীয় আয়ের অনুপাতে বেসরকারী বিনিয়োগের হার বাড়ে নি বরং কমেছে। আশির দশকের প্রথমার্ধে ব্যাপক বিরাষ্ট্রীয়করণের ফলে আধুনিক শিল্পখাতে মূলধন সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানাধীন অংশ মাত্র ২০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশে উন্নীত হয়; তা সত্ত্বেও শিল্পখাতে বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় নি। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব এবং অন্যান্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে মোট বেসরকারী বিনিয়োগের মধ্যে উৎপাদনমুখী খাত যেমন কৃষি ও শিল্পে বিনিয়োগের অংশ কমে গিয়ে গৃহনির্মাণ, ব্যবসা ও অন্যান্য সেবামূলক খাতে বিনিয়োগ পুঁজি আকৃষ্ট হয়েছে।

সরকারের রাজস্ব আয়ের তুলনায় রাজস্ব ব্যয়ের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে জাতীয় সঞ্চয় হারে সরকারী খাতের অবদান ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। রাজস্ব উদ্বৃত্তের হার সত্তরের দশকের শেষার্ধে বছরে গড়ে জাতীয় আয়ের ২·৬ শতাংশ থেকে আশির দশকের শেষার্ধে ০·৭ শতাংশে নেমে এসেছে। উন্নয়ন বাজেটের অধীনে যে চলতি ব্যয় হয় (বাজেট ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী) তার হিসাব ধরলে সাম্প্রতিকালে সরকারী খাতে অবসঞ্চয় হচ্ছে বলা চলে, যা বেসরকারী খাতের সঞ্চয়কে কার্যতঃ আংশিকভাবে নিঃশেষিত করছে। লক্ষণীয় যে, জাতীয় আয়ের তুলনায় রাজস্ব ব্যয় দ্রুত হারে বাড়লেও উন্নয়ন ব্যয় জাতীয় আয়ের অনুপাত হিসাবে কমে গেছে—এ হার সত্তরের দশকের শেষার্ধে বছরে গড়ে প্রায় ১০ শতাংশ থেকে কমে পরবর্তী দশকের শেষার্ধে এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ শতাংশে। এটা ক্রমহ্রাসমান জাতীয় বিনিয়োগের হারকেই প্রতিফলিত করছে।

বর্তমানে সরকারের উন্নয়ন বাজেটের একটা বড় কাঠামোগত দুর্বলতা হল অর্থ সংস্থানের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা। উন্নয়ন বাজেটের মোট বরাদ্দে প্রকল্প ও পণ্য সাহায্যের অংশ আশির দশকের শুরুতে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ থেকে এখন ৯০ ভাগের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে (অবশ্য ক্রমবর্ধমান সুদ–আসল পরিশোধের কারণে কেবল এ হিসাব থেকে বাজেটে বৈদেশিক সাহায্যের অবদানের পূর্ণ চিত্র পাওয়া যাবে না)। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের জন্য স্থানীয় মুদ্রার সম্পদ সংস্থানের সমস্যাই এখন প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার মূল বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে প্রায় সাড়ে চার বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের প্রতিশ্রুত প্রকল্প সাহায্য এ পর্যন্ত অব্যবহৃত রয়েছে (যেখানে বর্তমানে বছরে প্রকল্প সাহায্য ব্যবহারের পরিমাণ এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কম)। এটা ঠিক যে মোট প্রতিশ্রুত সাহায্যের মধ্যে পণ্য সাহায্যের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বাড়িয়ে এবং স্থানীয় মুদ্রায় সরকারী তহবিল সৃষ্টির মাধ্যমে এ সমস্যা লাঘব করা সম্ভব। কিন্তু সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে দাতাগোষ্ঠীর ধারণা হয়েছে যে এ ধরণের সাহায্য বাড়ালে তা কেবল সরকারের আভ্যন্তরীণ সম্পদকে উন্নয়ন বাজেট থেকে সরিয়ে নিয়ে অনুৎপাদনশীল খাতের ব্যয় বরাদ্দ বাড়াতে উৎসাহ যোগাবে। কাজেই সরকারী ব্যয়ের অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের প্রচেষ্টা জোরদার করার শর্ত পূরণ সাপেক্ষেই কেবল বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির যৌক্তিকতা আছে বলে দাতাগোষ্ঠী মনে করছেন।

সরকারী খাতে বিনিয়োগ পরিকল্পনা ঃ

বর্তমানে সরকারী খাতে সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিকল্পনার প্রধান দুটি সমস্যা হল (১) প্রতিশ্রুত প্রকল্প সাহায্যের তুলনায় স্থানীয় মুদ্রায় সম্পদের ঘাটতি এবং (২) সম্পদ সংস্থানের তুলনায় চলতি প্রকল্পের অত্যধিক সংখ্যা। সমাপ্ত প্রকল্পগুলির মূল্যায়ন থেকে দেখা যায় যে প্রধানতঃ অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পিত সময় অতিক্রান্তির হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে (যার ফলে প্রকল্পগুলি অপেক্ষাকৃত কম লাভজনক হয়ে পড়তে বাধ্য)। সম্ভাব্য সম্পদ প্রাপ্তির অতি আশাব্যঞ্জক হিসাব ও প্রকল্প পরিকল্পনার দুর্বলতাই এ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। হিসাব করে দেখা গেছে যে চলতি প্রকল্পের সমস্যার কারণে আগামী চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে নতুন প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত মোট উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের সামান্যই অবশিষ্ট থাকবে। এটা বিনিয়োগ পরিকল্পনায় নতুন অগ্রাধিকার প্রতিফলনের ক্ষেত্রে একটা বিরাট বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে চলতি প্রকল্পগুলির পুনর্মূল্যায়ন এবং এসব প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে সঠিক অগ্রাধিকার নিরূপণের প্রশ্নটি জরুরী হয়ে পড়েছে।

উন্নয়ন বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে আর একটি বিতর্কিত বিষয় হল যে সম্প্রতিকালে স্থানীয় মুদ্রায় প্রাপ্ত সম্পদের একটা বড় অংশই বরাদ্দ করা হয়েছে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট নয় এমন প্রকল্পের জন্য। এ সব প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের বেলায় অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনাই প্রাধান্য পেয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে দাতাগোষ্ঠীর পরামর্শ হল যে স্থানীয় মুদ্রার সম্পদ যদি আরও বেশী পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের স্থানীয় ব্যয় মেটানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, তা হলে প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার ত্বরান্বিত করা যাবে। এ যুক্তি অনুযায়ী যে সব সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং যে গুলির মোট ব্যয়ের বেশী অংশ বৈদেশিক মুদ্রায় (অর্থাৎ প্রকল্প সাহায্য থেকে) সংস্থান করা হবে, সে সব প্রকল্পকেই অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এ ধরণের সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পগুলিই যে সামাজিক লাভ-ক্ষতির বিচারে অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য এমন অনুমান করারও কোন ভিত্তি নেই।

প্রকল্প পরিকল্পনায় সার্বিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কৌশল ও উদ্দেশ্যসমূহ কিভাবে প্রতিফলিত করা যায় তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বৈদেশিক সাহায্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিকল্পনায় আন্তঃখাত ভারসাম্য রক্ষা এবং একটি সমন্বিত উন্নয়ন কৌশলের প্রতিফলন ঘটানো সহজসাধ্য নয়। প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে একটি বিস্তৃত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পের সঠিক অগ্রাধিকার নির্ণয়ে এ প্রক্রিয়া তেমন কার্যকরী হয় নি। যে সব সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের সঙ্গে দেশী-বিদেশী সরবরাহকারী ও ঠিকাদারদের স্বার্থ জড়িত আছে, সেগুলিকেই প্রায়শঃ দ্রুত অনুমোদন লাভ ও বাস্তবায়িত হতে দেখা গেছে-যদিও এসব অনেক প্রকল্পই প্রযুক্তি বা সামাজিক লাভ-ক্ষতির বিচারে অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য বলে মনে হবে না (লক্ষণীয় যে এসব প্রকল্প দাতাসংস্থার নিয়োজিত পরামর্শকদের ইতিবাচক মূল্যায়ন পেতেও সমর্থ হয়েছে)। সম্প্রতি দাতাগোষ্ঠীর পরামর্শে প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়া সহজতর করার কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে যাতে প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার ত্বরান্বিত করা যায়। এতে প্রশাসনিক বিলম্বজনিত সমস্যার লাঘব হলেও প্রকল্পের যথাযথ অর্থনৈতিক মূল্যায়নের জন্য একটি কার্যকর প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা থেকে যাচ্ছে।

বাজেট ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ ঃ

সাম্প্রতিককালে বাজেট ব্যবস্থাপনায় সরকারী ব্যয়ের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণের অভাব একটি প্রধান সমস্যা হিসাবে দেখা গিয়েছে। প্রকৃত রাজস্ব ব্যয় বাজেটের প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রান্তির হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে যা বাজেট ব্যবস্থাপনার ক্রমাবনতিশীল নিয়মানুবর্তিতার ইঙ্গিত বহন করে। বিগত ১৯৮৯-৯০ সালে অর্থনীতিতে যে ভারসাম্যহীনতার সঙ্কট সৃষ্টি হয়, তার জন্য বাজেট ব্যবস্থার দুর্বলতাকেই প্রধানতঃ দায়ী করা হয়। সরকারী খাতে সম্পদ ব্যবহারের অগ্রাধিকার রক্ষা করতে হলে এবং বাজেটকে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে হলে এ অবস্থার প্রতিকার একান্ত জরুরী।

গত এক দশক ধরে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ জাতীয় আয়ের শতকরা ৯ ভাগের কাছাকাছি প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে–যেখানে এ অঞ্চলের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ হার গড়ে প্রায় শতকরা ২০ ভাগ। বর্তমান কর ব্যবস্থায় কর প্রাপ্তির বৃদ্ধির হার জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির তুলনায় পিছিয়ে পড়ার একটা অন্তর্নিহিত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, এর ফলে ক্রমাগত কর হার বৃদ্ধি ও কর আদায়ের ভিত্তি সম্প্রসারিত করেও জাতীয় আয়ের অনুপাত হিসাবে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয়নি। ব্যাপক কর ফাঁকি এর একটি কারণ, যার প্রতিকারের জন্য কর প্রশাসনের সংস্কার অত্যাবশ্যক। অন্য প্রধান কারণ হল পরোক্ষ কর আদায়ের ভিত্তি হিসাবে দেশীয় উৎপাদনের তুলনায় আমদানীকৃত পণ্যের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা। মোট কর প্রাপ্তির প্রায় অর্ধেকই আসে আমদানীর উপর আরোপিত শুল্ক থেকে এবং ৩০ ভাগেরও কম আসে আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে অসংগঠিত খাতের প্রাধান্য এবং আমদানী–বিকল্প শিল্পকে অতিরিক্ত সংরক্ষণ সুবিধা প্রদানের কারণেই এ ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের উপর কর বাড়িয়ে একদিকে যেমন রাজস্ব আয়কে গতিশীল করা যায়, অন্যদিকে শিল্প সংরক্ষণের হারকেও অপেক্ষাকৃত যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা যায়। প্রধানতঃ এ উদ্দেশ্যেই কর সংস্কারের আওতায় মূল্য–সংযোজন কর (VAT) প্রবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এ কর বাস্তবায়নের প্রশাসনিক সম্ভাব্যতা এবং সামগ্রিক কর ব্যবস্থায় এর সঠিক বিন্যাস সম্পর্কে কিছু কিছু প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয়নি।

রাজস্ব আয় বৃদ্ধির অন্যান্য প্রস্তাবিত ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে অধিকতর হারে স্থানীয় সম্পদ আহরণ, সরকারী সেবামূলক খাতের ব্যয় মেটানোর জন্য মূল্য বৃদ্ধি এবং সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লাভজনক করার পদক্ষেপ গ্রহণ। এ ছাড়া সেচ কর বা ভূমি করের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহে কৃষি খাতের অবদান কিভাবে বাড়ানো যায় তাও গুরুত্বসহকারে বিবেচনার দাবী রাখে। বর্তমানে মোট কর প্রাপ্তির শতকরা ২ ভাগেরও কম আসে ভূমি রাজস্ব থেকে; অন্যদিকে কৃষি আয় সাধারণ আয়করের আওতাভুক্ত হলেও সত্যিকার আদায়ের পরিমাণ নগণ্য। রাজস্ব বৃদ্ধির এসব প্রস্তাবের স্বপক্ষে এখন সাধারণ বিবেচ্য বিষয় হল যে বৈদেশিক ঋণের সুদ–আসল পরিশোধের অঙ্ক সরকারী বাজেটের উপর ক্রমশঃ একটি বড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর বিনিয়োগ থেকে যে বর্ধিত উৎপাদন বা আয় হবে, তা থেকেই এ ঋণ পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস সন্ধান করতে হবে। সরকারী খাতে বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা ও বিনিয়োগের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রশ্নটিও অবশ্য এর সঙ্গে জড়িত।

মুদ্রানীতি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঃ

মূল্যস্ফীতি রোধ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বর্তমানে আই, এম, এফ, সমর্থিত কর্মসূচীর অধীনে অর্থনীতিতে মুদ্রা ও ঋণ সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া, বেসরকারী বিনিয়োগের জন্য ঋণ সরবরাহ যাতে যথেষ্ট থাকে সেজন্য সরকারের আভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রাও ন্যূনতম পর্যায়ে নির্ধারণ করা হয়। তাত্ত্বিক যুক্তিতে এ সব লক্ষ্যমাত্রা আরও নমনীয় হওয়া প্রয়োজন, যাতে অর্থনীতির সাময়িক পরিস্থিতির নিরিখে এগুলোকে পুনঃনির্ধারণ করা যায়। যেমন বেসরকারী খাতে ঋণের চাহিদা হ্রাস পেলে ঘাটতি বাজেটের মাধ্যমে উন্নয়ন ব্যয় বাড়িয়ে সরকার একদিকে প্রাপ্ত বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেন এবং অন্যদিকে অর্থনীতিতে সম্ভাব্য মন্দাভাব প্রতিরোধ করতে পারেন। ১৯৮৮–৮৯ সনের বন্যা উত্তর সময়ে অর্থনীতির তৎকালীন মন্দাভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য এ ধরণের একটি প্রসারণমুখী বাজেটনীতি অনুসরণের সুযোগ ছিল বলে বিশ্বব্যাংকের মূল্যায়নে স্বীকার করা হয়েছে। তবে দাতাগোষ্ঠীর ধারণা যে এ ধরণের নমনীয়তার সুযোগ দিলে বাজেট ব্যয়ে পুনরায় নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনা কষ্টসাধ্য হবে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের সমর্থনে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তার মূল লক্ষ্য হল সরকারী নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে দিয়ে বাজারভিত্তিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আর্থিক খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা জোরদার করা। বাজার–নির্ভর নমনীয় সুদের হার প্রবর্তনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই সীমিতভাবে সুদের হার ওঠানামার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন অগ্রাধিকার খাতে সুদের হারে যে ভর্তুকী দেয়া হয় তাও

ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার প্রস্তাব রয়েছে। তাত্ত্বিক দিক থেকে বাজার–নির্ভর সুদের হারের স্বপক্ষে যুক্তি হল যে এর ফলে সঞ্চয় উৎসাহিত হবে এবং বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে। তবে মুদ্রা বাজারের ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতার কারণে (যার প্রমাণ অসংগঠিত খাতে উচ্চ সুদের সমান্তরাল ঋণ বাজারের অস্তিত্ব) এ তত্ত্বগত ধারণা বাস্তবে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয়। সংক্ষেপে বলা চলে প্রস্তাবিত সংস্কারের অনেক ইতিবাচক দিক থাকলেও (বিশেষ করে খেলাপী ঋণের সমস্যা নিরসনের ব্যাপারে) এ থেকে ঋণ বাজারের একটি প্রধান সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে না—তা হল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণের চাহিদা মেটানোর সমস্যা। একটি কর্মসংস্থানমুখী ও শ্রমঘন–প্রযুক্তি–নির্ভর উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের জন্য এ সমস্যাটির সমাধান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

বহির্বাণিজ্য নীতিমালার সংস্কার ঃ

কাঠামোগত বিন্যাসের আওতায় বহির্বাণিজ্য নীতি সংস্কারের মধ্যে রয়েছে (১) পণ্য আমদানীর উপর থেকে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও বিধি–নিষেধ ক্রমান্বয়ে তুলে নেওয়া (২) বৈদেশিক মুদ্রার নমনীয় ব্যবহারের মাধ্যমে রপ্তানী (বিশেষতঃ অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানী) উৎসাহিত করা, (৩) মুদ্রার সরকারী বিনিময় হারকে ক্রমান্বয়ে ওয়েজ আর্নার্স স্কীমের হারের সঙ্গে একীভূত করা এবং (৪) সামগ্রিক চাহিদা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি জাতীয় আয়ের প্রায় ৭ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখা (শেষোক্ত লক্ষ্যমাত্রা বৈদেশিক সাহায্যের সম্ভাব্য নীট প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে ধরা হয়)।

আমদানীর উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ তুলে দেবার পেছনে যুক্তি হল, এ ধরণের নিয়ন্ত্রণের ফলে আমদানী লাইসেন্স থেকে অনোপার্জিত আয়ের সৃষ্টি হয়, সরকার সম্ভাব্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হন এবং শিল্প সংরক্ষণের হার যুক্তিসঙ্গত করা কষ্টসাধ্য হয়। এ ধরণের নিয়ন্ত্রণ এখনও সম্পূর্ণ তুলে দেয়া না হলেও সাধারণভাবে বলা চলে যে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে একটা মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার দিকে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। অন্যদিকে মুদ্রার বিনিময় হার আশির দশকে কার্যতঃ গড়ে বছরে প্রায় ৯ শতাংশ হারে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার দুই বাজারে বিনিময় হারের তারতম্য এখন নগণ্য পর্যায়ে (শতকরা ২ ভাগেরও কম) নেমে এসেছে। তবে দেশের ভেতরে মূল্যস্ফীতির ফলে মুদ্রার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হারে (real effective exchange rate) কোন ধারাবাহিক অবমূল্যায়নের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়নি। উল্লেখ্য যে টাকার আপাতদৃষ্ট বিনিময় হারকে বাংলাদেশ ও তার প্রধান বাণিজ্যিক সহযোগী দেশগুলির মূল্যস্ফীতির তুলনামূলক হার দিয়ে সমন্বিত করেই প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হারের হিসাব করা হয় এবং একে বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্যের প্রতিযোগিতা ক্ষমতার সূচক হিসাবে ধরা যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে টাকার অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে রপ্তানী উৎসাহিত করতে হলে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যাবশ্যক।

দাতাগোষ্ঠীর মূল্যায়নে বাংলাদেশকে মুদ্রার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার কমিয়ে রপ্তানী বাজারে আরও আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে–বিশেষতঃ যেখানে এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের তুলনায় সম্প্রতিকালে বাংলাদেশ দৃশ্যতঃ অনেক পেছনে পড়ে আছে। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে বিনিময় হারের কতখানি অবমূল্যায়ন প্রয়োজন বা আদৌ অবমূল্যায়নের প্রয়োজন আছে কি না তা খুব স্পষ্ট নয় (প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হারের হিসাব থেকে এটা বোঝা যাবে না, কারণ এ হিসাব শুধু ভিত্তি বছরের সঙ্গে একটা তুলনামূলক চিত্রই দেয় এবং এর মধ্যে বহির্বাণিজ্যের চাহিদা সরবরাহের প্রভাব সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয় না)। অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রার জমা তহবিলের (reserve) অবস্থার ক্রমাবনতি থেকে মুদ্রার অবমূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে অর্থনীতিতে সাময়িক অস্থিরতার কারণে এবং বিশেষতঃ আমদানী পণ্যের ফটকামূলক চাহিদার কারণেও বৈদেশিক মুদ্রার জমার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে। বাংলাদেশের মত অর্থনীতিতে আমদানী বাণিজ্য সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার ক্ষেত্রে এ ধরণের একটি ঝুঁকি রয়েছে, যার কিছু প্রমাণ ১৯৮৯–৯০ সনের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া গেছে।

আশির দশকে রপ্তানীর পরিমাণ (স্থির মূল্যে) বছরে গড়ে প্রায় ৮ শতাংশ হারে বেড়েছে; এর মধ্যে অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানী বেড়েছে প্রায় ২৭ শতাংশ হারে। আপাতদৃষ্টিতে একে যথেষ্ট সাফল্য মনে হলেও রপ্তানীমুখী সংস্কারের ইপ্সিত লক্ষ্য সে অনুযায়ী অর্জিত হয়নি। তৈরী পোষাক এবং মাছ ও চিংড়ি–এ দুটি রপ্তানী খাত ছাড়া অন্য কোন অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানীর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি। বিভিন্ন বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে যদিও মুদ্রার বিনিময় হারের অবমূল্যায়ন রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে, রপ্তানী খাতকে প্রদত্ত অন্যান্য উৎসাহ যেমন শুল্ক মওকুফ, সহজ ঋণ, ইত্যাদির অবদান কম হলেও তৈরী পোষাক রপ্তানীর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারের সুযোগ সৃষ্টি এবং বহিরাগত ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থ ব্যবধান চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করেছে। কাজেই রপ্তানীমুখী সংস্কারে কেবল মুদ্রার বিনিময় হারের উপর অতিরিক্ত মনোযোগের ফলে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ উপেক্ষিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

বহির্বাণিজ্য ও কর নীতির সংস্কারের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল পণ্যের আমদানী ও দেশীয় উৎপাদনের উপর আরোপিত করের হার সমন্বয় করে শিল্প–সংরক্ষণ হারকে একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং সে সঙ্গে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিবেচ্য বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ উৎপাদনে সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির যুক্তিতেই আমদানী–বিকল্প শিল্পের সংরক্ষণ হার কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে শিল্পখাতে উৎপাদনের দক্ষতা বাড়ানো ছাড়াও বিনিয়োগের হার বাড়ানোও একটি জরুরী সমস্যা। উচ্চ হারে সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও আমদানী–বিকল্প শিল্প কেন দ্রুত প্রসার লাভ করেনি তার সঠিক কারণ নির্ধারণ ছাড়া শিল্পনীতির পূর্ণাঙ্গ সংস্কার সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, যে সব বিবেচনার উপর ভিত্তি করে কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন, সেগুলোর তাৎপর্য পণ্য বা খাত ভেদে বিভিন্ন হতে বাধ্য। তা সত্ত্বেও কর হার পরিবর্তনের ব্যাপারে দাতাগোষ্ঠী সাধারণতঃ ঢালাও ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী, মূলতঃ এ কারণে যে এর ফলে সরকার বিভিন্ন গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষার তাগিদে স্বেচ্ছাচারী নীতি গ্রহণের সুযোগ পাবেন না (প্রশাসনিক সুবিধাও আর একটি যুক্তি)। কাজেই একটি দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক সরকারের বেলায় এ যুক্তি পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। তৃতীয়তঃ, সম্প্রতি পরিচালিত সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে শিল্পোদ্যোক্তারা যে সব সমস্যাকে বিনিয়োগের প্রতিবন্ধক মনে করেন তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হল সরকার ঘোষিত নীতিমালার প্রতি তাঁদের আস্থাহীনতা। সম্প্রতিকালে এক দিকে দাতাগোষ্ঠীর চাপে এবং অন্য দিকে বিভিন্ন গোষ্ঠী–স্বার্থ রক্ষার তাগিদে কর ও শুল্ক হারের যে সব পরিবর্তন আনা হয়েছে সেগুলোতে দৃশ্যতঃ নানা অসঙ্গতি ও দ্বিধা–দ্বন্দ্ব রয়েছে। এ অনিশ্চিত পরিবেশ সরকারী নীতিমালার ওপর বিনিয়োগকারীদের আস্থা সৃষ্টির সহায়ক হয়নি। এ ক্ষেত্রেও একটি দায়িত্বশীল সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে।

টাস্ক ফোর্সঃ কৃষি উৎপাদন কৌশল

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	জনাব আবু আহমেদ আবদুল্লাহ্	বি, আই, ডি, এস।	আহ্বায়ক
২।	জনাব মোঃ এরশাদুল হক	অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৩।	ডঃ আলতাফ আলী	প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন।	ঐ
৪।	ডঃ মোস্তফা কামাল মুজেরী	পরামর্শক, পরিকল্পনা কমিশন।	ঐ
৫।	ডঃ আশরাফ চৌধুরী	অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	ঐ
৬।	ডঃ হাসান উল্লাহ্	সিডা কৃষি সেক্টর টীম, কৃষি মন্ত্রণালয়।	ঐ
৭।	ডঃ জাহাংগীর আলম	প্রেসিডেন্ট, কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতি।	ঐ
৮।	ডঃ মদন মোহন দে	সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।	ঐ
৯।	ডঃ আবদুস সাত্তার মন্ডল	অর্থনীতি বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।	ঐ

কৃষি উৎপাদন কৌশল

সূচনা ঃ

বাংলাদেশে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষির অবদান সত্তর দশকের ৬০ শতাংশের তুলনায় বর্তমানে প্রায় ৪০ শতাংশে নেমে এসেছে। স্বাধীনতার পর স্বল্প সময়কালে (১৯৭৩–৭৬) দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হলেও (যা মূলতঃ যুদ্ধকালীন বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় উত্তরণ) পরবর্তীতে কৃষি প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফলে বর্তমান সামগ্রিক কৃষি প্রবৃদ্ধির ধারা হতাশাব্যঞ্জক। জাতীয় অর্থনীতিতে সার্বিক গুরুত্বের কারণে স্বল্প কৃষি প্রবৃদ্ধি জাতীয় আয় এবং বিনিয়োগের আশানুরূপ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান বাঁধা হিসাবে পরিগণিত। এজন্য দ্রুততর কৃষি প্রবৃদ্ধি সামগ্রিক আর্থ–সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের পূর্বশর্ত।

কৃষি প্রবৃদ্ধি দ্রুততর করার জন্য বেশ কিছু বর্তমানে স্বল্প ব্যবহৃত সুযোগ–সুবিধার পরিপূর্ণ ব্যবহার বাঞ্ছণীয়। এক্ষেত্রে প্রথমেই আসে সেচ ভিত্তিক উচ্চফলনশীল (উফশী) ধান চাষ। এখনও প্রায় ৫০ লক্ষ হতে ৭৬ লক্ষ হেক্টর অতিরিক্ত জমি অগভীর/গভীর নলকূপ এবং লো–লিপ্ট পাম্প পদ্ধতির মাধ্যমে সেচ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব। অন্যান্য সম্ভাব্য উৎস হচ্ছেঃ চালু সেচ যন্ত্রসমূহের ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার, সুষম রাসায়নিক সার প্রদান, রোপা আমন চাষে সহায়ক সেচ প্রদান, উফশী বীজের গুণগত মান রক্ষা ইত্যাদি।

কৃষিখাতে দীর্ঘকালীন প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাস্তব ধারণা হচ্ছে সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি বার্ষিক ৩·৫ শতাংশের বেশী না হবার সম্ভাবনাই বেশী। এজন্য অকৃষিখাতসমূহকে (বিশেষ করে শিল্পখাতকে) ভবিষ্যৎ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে খাদ্যে স্বয়ংম্ভরতা অর্জন অর্থনৈতিক বাস্তবতা সম্পন্ন লক্ষ্য হলেও ভবিষ্যৎ খাদ্য চাহিদা ৩/৪ কোটি টনের অধিক হলে শিল্প পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমে খাদ্য আমদানী যুক্তিযুক্ত হতে পারে।

ফসল উৎপাদন পরিস্থিতি ঃ

খাদ্যশস্য (ধান এবং গম) উৎপাদন সত্তর দশকের বার্ষিক ৩·৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধির তুলনায় আশির দশকে বৃদ্ধি পায় মাত্র ২·২ শতাংশ হারে। অবশ্য ১৯৮৯/৯০ সালের উৎপাদন ছিল রেকর্ড পরিমাণ। অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে মধ্য সত্তর থেকে মধ্য–আশির দশকের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার মাত্র ২ শতাংশ। পাট, আলু, শাক–সব্জী, কলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৩·৫ থেকে ২·৩ শতাংশের মধ্যে হলেও অন্যান্য ফসলের প্রবৃদ্ধির হার ঋণাত্মক অথবা অতি সামান্য। এক্ষেত্রে ডাল, তৈল বীজ, ইক্ষু, মরিচ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

আশির দশকে কৃষি প্রবৃদ্ধি হ্রাসের কারণসমূহ সম্পর্কে যদিও মতানৈক্য বিদ্যমান তবু যে সমস্ত কারণ সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে তারমধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ রাসায়নিক সারের ক্ষেত্রে ভর্তুকী প্রত্যাহারের কারণে অসম মূল্য পরিস্থিতি, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সংকোচন ও পাট হতে স্বল্প আয়ের কারণে কৃষকদের প্রকট আর্থিক সংকট, ক্ষুদ্র সেচ যন্ত্র বিতরণ ব্যবস্থায় অবাঞ্ছিত সরকারী হস্তক্ষেপ প্রভৃতি। এছাড়া ভৌগোলিক, সামাজিক ও বাজার ব্যবস্থার বিভিন্নতার কারণে দেশে কৃষি প্রবৃদ্ধির এলাকা ভিত্তিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে স্থানভিত্তিক(location specific) নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

ভবিষ্যৎ উৎপাদন সম্ভাবনার ক্ষেত্রে বলা যায় যে ধানের মধ্যে আউশের উৎপাদন বেশী বৃদ্ধির আশা করা যায় না। আমনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হলেও তা অনেকাংশে সহায়ক সেচ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণের উপর নির্ভরশীল। বোরো উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেচ এলাকা বৃদ্ধি এবং সেচ ও সারের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। গমের ক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাসের সম্ভাবনাই অধিক। এছাড়া পাট, ডাল, তৈলবীজ প্রভৃতি শস্যের উৎপাদন সামগ্রিকভাবে কিছুটা বৈরী অবস্থার সম্মুখীন হলেও বাস্তব নীতি গ্রহণ করলে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভবপর বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ বিভিন্ন ফসলের ব্যক্তিভিত্তিক (private) এবং সামাজিক (social) আকর্ষণীয়তা (profitability)

বাংলাদেশে কোন্ ফসল কিভাবে এবং কি পরিমাণে উৎপাদিত হবে তা নির্ভর করে প্রায় এক কোটি কৃষকের সিদ্ধান্তের উপর। অন্যান্য বিষয় ছাড়া কৃষকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের আনুপাতিক মুনাফা। অবশ্য ব্যক্তিভিত্তিক ও সামাজিক মুনাফা এক নয়। বন্যার পানির উচ্চতা ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ ব্যবহার করে দেখা যায় স্বাভাবিক বন্যায় প্লাবিত হয় না এমন উঁচু ভূমির ক্ষেত্রে ছিটানো আউশের চাইতে পাট চাষ অনেক বেশী আকর্ষণীয়। এছাড়া এই ধরণের জমিতে স্থানীয় রোপা আমন, ইক্ষু, আদা, মরিচ, কলা, শাক-সব্জী প্রভৃতির উৎপাদন বেশ লাভজনক। মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন জমির ক্ষেত্রে উপরোক্ত উঁচু জমির ফলাফল অনেকটা প্রযোজ্য। এই ধরণের জমিতে উফশী বোরো ধান ও গমের আকর্ষণীয়তা অনেক কম যদিও পিঁয়াজ, আদা, আলু, তুলা প্রভৃতির আকর্ষণীয়তা উল্লেখযোগ্য। মধ্যম নিম্নতা সম্পন্ন ভূমির ক্ষেত্রে পাট এবং উফশী রোপা আমন বেশ আকর্ষণীয়। নিম্ন ভূমির ক্ষেত্রে রবি মৌসুমে ডাল, তৈলবীজ ও অন্যান্য ফসল এবং উফশী রোপা আমনের চেয়ে ছিটানো আমন আকর্ষণীয়। খুবই নিম্ন ভূমি শুধুমাত্র স্থানীয় বোরো উৎপাদন উপযোগী।

যেহেতু বাংলাদেশে উঁচু এবং মধ্যম-উঁচু জমির পরিমাণই বেশী (মোট জমির প্রায় ৬৪ শতাংশ), আশু সুফল লাভের জন্য এধরণের জমির জন্য উপযোগী উৎপাদন কৌশলের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া একান্ত প্রয়োজন। উপযোগী নীচু ও খুবই নীচু ভূমি মৎস্য চাষে ব্যবহার লাভজনকে পরিগণিত হতে পারে।

ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা ঃ

আগামী দশ থেকে পনর বছর ক্ষুদ্র সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে সেচের দ্রুত প্রসার কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে দেশে বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তি বিদ্যমান এবং এই সব বিনিয়োগ বেশ লাভজনক বলে প্রতীয়মান। কৃষি সেচে বিনিয়োগের লভ্যতা ৪০-৬০ শতাংশ বলে অনুমিত হয়। সাম্প্রতিককালে অগভীর নলকূপ বাংলাদেশে প্রধান সেচ প্রযুক্তি হিসাবে বিকাশ লাভ করেছে। এই প্রযুক্তি দেশের প্রায় সকল অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানি স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অগভীর নলকূপ বিতরণ ব্যবস্থায় বেসরকারী খাতের প্রাধান্য বিদ্যমান এবং অগভীর নলকূপ সংক্রান্ত সরকারী নিয়ন্ত্রণ বর্তমানে বহুলাংশে প্রত্যাহার করা হয়েছে। একই সংগে গভীর নলকূপ (২ কিউসেক) থেকে সাবসিডি হ্রাস এবং সরকারী খাতের সকল অগভীর নলকূপ ও লো-লিফ্ট পাম্প বেসরকারী খাতে হস্তান্তর করা হচ্ছে।

টাস্ক ফোর্স এ পদক্ষেপগুলি সমর্থন করে। সরকারী খাত ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে সচরাচর তেমন পটু হয় না এবং সরকারী বিধি-নিষেধের আধিক্য সেচ যন্ত্রের সুষ্ঠু ও সময়োচিত সরবরাহকে ব্যাহত করে। গভীর নলকূপে ভর্তুকী প্রদানের ফলে একটি অনুপযোগী প্রযুক্তিকে কৃত্রিমভাবে কৃষকদের কাছে আদরণীয় করে তোলা হয়। তবে যে সব এলাকায় অগভীর নলকূপ একেবারে অকেজো সেখানে গভীর নলকূপের উপর কিছু ভর্তুকী রাখা প্রয়োজন হতে পারে।

ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে সুপারিশসমূহ হচ্ছে ঃ

১। বর্তমান অনিয়ন্ত্রিত বিতরণ ব্যবস্থা বজায় রাখা।

২। ২-কিউসেক গভীর নলকূপের সাবসিডি পর্যায়ক্রমে হ্রাস করা এবং ২-৩ বৎসরের মধ্যে ২৫-৩০ শতাংশে আনয়ন। তবে যে সব অঞ্চলে অগভীর নলকূপ একেবারে অকেজো সেখানে অন্যান্য দিকে উন্নয়ন হবার আগ পর্যন্ত ভর্তুকী (হয়ত কিছুটা কম হারে যেমন ৫০%) বজায় রাখতে হবে।

৩। দেশে বিভিন্ন সেচ প্রযুক্তি উৎপাদন, প্রয়োগ ও বিতরণের ক্ষমতা সৃষ্টি।

৪। অগভীর নলকূপ ইঞ্জিন আমদানীর উপর শুল্ক পুনঃ প্রবর্তন অথবা দেশীয় উৎপাদনকে সাবসিডি প্রদান।

আধুনিক কৃষি উপকরণঃ রাসায়নিক সার, কীটনাশক, বীজ ঃ

ভূমির স্বল্পতার কারণে কৃষি–আয় বৃদ্ধির জন্য ভূমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে শস্যের একর প্রতি ফলন অত্যন্ত কম। এক্ষেত্রে সবচেয়ে আশংকাজনক হচ্ছে একর প্রতি উৎপাদনের ক্রমাগত নিম্নমুখী প্রবণতা। উফশী ধানের ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ১৯৬৯/৭০ সালের ৫ টন হতে মধ্য সত্তরে ৩·৮ টনে নেমে আসে যা বর্তমানে বিরাজমান। যদিও এ ধরণের প্রবণতার বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান তবে এসবের মধ্যে আধুনিক উপকরণ বিশেষ করে রাসায়নিক সার ও বীজের অপ্রতুল ব্যবহার অন্যতম।

রাসায়নিক সার ঃ

ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি অর্জনে অন্যান্য উপকরণের সাথে রাসায়নিক সারের কাম্য ব্যবহার একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় হচ্ছে বিভিন্ন সারের সুষম ও প্রয়োজনমত ব্যবহার যা স্থান ও অবস্থাভিত্তিক হতে হবে। সুষম সারের দুটো দিকের প্রতি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যকঃ শস্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুষম সার এবং ভূমির পুষ্টি সংরক্ষণ। ভূমির পুষ্টির অন্যান্য উপাদান, যেমন সালফার, জিন্ক প্রভৃতির স্বল্পতা দূর করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এছাড়া সার প্রয়োগের সঠিক সময়, পদ্ধতি, প্রকার প্রভৃতির উপর সুনির্দিষ্ট জ্ঞান কৃষকদের কাছে সময়মত পৌঁছানোর জন্য দক্ষ ও প্রয়োজনীয় লোকবল সম্পন্ন সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক একান্ত প্রয়োজন।

রাসায়নিক সার বিতরণ ব্যবস্থার বেসরকারীকরণ বর্তমানে প্রায় সম্পূর্ণ এবং সাধারণভাবে এই পরিবর্তনের ক্ষতিকর দিক তেমন প্রকট নয়। এছাড়া রাসায়নিক সার (বিশেষ করে ইউরিয়া) থেকে ভর্তুকী প্রত্যাহার করা হয়েছে। অন্যান্য সারের ক্ষেত্রেও ভর্তুকী ক্রমাগতভাবে কমানো হচ্ছে। মোটের উপর আমরা এ নীতি সমর্থন করি। কোন উৎপাদন কার্যক্রম যদি স্বভাবতঃ লাভজনক না হয় তা হলে তাকে ভর্তুকী দিয়ে খুব বেশী দিন টিকিয়ে রাখা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ এবং সমাজের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে মঙ্গলকর নয়। তবে এখানে দুটি বিবেচ্য বিষয় আছেঃ যদি সারের আন্তর্জাতিক মূল্য এত বেড়ে যায় যে ভর্তুকী না দিলে অনেক কৃষক দেউলিয়া হয়ে যাবে তা হলে এ অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণে সময় লাগবে এবং সে অন্তর্বর্তীকালে ভর্তুকীর প্রয়োজন থাকবে। দ্বিতীয়তঃ সাময়িকভাবে কৃষিখাতে তথা গ্রামীণ এলাকায় নীট সম্পদ প্রবাহ সুরক্ষা করা প্রয়োজন। এ জন্য সারের ভর্তুকী প্রত্যাহার করা হলে প্রাপ্ত সম্পদ গ্রামীণ অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে (যেমন গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ, রাস্তা ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি) বিনিয়োগ করা আবশ্যক। যদি তা সম্ভবপর না হয়, তা হলে সারে ভর্তুকী প্রদান বাঞ্ছনীয়।

সামগ্রিক বিবেচনায় রাসায়নিক সার সংক্রান্ত নিম্নলিখিত সুপারিশ রাখা যায়ঃ

(ক) ফসলের চাহিদা ও ভূমির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ স্থান ও অবস্থা ভিত্তিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে রাসায়নিক সার প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদে বিশেষ সেল স্থাপনের মাধ্যমে সারের প্রয়োজনীয়তার তালিকা প্রস্তুত হবে এবং এই তথ্য সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে সরবরাহ করা হবে। এ জন্য প্রতিটি উপজেলায় (যা ক্রমান্বয়ে ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায়ে নিতে হবে) মাটি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সর্ব নিম্ন সুবিধাসম্পন্ন ল্যাবরেটরী স্থাপন করতে হবে। এগুলি কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সহযোগিতায় উপজেলা পরিষদসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

(খ) 'মাইক্রো–নিউট্রিয়েন্ট' স্বল্পতাসম্পন্ন এলাকায়, যা ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা করা হয়েছে, বিশেষ ব্যবস্থাধীনে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক প্রদান এবং ভূমির জৈব উপাদান সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(গ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন শস্যের জন্য সার ও অন্যান্য উপাদান প্রয়োগের জন্য কৃষকদের উপযোগী তথ্যাবলী প্রস্তুত ও সরবরাহ করবে যা বাজার ও মাঠ পর্যায়ে পরিবর্তনের সাথে সমন্বিত হবে। বেসরকারী ডিলারগণ কৃষকদের কাছে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

(ঘ) রাসায়নিক সারের মূল্য নির্ধারণে স্থিতিশীল বিশ্ব বাজার মূল্য ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। আকস্মিক/অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি বা বিশেষ পরিস্থিতিতে ভর্তুকী প্রদান আবশ্যক হতে পারে। কৃষি পণ্য মূল্য কমিশন বার্ষিক ভিত্তিতে সারের মূল্য নির্ধারণ করবে।

(ঙ) বর্তমান রাসায়নিক স্যার বিতরণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাকে প্রয়োজনবোধে বি এ ডি সি কার্যক্রম দ্বারা সহায়তা করা যায়। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য হবে প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা সৃষ্টি।

(চ) বেসরকারী খাতকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকার সার আমদানী কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করার ব্যবস্থা নেয়া যায় যাতে সরকারী বা সাহায্য দাতা গোষ্ঠীর আর্থিক বাঁধার কারণে সময়মত সরবরাহে বিঘ্ন না ঘটে।

বীজ ঃ

উফশী জাতের বীজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উপাদান। বর্তমানে ধান, গম, আলু, পাট, ইক্ষু প্রভৃতি ফসল ছাড়া অনেক প্রধান ফসলের ভাল জাতের উফশী বীজ নেই। প্রচলিত উফশী বীজের প্রধান সমস্যা হচ্ছে এ সব জাতের গুণগত মান সংরক্ষণ। ভাল বীজ সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থার সমস্যা প্রকটভাবে বিরাজমান। অনেক ক্ষেত্রে সরবরাহকৃত বীজ অবিক্রিত থেকে যায় কারণ গুণগত মান অসন্তোষজনক এবং কৃষকদের কাছে তা আকর্ষণীয় নয়। বীজের বাজার এবং সরবরাহ ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ দূর করার জন্য একটি জাতীয় বীজ নীতি অপরিহার্য। এই নীতির প্রধান দিকসমূহ হবেঃ

(ক) বাংলাদেশে একটি প্রতিযোগিতামূলক বীজ শিল্পের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি। তবে সাথে সাথে ব্যক্তিখাতে অবাধ আমদানী উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

(খ) কৃষকদের কাছে বীজ বাজারজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থায় সরকারী এবং বেসরকারী খাতের সমন্বয়ে একটি লাগসই ব্যবস্থা উদ্ভাবন।

(গ) বিভিন্ন জাতের বীজের সম্ভাবনা ও সমস্যা সম্পর্কিত তথ্যের সঠিক প্রবাহ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কৃষি গবেষণা সংস্থা, বীজ উৎপাদক/আমদানীকারক, ডিলার, সম্প্রসারণ কর্মী এবং কৃষকদের মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগসূত্র স্থাপন।

(ঘ) যে সকল এলাকা এবং ফসলের জন্য ভাল জাতের বীজ প্রয়োজন তার উপর বিশেষ দৃষ্টি প্রদান এবং প্রয়োজনীয় নীতি উদ্ভাবন।

(ঙ) দেশে উৎপাদিত বীজের গুণগতমান সংরক্ষণ এবং নিরীক্ষণ ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান।

(চ) কৃষি উন্নয়ন কৌশলের আলোকে ভবিষ্যৎ বীজ প্রয়োজনীয়তা ও বীজ ব্যবহার উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্য বেসরকারী খাত এবং আমদানীকারকদের নিকট সরবরাহ করা।

কীট নাশক ঃ

মাঠ পর্যায়ে ফসলের রোগ এবং পোকা দমন ক্ষেত্রে কৃষকদের সাহায্য ও কারিগরী সহায়তা প্রদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মোট উৎপাদনের প্রায় ৫–১৫ শতাংশ মাঠ পর্যায়ে ও সংরক্ষণকালে রোগ ও পোকার আক্রমণে নষ্ট হয়। বাংলাদেশে সমন্বিত পোকা দমন কর্মসূচী (Integrated Pest Management) বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই।

কীট নাশক সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী ১৯৭৯ সাল থেকে বেসরকারী খাতের উপর ন্যস্ত। কীট নাশক ব্যবহারের কারণে পরিবেশের উপর যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এজন্য প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পোকা নিয়ন্ত্রণ এবং কার্যকরী পোকাদমন পদ্ধতি উদ্ভবের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

কীট নাশকের ক্ষেত্রে সুপারিশসমূহ হচ্ছেঃ

(ক) ফসল সংরক্ষণে সরকারী খাতের ব্যবস্থাবলী প্রধানতঃ গুণগত বিষয়ের উপর নিবদ্ধ থাকবে; পোকার আক্রমণ পরিদর্শন, নিরীক্ষণ এবং পোকার আক্রমণের ব্যাপারে পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা; কৃষক, কীট নাশক ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের জন্য তথ্য সরবরাহ; বেসরকারী খাত কর্তৃক বাজারজাতকৃত কীটনাশকের গুনগতমান সংরক্ষণ ইত্যাদি।

(খ) কৃষি পরিবেশ বিশ্লেষণ এবং ফসলভিত্তিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে সমন্বিত পোকা দমন পদ্ধতি উদ্ভাবন খাতে জাতীয় পর্যায়ে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

(গ) বেসরকারী ব্যবসায়ীদের সঠিকভাবে চালিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যভিত্তিক মানদন্ড প্রণয়ন এবং লাইসেন্স ব্যবস্থা প্রবর্তন, প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিকরণ এবং ভেজাল ও ক্ষতিকারক কীটনাশক বিক্রয় সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর সাজা প্রদানের ব্যবস্থা।

(ঘ) বেসরকারী খাত কর্তৃক বাজরকৃত কীট নাশকের গুণগতমান পরীক্ষা এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদির মান বজায় রাখার জন্য গুণগতমান সংরক্ষণ ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি।

কৃষি ঋণ ঃ

কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি বিকাশের উপর গুরুত্বের কারণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষিঋণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে কৃষিতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিলের ফলে বিনিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে যার জন্য কৃষিঋণের প্রযোজীয়তাওবেড়েছে।

কৃষি তথা গ্রামীণ ঋণের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের গুরুত্ব। অতীতে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের আওতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সত্বেও অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ভূমিকা কমেনি। এ জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ বাজার ব্যবস্থার উনয়নে নীতি গ্রহণ বাঞ্চনীয়। এই ঋণের প্রধান সমস্যা দুটি ঃ (১) অতি উচ্চ সুদের হার এবং (খ) ঋণ গ্রহিতাদের সম্পদ বিশেষ করে ভূমির হস্তান্তর।

প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ধারা অনুযায়ী দেখা যায় এ ধরনের ঋণের নীট প্রবাহ অপ্রতুল যায় জন্য স্বল্প পরিমাণ, অল্প ঋণ আদায়, অনাদায়ী ঋণের পরিমান বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি অনেক কারণ দায়ী। এ জন্য গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থায় সরকারী হস্তক্ষেপ সফল করে তুলতে হলে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে ঋণ আদায় পরিস্থিতির উন্নতি অপরিহার্য। এজন্য ঋণের তদারকি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সঙ্গতিপূর্ণ সুদের হার নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের সুদের হার একটি নির্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যে নমনীয় করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যায়। এর ফলে ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংক গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণে উৎসাহিত হবে। ফলশ্রুতিতে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া গ্রামীণ সমবায় এবং এন জি ও–দেরকেও ঋণ তদারকি ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট করা সম্ভব।

বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদানকারীদের সমন্বয় সাধনের জন্য গ্রামে 'লোন এজেন্ট' নিয়োগের সম্ভাবনা পরীক্ষা করা যায় যাতে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে এবং সুদের হার কমে আসবে।

বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ কাঠামোর আর একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র কৃষকদের স্বল্প অংশ গ্রহণ। বর্তমান প্রায় ৮৫ শতাংশ ক্ষুদ্র কৃষক প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ কাঠামোর বাইরে রয়েছে। প্রতিষ্ঠিত ঋণ প্রদানকারী সংস্থাসমূহ ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়নে গতিশীল ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে কারণ এ ধরনের প্রচেষ্টায় যেসব বৈশিষ্ট্য দরকার যেমন সহজ ঋণদান প্রক্রিয়া, বন্ধক বিহীন ঋণ, টার্গেট গ্রুপ গঠন, তদারকি ঋণ প্রভৃতি বহুলাংশে অনুপস্থিত। এ ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক এবং কিছু কিছু এন জি ও'র কার্যক্রম প্রমাণ করে যে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণকে তাদের চাহিদামত ব্যবস্থার মাধ্যমে ঋণ প্রদান করে দারিদ্র নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা সম্ভব। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়নের বিশেষ দিক হচ্ছে তাদেরকে গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে সংগঠিত ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থাকরণ। গ্রামীণ ব্যাংক, এন জি ও এবং বি আর ডি বি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকদের এভাবে সংগঠিত করা সম্ভবপর নয় বিধায় ক্ষুদ্র কৃষকদের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে একটি পৃথক সংগঠন প্রয়োজন।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিঋণ সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ হচ্ছে ঃ

(ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ব্যবস্থার শোষণ কমানোর লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ।

(গ) সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিবেচনা এবং অন্যান্য খাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কৃষি ঋণের সুদের হার নির্ধারণ। তবে এই সুদের হার এমন হবে যাতে তদারকি ব্যয়, ঝুঁকি এবং অন্যান্য বিষয়সমূহের খরচ পূরণ করতে পারে।

(ঘ) ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকল্প মূল্যায়ন ও নিরীক্ষণ ক্ষমতার বৃদ্ধিসাধন এবং ঋণের উৎপাদনশীল ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তব তদারকি ব্যবস্থা প্রবর্তন।

(ঙ) ঋণ আদায় পরিস্থিতি উন্নয়ন সাধনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন পাশবুক ব্যবস্থার সদ্ব্যবহার, ঘন ঘন ঋণ মওকুফ না করা ইত্যাদি।

(চ) ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ও সাংগঠনিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সুদের হারসমূহ আংশিক বা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা প্রয়োজন।

(ছ) একটি 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা।

(জ) গ্রামীণ ব্যাংকের অনুরূপ এনজিও কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং কৃষিঋণ কার্য্যাবলীতে বেসরকারী ব্যাংকসমূহের অংশ গ্রহণ উৎসাহিত করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

শস্য বহুবাকরণ এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ঃ

বাংলাদেশে খাদ্য শস্য ছাড়া অন্যান্য ফসলের প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত কম। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে ডাল ও তৈলবীজের কথা উল্লেখ করা যায়। যদিও চাহিদা এবং মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষকরা এসকল পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হবে বলে আশা করা যায় তবু প্রচলিত অর্থনৈতিক নীতিমালার এমন কতগুলি দিক রয়েছে যা অভ্যন্তরীণ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের স্বার্থে বিরোধী। এক্ষেত্রে ভোজ্যতেল এবং গুড়া দুধের আমদানী নীতির কথা উল্লেখ করা যায়। এজন্য যেমন একদিকে আমদানী শুল্কের অসামঞ্জস্যতা দূর করা প্রয়োজন তেমনি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ উৎসাহিত করতে হবে।

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্যে আছে শিল্প প্রক্রিয়াজাতকরণ, গৃহে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ। প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা উন্নয়ন, আধুনিক এবং বিস্তৃত করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তা ধরে রাখা সম্ভবপর হবে না। বিশেষ করে দ্রুত পচনশীল দ্রব্যের ক্ষেত্রে এটি বেশী প্রযোজ্য।

নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করলে কৃষিভিত্তিক শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করবে বলে আশা করা যায় ঃ

(ক) কৃষি পরিবেশ ও বাজার চাহিদার ভিত্তিতে প্রণীত এবং আঞ্চলিক বিশেষত্ব সম্বলিত উৎপাদন কৌশলের মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রাথমিক পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি। বিভিন্ন কোম্পানী নিজস্ব খামারভিত্তিক এবং চুক্তিভিত্তিক কৃষকদের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সহযোগিতা প্রদান করতে পারে।

(খ) বিভিন্ন পণ্যভিত্তিক কারখানা স্থাপন (যেমন বিভিন্ন মৌসুমী ফল প্রক্রিয়াজাতকরণের একক কারখানা), বর্তমানে কারখানায় পণ্য বহুমুখীকরণ, এবং প্রয়োজনে স্বল্পসংখ্যক রপ্তানীমুখী আধুনিক কারখানা স্থাপন।

(গ) প্রধান উৎপাদন অঞ্চলে অবস্থিত কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, শিল্পসমূহে প্রাকৃতিক গ্যাস সংযোগ স্থাপন।

(ঘ) মানসম্পন্ন কনটেইনার এবং মোড়ক–সামগ্রীর উপর আমদানী শুল্ক হ্রাস।

(ঙ) কাঁচামাল ও প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যের মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা প্রচেষ্টা বৃদ্ধি।

(চ) আমদানীকারক দেশসমূহের মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মাননিয়ন্ত্রণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাস্থাপন।

(ছ) প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের মালিক ও ব্যবস্থাপকদের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী ও অন্যান্য সেবা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান।

(জ) তৈল এবং তৈলবীজ আমদানীর ক্ষেত্রে আমদানী শুল্ক সঙ্গতিপূর্ণকরণ।

(ঝ) বড় বড় আড়তদারদেরকে কৃষিপণ্যের শুল্ককরণ, বাছাইকরণ, প্রভৃতি কাজের জন্য যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনে উৎসাহ প্রদান এবং বেসরকারী খাতে গুদামজাতকরণ সুবিধা সম্প্রসারণ খাতে আধুনিক বাজারজাতকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হয়।

রপ্তানী ঃ

বাংলাদেশে প্রচলিত ও অপ্রচলিত উভয় প্রকার ফলমুল, শাক–শব্জী এবং মৎস্য জাতীয় পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ আছে। এর ফলে কৃষকদের আয় বাড়বে এবং রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনও সম্ভবপর হবে। যদিও ১৯৮৬/৮৭ সাল পর্যন্ত মৎস্য, ফল ও শাক–সব্জী রপ্তানী দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন সমস্যার কারণে রপ্তানী বৃদ্ধি ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

রপ্তানী উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাবলীর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে ঃ

(ক) তাজা এবং পচনশীল কৃষি পণ্য রপ্তানীর সুবিধার্থে জিয়া আন্তর্জাতিক, চট্টগ্রাম, সিলেট অথবা যশোর বিমানবন্দরে পর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং মাল পরিবহণ সুবিধা গড়ে তোলা।

(খ) মৎস্য সম্পদ, ফলমূল ও শাক–সব্জী উৎপাদনে আঞ্চলিক, বিশেষিকৃত এবং বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহকে সমর্থন/উৎসাহ প্রদান এবং এই লক্ষ্যে পণ্য চাহিদাভিত্তিক গুদামজাতকরণ ও অন্যান্য অবকাঠামো যেমন রাস্তা, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, যানবাহন প্রভৃতির উন্নয়ন।

পশু সম্পদ, মৎস্য সম্পদ এবং বন সম্পদ ঃ

পশু সম্পদ ঃ

পশু সম্পদ বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যা থেকে প্রাণী জাতীয় প্রোটিন ছাড়াও কৃষি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় পশু শক্তি পাওয়া যায়। চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য একটি প্রধান রপ্তানী পণ্য। বাংলাদেশে সংখ্যার দিক থেকে পশু সম্পদের ঘনত্ব অনেক বেশী; তা সত্বেও পশুজাত দ্রব্য এবং কৃষিকাজ দক্ষভাবে সম্পন্ন করার জন্য পশু শক্তির ঘাটতি প্রকট।

বাংলাদেশের নিজস্ব পশু সম্পদের নিম্ন গুণগত এবং প্রজাতির উন্নয়ন কর্মসূচীর আংশিক সাফল্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধিতে পশু সম্পদ, বিশেষ করে গরুবাছুর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে না। তবে এক্ষেত্রে ছাগলের ভূমিকা অনেক বেশী হতে পারে যাতে মাংস এবং চামড়া সরবরাহ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাবে।

নিম্নলিখিত ব্যবস্থাবলী গ্রহণের সুপারিশ করা যায় ঃ

(ক) বাংলাদেশের পরিবেশ উপযোগী বিভিন্নজাতের পশু সম্পদ উন্নয়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলী নিতে হবে। এক্ষেত্রে ক্রস–ব্রিডিং, ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, পশু স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ ব্যবস্থা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের মাধ্যমে ছোট আকৃতির বাণিজ্যিক পশু ও হাঁস–মুরগী খামার স্থাপনে সহায়তা প্রদান প্রয়োজনীয়।

(খ) পশু খাদ্যের অভাব দূর করার জন্য পশু খাদ্য আমদানী এবং দেশে পশু খাদ্য উৎপাদন শিল্প স্থাপন করা প্রয়োজন। দেশে পশু সম্পদের সংখ্যা প্রাপ্ত পশু খাদ্যের পরিমাণের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পশুশক্তির ঘাটতি যান্ত্রিক লাঙ্গলের মাধ্যমে পূরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(গ) দেশে পশু চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ঔষধ ও উপকরণ উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

(ঘ) দেশে বর্তমান পশু শক্তির ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নিতে হবে ঃ

—পশু সম্পদের গুণগতমান বৃদ্ধির ব্যবস্থা,

—একক মহিষ বা স্বাস্থ্যবান বলদচালিত কৃষি যন্ত্রপাতি প্রবর্ত্তনে ব্যাপক সমীক্ষা,

—সর্বনিম্ন চাষ প্রয়োগ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে প্রয়োজনীয় গবেষণা।

(ঙ) সরকারী খাতে পশু সম্পদ খাতে ব্যয় বরাদ্দ কমপক্ষে ৩ শতাংশে উন্নীত করা।

মৎস্য সম্পদ ঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাণী জাতীয় প্রোটিনের ৮০ শতাংশই আসে মৎস্য সম্পদ থেকে। এছাড়া অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, নিয়োগ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদ প্রধানতঃ অভ্যন্তরীণ এবং সামুদ্রিক উৎস থেকে সংগৃহীত। বর্তমান মৎস্য উৎপাদন প্রায় ৮৫ লক্ষ টন যার ৭৩ শতাংশ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে প্রাপ্ত। মাথা পিছু দৈনিক মৎস্য প্রাপ্তি ১৯৬২/৬৩ সালের ৩৩ গ্রামের তুলনায় বর্তমানে মাত্র ২০·৫ গ্রাম যেখানে মাথাপিছু দৈনিক সর্বনিম্ন প্রয়োজন ৭৩ গ্রাম। সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদনের প্রান্তিক বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ অভ্যন্তরীণ বদ্ধ উৎস থেকে উৎপাদন হ্রাস। এছাড়া অভ্যন্তরীণ মুক্ত এলাকা থেকেও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই।

নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গৃহীত হলে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে ঃ

(ক) বিল এবং হাওড়সমূহ বাৎসরিকভিত্তিতে না দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী (৭ থেকে ১০ বৎসর) ভিত্তিতে লীজ প্রদান;

(খ) দেশের পানি ব্যবস্থায় কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক এবং শিল্প বর্জ্য নিক্ষেপ বন্ধ করা;

(গ) সমন্বিত মৎস্য, শস্য এবং পশুসম্পদভিত্তিক খামার ব্যবস্থা প্রবর্তন;

(ঘ) বর্তমানে প্রচলিত অবৈজ্ঞানিক মৎস্য পোনা ও রেনু সংগ্রহ ব্যবস্থার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা প্রবর্তন;

(ঙ) আধুনিক মৎস্য চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য অব্যবহৃত পুকুর বা জলাসমূহ সরকার কর্তৃক লীজ গ্রহণ এবং দক্ষ উৎপাদনকারীদের লিজ প্রদান;

(চ) মৎস্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তদারকি ঋণ ব্যবস্থা প্রবর্তন;

(ছ) প্রতিটি মৎস্য পোনা উৎপাদন খামারে হ্যাচারী স্থাপনের পরিবর্তে দেশের চারটি বিভাগে চারটি আঞ্চলিক হ্যাচারী স্থাপন এবং প্রতিটি উপজেলায় মৎস্য নার্সারী স্থাপন;

প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ

(জ) বিভিন্ন ভূমি এলাকার জন্য কাম্য মৎস্য-সারের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ;

(ঝ) উদ্ভাবিত মৎস্য উৎপাদন প্রযুক্তি অবিলম্বে উৎপাদনকারীদের নিকট হস্তান্তর। মৎস্য গবেষণার সঙ্গে স্থানভিত্তিক প্রয়োজনীয়তার সংযোগ সাধন।

(ঞ) তাজা এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত মৎস্যের রফতানী বাজার উন্নয়ন।

(ত) বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচের জন্য বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের আগে মৎস্য বিভাগের সাথে পরামর্শ করা।

সামুদ্রিক মৎস্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কি পরিমাণ মাছ ধরা উচিত এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য বিস্তারিত জরীপ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় (trash) মাছ ব্যবহার করে গুড়া মাছ (fish meal) উৎপাদন এবং রফতানী সম্ভাবনা পরীক্ষা করা উচিত। চিংড়ি মাছের মাথা ও লেজ ভিত্তিক হাঁস মুরগীর খাদ্য উৎপাদন শিল্প স্থাপন করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

বনসম্পদ ঃ

প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য দেশের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ এলাকায় বনসম্পদ থাকা প্রয়োজন কিন্তু বাংলাদেশে এই পরিমাণ মাত্র ১৭ শতাংশ। বনসম্পদের বর্তমান উৎপাদন ১৯৭০ দশকের প্রথমভাগের তুলনায় অনেক কম। বর্তমানে সরকারী নিয়ন্ত্রণের মাত্র ৬১ শতাংশ বনাঞ্চলে উৎপাদনশীল। গ্রামীণ বন এলাকাও দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে স্থানীয় পর্যায়ে অংশ গ্রহণমূলক বনসৃষ্টি ও রিজার্ভ বনাঞ্চলের উন্নততর ব্যবস্থাপনা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া জ্বালানী ক্ষেত্রে অন্যান্য উৎস সন্ধান ও তার ব্যাপক ব্যবহার করতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু তার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কাঠের বিকল্প উৎপাদনকারী শিল্পকে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দেয়া দরকার। এক্ষেত্রে সাবসিডি প্রদানের কথা চিন্তা করা যেতে পারে।

সরকারী বনাঞ্চল থেকে অবৈধ উপায় বনসম্পদ আহরণ বন্ধের সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য বর্তমান বন আইনের (Forestry Act) প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সংশোধন আবশ্যক। বৃক্ষ রোপন ও সংরক্ষণকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

থানাভিত্তিক বন উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করাপ্রয়োজন।

কৃষি গবেষণা এবং সম্প্রসারণ ঃ

বাংলাদেশের জাতীয় কৃষি গবেষণা ব্যবস্থা মূলতঃ পণ্যভিত্তিক। বিগত বছরগুলিতে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান নূতন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এক্ষেত্রে ভৌত অবকাঠামো এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল সামগ্রিক কৃষি গবেষণায় প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের দায়িত্বে রত।

বর্তমানে গবেষণা, সম্প্রসারণ এবং কৃষকদের মধ্যে সংযোগ বেশ দুর্বল। বিশেষ করে কৃষকদের চাহিদা এবং গ্রহণীয়তার ভিত্তিতে গবেষণা পরিচালনা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর জোর দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া কৃষি পরিবেশ ও কৃষি জলবায়ুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ খামার ব্যবস্থা ভিত্তিক গবেষণা গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশী হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষিতে উৎপন্ন জাতীয় আয়ের মাত্র ০·৩ শতাংশ কৃষি গবেষণায় ব্যয় করা হয় যা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক কম। কৃষি গবেষণায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া বিভিন্ন কৃষি সমস্যার মধ্যে গবেষণা ব্যয়ের কাম্য বন্টন নির্ধারণ করতে হবে। বর্তমানে ধানের উপর গবেষণায় এ ফসলের

গুরুত্বের তুলনায় খরচ কম হচ্ছে। গবাদি পশুর ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে চা, পাট এবং অন্যান্য আঁশ জাতীয় ফসলের উপর গুরত্বের তুলনায় আনুপাতিকভাবে বেশী খরচ হচ্ছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বর্তমান পদ্ধতি ছাড়াও নূতন গবেষণা ক্ষেত্র চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এজন্য জীনভিত্তিক এবং অন্যান্য আধুনিক গবেষণার প্রয়োজনীয় গুরুত্ব নির্ধারণ করা বাস্তবসম্মত হবে।

গবেষণা ক্ষেত্রে যেসব ব্যবস্থা প্রয়োজন তা হলো ঃ

(১) কৃষি গবেষণায় বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি;

(২) পণ্যের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে গবেষণা ব্যয় বন্টন;

(৩) গবেষণা সম্প্রসারণ—কৃষকদের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি এবং গবেষণাকে কৃষকদের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্পৃক্তকরণ;

(৪) গবেষণা কেন্দ্রসমূহকে বিকেন্দ্রীকরণ এবং মাঠ পর্যায়ে গবেষণাকে বেশী গুরুত্ব প্রদান;

(৫) কৃষি পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট সমন্বিত খামার ব্যবস্থাভিত্তিক গবেষণা উন্নয়ন।

কৃষি সম্প্রসারণ ঃ

বাংলাদেশে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কার্যক্রম সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে সমগ্র দেশে ‘ট্রেনিং এবং ভিজিট’ (টি এন্ড ভি) ব্যবস্থা চালু করা হয়। বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় এই ব্যবস্থা সন্তোষজনকভাবে কাজ করছে না। এই ব্যবস্থার বর্তমান প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে দক্ষ কর্মীর অভাব, অসম্পূর্ণ তদারকি ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান ব্যবস্থার অনুপস্থিতি। সম্প্রসারণ ব্যবস্থার উন্নয়নে কর্মীদের গুণগতমান ও দক্ষতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। এজন্য তাদের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি, শ্রেষ্ঠ ব্লক কর্মীদের বাৎসরিক পুরস্কারের ব্যবস্থা (যা ব্লকের চাষীদের মতামতের ভিত্তিতে হবে) দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশী/বিদেশী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং চাকুরীতে দক্ষতার ভিত্তিতে উচ্চপদে উন্নীত হবার সুবিধা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যায়।

বর্তমান ‘টি এবং ভি’ ব্যবস্থাকে উপজেলায় ‘সমন্বিত সম্প্রসারণ পরামর্শ প্রদান’ ব্যবস্থা দ্বারা সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

যেহেতু আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে বর্তমান সম্প্রসারণ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় বিস্তাার স্বল্প সময়ে করা সম্ভবপর নয়, এজন্য গ্রুপ ভিত্তিক আলোচনাকে বেশী গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে।

কৃষিপণ্যের মূল্য সহায়তা, সংগ্রহ, আমদানী এবং মওজুদ ঃ

খাদ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে সরকারী মূল্য নীতির দুটি লক্ষ্য ঃ উৎপাদকদের জন্য স্থিতিশীল ও আকর্ষণীয় মূল্য প্রদান এবং ভোক্তাদের ক্ষেত্রে স্থিতিশীল ও ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে মূল্য বজায় রাখা। উৎপাদকদের ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক কর্মসূচী হচ্ছে সংগ্রহ অভিযান এবং ভোক্তাদের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে বিভিন্ন বিতরণ মাধ্যম বিশেষ করে খোলা বাজারেবিক্রয়নীতি।

সাধারণভাবে সংগ্রহনীতি লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়নি মনে করা হয়। এধরনের নীতির বাস্তবায়ন সমস্যা ছাড়াও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনে এই নীতির বাস্তবতা প্রশ্ন সাপেক্ষে। ফসলের মূল্যকে ধারণ করার একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষকের আয় স্থিতিশীল করা। কিন্তু ফসলের দাম সাধারণতঃ তখনি পড়ে যায় যখন উৎপাদন আশাতিরিক্ত বেশী হয়, সুতরাং মূল্য কমলেও আয় ততটা কমে না, বা আদৌ না কমতেও পারে। আমন মৌসুমে আশাতিরিক্ত উৎপাদন সাধারণতঃ হয় অধিক বিনিয়োগের জন্য নয়, অনুকূল আবহাওয়ার জন্য। কাজেই মূল্য যখন কমে তখন গড় উৎপাদন ব্যয়ও কমে যায়। এ জন্য আমন মৌসুমে ফসল সংগ্রহ অভিযানের তেমন প্রয়োজন আছে বলে আমরা

মনে করি না। বোরো মৌসুমে উৎপাদন খরচ বেশী, উৎপাদন বৃদ্ধি বিনিয়োগের বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল, সে জন্য এ ক্ষেত্রে দাম পড়ে গেলে তা উৎপাদন ব্যয়ের চেয়েও নীচে নামতে পারে। সংগ্রহ অভিযান শুধুমাত্র বোরো ধান এবং গমের ক্ষেত্রে রাখা যেতে পারে। সুষ্ঠু উন্নয়ন ও সংগ্রহ খরচ সামর্থের মধ্যে রাখার জন্য এক্ষেত্রে বিশ্ব বাজারে সমতাভিত্তিক পূর্ণ ঘোষিত সর্বনিম্ন মূল্যের প্রয়োজন। বাস্তব সংগ্রহ পরিচালিত হবে বাজার নির্ধারিত মূল্য বা সর্ব নিম্ন মূল্যের যেটি বেশী তার ভিত্তিতে। খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজনে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী করা হয়ে থাকে, তা গম হওয়া উচিত, কখনো চাল নয়। চালের আমদানী বেসরকারী খাতে থাকা উচিত। তার উপর স্থিতিশীলতার প্রয়োজনে শুল্ক আরোপ করা যায়।

খাদ্য শস্য মওজুদের ক্ষেত্রে সরকারী খাতে বেশী পরিমাণ মওজুদ করার প্রবণতা রয়েছে। মওজুদ নীতির ক্ষেত্রে সরকার নমনীয় হতে পারে। এক্ষেত্রে খাদ্য মওজুদ ১০ লক্ষ টনের মত হওয়া বাঞ্ছনীয় তবে এর মধ্যে পরবর্তী তিন মাসের প্রত্যাশিত আমদানীর পরিমাণ ধরতে হবে।

কৃষি ক্ষেত্রে মূল্য সহায়তা/স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে পাটকে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে কারণ পাট উৎপাদন কৃষকদের আয়ের একটি বড় উৎস এবং পাটের মূল্য অনেক বেশী পরিবর্তনশীল। তদুপরি উপসাগরীয় যুদ্ধের কারণে পাট রপ্তানী মারফত প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি ও বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থের ক্ষতি কিছুটা কাটিয়া উঠতে সাহায্য করতে পারে। এ জন্য পাটের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ মূল্য সহায়তা কর্মসূচী গ্রহণ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কৃষি উন্নয়ন প্রশাসন ঃ

কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষকরাই মূল ভূমিকা পালন করে। এ জন্য কৃষি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণই প্রধান উপাদান। অবশ্য কৃষকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা তাদেরকে প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা ও উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখন পর্যন্ত এ ধরনের সেবা কৃষকদের আকাঙ্খিত পর্যায়ে যেতে পারেনি। এ জন্য কৃষি উন্নয়ন প্রশাসনের ভূমিকা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন দরকার।

সরকারী ভূমিকার ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতা হচ্ছে সরকার বিভিন্ন এজেন্সীর মাধ্যমে সকল ধরনের উৎপাদনমূলক কাজ করার প্রচেষ্টা নিয়েছে যেমন গবেষণা, শিক্ষা, কৃষি–ব্যবসা, ইত্যাদি। এর ফলে বেসরকারী খাতের উদ্দীপনা হ্রাস পেয়েছে এবং সরকারী খাতের উপর নির্ভরশীলতা বেড়েছে। সরকারী খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক গুণ। এছাড়া বাণিজ্যিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের কারণে সরকারী ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি এবং অদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য সরকারী খাতের ভূমিকা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। সরকারী খাতের ভূমিকা শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফাবিহীন সেবা প্রদান ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়।

এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহের সুপারিশ করা যায় ঃ

(ক) বি এ ডি সি–কে 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যবসায় উন্নয়ন কর্পোরেশনে' রূপান্তরকরণ যার আওতা হবে নিম্নরূপঃ

(১) সকল কৃষি উপাদান ও উৎপন্ন পণ্যের (ফসল, পশু সম্পদ, মৎস্য সম্পদ ও বনসম্পদ) উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ ও সহযোগিতা প্রদান।

(২) কৃষি ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ প্রদান।

(৩) সম্ভাব্য রপ্তানীযোগ্য কৃষি পণ্যের আন্তর্জাতিক চাহিদা নিরূপণ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন।

(৪) স্থানীয় বাজারের উন্নয়ন।

(৫) বেসরকারী উদ্যোক্তাদের বাজার সংক্রান্ত গবেষণায় কারিগরী সহায়তা প্রদান।

(৬) উদ্যোক্তাদের জন্য বাজার ব্যবস্থা নিরীক্ষণ এবং তথ্য প্রদান।

(৭) মূল্য অস্থিরতা নিরসনে প্রধান উপকরণসমূহের বিকেন্দ্রীকৃত মওজুদ রক্ষা।

(খ) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সহিত ফসল, পশু সম্পদ, মৎস্য সম্পদ ও বনসম্পদ সম্পর্কিত সকল প্রকল্প ও কার্যক্রমের সম্প্রসারণ অংশের সমন্বয় সাধন।

(গ) সকল কর্মক্ষেত্রে সাধারণ ব্যবস্থা হিসাবে সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে গ্রহণ ও উন্নয়ন সাধন। কৃষি সমবায় সমিতিসমূহকে বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন বোর্ড হতে বিমুক্তকরণ এবং নিবন্ধিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ কাজ সমবায় বিভাগকে প্রদান। বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন বোর্ড শুধুমাত্র গ্রামীণ দরিদ্র কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(ঘ) খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থার মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমকে প্রধান পণ্যসমূহের মূল্য অস্থিরতা নিরসনের জন্য বিকেন্দ্রীকৃত আপৎকালীন মওজুদ সংরক্ষণে সীমিত রাখা এবং সুনির্দিষ্ট খাদ্য নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবহার করা।

(ঙ) অন্যান্য সকল কৃষি সংক্রান্ত সরকারী খাতের কার্যক্রমকে (ফসল, পশু সম্পদ, বনসম্পদ, মৎস্য সম্পদ এবং পরিবেশ) একটি মন্ত্রনালয় যথা 'খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়' এর আওতায় সমন্বয় সাধন যার উদ্দেশ্য হবে নিম্নরূপঃ

(১) শুধুমাত্র কয়েকটি দক্ষ জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ যেগুলি সকল সম্ভাব্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সরকার বা এন জি ও কে প্রয়োজনীয় কারিগরী তথ্য প্রদান করবে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এই সকল প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা নীতি ও পেশাদারী সহায়তা প্রদান করবে।

(২) সকল প্রকার বীজ ব্যবহারের বিস্তার ও বর্ধিতকরণের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ সংগঠনের জন্য একটি দক্ষ ও যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ বীজ সত্যায়ক এজেন্সী সংগঠন করা।

(৩) বেসরকারী খাতে পশু চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় প্রসার না ঘটা পর্যন্ত একটি দক্ষ ও যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ পশু চিকিৎসা ব্যবস্থা সংরক্ষণ করা।

(৪) বিভিন্ন পরিবেশগত অঞ্চলের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ বনসম্পদ উন্নয়ন ও সুরক্ষা করা।

(৫) প্রধান কৃষিপণ্য এবং কৃষি উপকরণ যথা, রাসায়নিক সার, কীট নাশক ইত্যাদির আপৎকালীন মওজুদ রক্ষা করা।

(৬) কৃষি সংক্রান্ত আইনসমূহের বাস্তবায়ন নিরীক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়ন।

(৭) কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিসমূহের পরীক্ষা ও সংশোধন সাধন।

(৮) কৃষি উৎপাদন ও উপকরণের ক্ষেত্রে বাৎসরিকভিত্তিতে সাবসিডি/কর নির্ধারণ। এ জন্য একটি 'কৃষিপণ্য মূল্য কমিশন' স্থাপন করা যেতে পারে।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য প্রচলিত সংগঠনসমূহের কাঠামোগত ও কার্যাবলীর পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হবে। এই সংক্রান্ত পরিবর্তনের লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়ন প্রশাসনের সামষ্টিক সংগঠনের একটি খসড়া 'প্রদর্শনী ১' এ দেয়া হয়েছে।

টাস্ক ফোর্সঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রক্রিয়া পরিকল্পনা

একটি মূল্যায়ন

ক্রমিক নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	অধ্যাপক এম, আমিনুল ইসলাম	ভূগোল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আহবায়ক
২।	অধ্যাপক এম, শাহজাহান	প্রকৌশলবিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩।	ডঃ আইনুন নিশাত	পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, প্রকৌশলবিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪।	ডঃ স্বপন আদনান	বি, এ, আর, সি	সদস্য
৫।	ডঃ এম, এ, কাশেম	সিনিয়র রিসার্স ফেলো, বি· আই· ডি· এস·	সদস্য
৬।	ডঃ এ, টি, এম, শামসুল হুদা	যুগ্ম–সচিব, সেচ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭।	জনাব এ, খালেক	যুগ্ম–প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৮।	ডঃ কাজী শাহাবুদ্দিন	পরামর্শক, এম· পি· ও	সদস্য
৯।	ডঃ মশরুর–উল হক সিদ্দিকী	পরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১০।	অধ্যাপক খন্দকার মোস্তাহিদুর রহমান	পরামর্শক, এম· পি· ও	সদস্য
১১।	জনাব মোঃ নূরুল হুদা	চেয়ারম্যান, বন্যা পরিকল্পনা সমন্বয় সংস্থা	সদস্য
১২।	ডঃ মওদুদ এলাহী	ভূগোল বিভাগ, জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য

বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রক্রিয়া পরিকল্পনা ঃ একটি মূল্যায়ন

বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশে বন্যা একটি জটিল আকার ধারণ করেছে এবং আর্থ–সামাজিক অবস্থার উপর চরম বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে আসছে। ১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যা আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইউ, ইন, ডি, পি, ই, ই, সি, বিশ্বব্যাংক, ইউ, এস, এইড, জাপান এবং ফ্রান্সের সহযোগিতায় বন্যা সমস্যার সাথে দীর্ঘ মেয়াদী বাস্তবায়ন পরিকল্পনার সমন্বয় করার মানসে বাংলাদেশ সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম চালু করে। বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনা (Flood Action Plan) নামে খ্যাত এই কার্যক্রম ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সাহায্যদাতাদের সভায় অনুমোদন লাভ করে এবং বর্তমানে সেচ, পানি উন্নয়ণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে।

বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনার প্রধান উপাদান (main components) এবং সাহায্যকারী কার্যসমূহ (Supporting Activities) ১১টি নির্দেশিত নীতিমালার ভিত্তিতে ২৬টি প্রকল্পে বিভক্ত। চালু (on-going) প্রকল্প ও পাইলট প্রজেক্ট ছাড়া প্রকল্পের কার্যক্রম (ক) পরিকল্পনা, (খ) বিশেষ, (গ) সামাজিক–অর্থনৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক নিরীক্ষা এঘং (ঘ) জরীপ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সিষ্টেমে বিন্যস্ত এবং পাঁচ বছরের অধিককাল একটি ধাপ বিশিষ্ট প্রক্রিয়া পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার অধীনে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৪৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনা বন্যা দুর্যোগ সমাধানে কৌশল হিসাবে যদিও কাঠামোগত পদ্ধতির উপর বিশেষভাবে আস্থা স্থাপন করেছে, রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে তাদের এমনভাবে পরিকল্পিত হতে হবে যাতে কৃষি, মৎস্য, নৌবাহ এবং পরিবেশসহ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক চাহিদা পূরণ হয়। অন্য কথায় কৌশল হিসেবে কাঠামোগত ও অকাঠামোগত বিধি–ব্যবস্থার সমন্বয়ের সুযোগ রয়েছে।

বিভিন্ন প্রকার প্রামানিক এবং প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে আলোচনার সুবিধার্থে বিভিন্ন ধরনের বিচার্য বিষয় চিহ্নিত করা হয়, এবং বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনা নিরীক্ষণের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। যে বিষয়সমূহ আলোচনার দাবী রাখে তাদের নিম্নলিখিত পাঁচটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়। যেমন—

(ক) সাধারণ বিচার্য বিষয়;

(খ) প্রযুক্তিগত বিষয়সমূহ;

(গ) সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ;

(ঘ) বাস্তব এবং পরিবেশগত বিষয়সমূহ; এবং

(ঙ) সাংগঠনিক এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়সমূহ।

(ক) সাধারণ বিচার্য বিষয় ঃ

বন্যা প্রকল্প পরিকল্পনা শুধুমাত্র একটি সীমিত পরিসরে সরকারী মহলে আলোচিত হয়েছে। বেসরকারী পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ মহল দ্বারা পরিকল্পনাটি মূল্যায়ন করা হয়নি অথবা একটি মুক্ত আলোচনার ফলস্বরূপ বিষয়টি আত্মপ্রকাশ করেনি। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোতেই তা সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়। এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে একটি নির্দলীয়, নিরপেক্ষ সরকারের উদ্দ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমেই এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয় মুক্ত আলাচনার সুযোগ পেয়েছে। এ ছাড়াও বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনা পূর্ণসুত্রবদ্ধ বিধায় এর পূর্ণ মূল্যায়ন, উন্নতি বিধান, সংযোজন এবং সংশোধনের সুযোগ রয়েছে বলে কমিটির সদস্যরা মনে করেন। এ প্রসংগে ঐকমত্য পোষণ করা

হয়.এই মর্মে যে বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনা উপাদানসমূহের সাথে অনুসন্দেহ বিষয় প্রস্তুতিপর্বে বন্যা দুর্যোগের তীব্রতা হ্রাসে বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ এবং সম্প্রদায় বিজড়িতকরণ প্রক্রিয়ার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

(খ) প্রযুক্তি বিষয়সমূহ ঃ

বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনা প্রণয়নে যে প্রযুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সে প্রসংগে প্রশ্ন উঠে যে বিকল্প অন্য কোন প্রযুক্তি বেছে নেওয়ার জন্য পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা চালান হয়েছিল কিনা অথবা বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য একটি পূর্ব নির্ধারিত ধারণা অথবা নীতিমালা আরোপিত হয়েছে কিনা। মূল বিচার্য বিষয়ের মধ্যে ভূ-তাত্বিক এবং ভূমিরূপ বিষয়াদি এসে যায় এই কারণে যে বাংলাদেশ ভূ-গাঠনিকভাবে একটি সক্রিয় এলাকায় অবস্থিত। নদী প্রবাহের পরিবর্তন এবং নদী ভাংগন প্রক্রিয়া প্রভৃতি এই এলাকায় ভূ-গঠনের সংগে জড়িত। বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনায় উপরোক্ত বিষয়াদির কি প্রতিক্রিয়া হবে তার মূল্যায়ন প্রয়োজন।

বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনায় যে ছয়টি আঞ্চলিক সমীক্ষা প্রস্তাব করা হয়েছে তার জন্য পূর্বশর্ত হিসেবে পরিপূর্ণভাবে ভূ-তাত্বিক এবং ভূমিরূপ নিরীক্ষার প্রয়োজন। প্রস্তাবিত ছয়টি পরিকল্পনা অঞ্চল গঠনের যে যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছে তা অর্থবহ হচ্ছে না এই কারণে যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সীমানার বাইরের পরিস্থিতির সাথে সম্পর্ক মূল্যায়ন করা হয়নি। অধিকন্তু যেহেতু শতকরা ৯০ ভাগ ভূ-পৃষ্ঠে সংলগ্ন পানি প্রবাহ সীমানা বহির্ভূত অঞ্চল হতে আগত সেইহেতু প্রযুক্তিগত পদ্ধতির উপযোগিতা পূনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রযুক্তিগত সমাধান বলতে যা বোঝান হয়েছে তার মধ্যে শুধুমাত্র কাঠামোগত প্রতিবিধান/পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এ ধরনের সমাধানের গঠন কাঠামো যেমন বাঁধ (embankment), শুধু বৃহৎ আকারেরই হয় না, বাস্তবায়নেও প্রয়োজন হয় বিপুল অর্থের। সময়কালও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাঠামোগত এবং প্রকৌশল (structural এবং engineering) সমাধান যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ফলপ্রদ পদক্ষেপ সে সম্পর্কে কোনরকম সন্দেহ পোষণ না করে একথা বলতে হচ্ছে যে, উপরোক্ত পদক্ষেপ বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণে সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। যার প্রমাণ ১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ সালের বন্যা। আসলে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকল্পে যে মাত্রা নির্ধারিত হয়ে থাকে (এবং তদনুসারে যে ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়), সেই মাত্রা যদি লংঘিত হয় তাহলেই বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তা সে যে প্রকারেরই হোক না, তা হয় আংশিক এবং কোনো অবস্থাতেই স্থায়ী বা সার্বিক হতে পারে না।

(গ) সামাজিক, অর্থনীতি ও পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ ঃ

জাতীয় উন্নয়নে চিহ্নিত উদ্দেশ্যাবলীর সাথে যথা, দারিদ্র দুরীকরণ, স্বয়ং-সম্পূর্ণতা এবং অব্যাহত আর্থনীতিক উন্নয়নের সাথে বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের যে উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে, এর জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনায় বিদেশী দাতা সংস্থাসমূহের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য পাওয়া গেলেও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার পূর্ণ বাস্তবায়ন হবে অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এই প্রেক্ষিতে বিচার করলে এই প্রতীয়মান হবে যে আমাদের মূল সমস্যা কেবল বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আদর্শ কারিগরী সমাধান উদ্ভাবন করা নয়; বরং সীমিত সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি সুষম বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন।

উপরন্তু, যেহেতু এই বিনিয়োগ দীর্ঘ মেয়াদী বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরশীল, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এই ঋণ পরিশোধের ভার বহন করে যেতে হবে। এজন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণের এবং বন্যার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার উপশমের বিকল্প পদ্ধতিসমূহকে তাদের সামাজিক আর্থনীতিক এবং পরিবেশগত ভারসাম্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বিশদ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনা public goods এর একটি ক্লাসিক দৃষ্টান্ত বহন করছে। তাই এই পরিকল্পনায় বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র সামাজিক মূল্যায়নের মাপকাঠিতেই বিবেচিত হতে পারে।

তা'ছাড়া বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনা প্রস্তুতির পূর্বে সংশ্লিষ্ট নিবিড় আর্থনীতিক এবং সামাজিক মূল্যায়ন করা হয়নি। জাতীয় পানি পরিকল্পনার সাথে বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনা সম্পর্কিত পদ্ধতি, বিচার্য বিষয়সমূহ, বিশেষ করে উপাদানসমূহের সাথে সমন্বয় করা সম্ভব কিনা তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। একই সাথে বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনার আওতায় ভৌতনির্মাণ প্রকল্পে গুরুভার (massive) বিনিয়োগের পূর্বে সম্পর্কিত কৃষি, সামাজিক, আর্থনীতিক এবং পরিবেশগত বিষয়ের ব্যাপক মূল্যায়নের যথাযথ প্রতিবিধান নিশ্চয়তা করা প্রয়োজন।

(ঘ) বাস্তব এবং পরিবেশগত বিষয়সমূহ ঃ

বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনায় দীর্ঘ মেয়াদী বন্যা সমস্যার সমাধান যখন নিয়ত সতর্কবার্তা (monitoring) এবং তার মূল্যায়নসহ উপাত্ত কাঠামোর ভিত শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে অকাঠামোগত এবং অপ্রকৌশলী (non-structural) এবং (non-engineering) উপাদানসমূহ যেমন কৃষি, মৎস্য, পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়াদি পরিকল্পনার সংগঠনে উপযুক্তভাবে প্রতিফলিত না হওয়ার লক্ষণাদি বিদ্যমান। পরিবেশগত বিষয়সমূহ এবং ঐতিহ্যিক (traditional) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান তার নিরসনকল্পে প্রবর্তিত নতুন ধারণা, যথা— নিয়ন্ত্রিত বন্যা এবং খোপ পদ্ধতির (controlled flooding এবং compartmentalization) আরো in-depth মূল্যায়ন প্রয়োজন, বিশেষ করে বাস্তব ব্যবস্থা এবং পরিবেশের উপর কি প্রকারের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে সে সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা লাভ অন্যতম একটি পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হতে হবে। যে পর্যন্ত না এ সম্পর্কীয় সমীক্ষা সমাপ্ত হয় ততদিন পর্যন্ত কোন প্রকার কাঠামোগত নির্মাণ কাজ স্থগিত রাখার প্রস্তাব রাখা হোলো।

(ঙ) সাংগঠনিক এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়সমূহ ঃ

বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনার সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনার দিকসমূহ ও টাস্ক ফোর্স বিবেচনা করে। উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্গত উপাদানসমূহ পারস্পরিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা এবং ''এফ, পি, সি, ও'' এর অস্তিত্বমান কাঠামো উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদানসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনে সহায়ক কিনা, এ দুটি সম্যক বিবেচনার অন্তর্গত ছিল।

আপাততঃ দৃষ্টিতে বন্যা পরিকল্পনার অন্তর্গত মূল ও সাহায্যকারী উপাদানসমূহ সংগতিপূর্ণ হলেও উপাদানসমূহের সময়বিন্যাসের প্রেক্ষিতে সমন্বয়ের অপূর্ণতা লক্ষ্য করা যায়।

এ ছাড়া সাহায্যকারী উপাদানসমূহের গুরুত্বের দিক বিবেচনায় কৃষি, মৎস্য, অর্থনীতি, সমাজতত্ব, পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞগণের সমূহ গুরুত্ব থাকা সত্বেও দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত এফ, পি, সি, ও, এর মূল বিশেষজ্ঞ প্যানেল প্রকৌশলী বিশেষজ্ঞ প্রদান। বেসরকারী উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণের নিযুক্তির ব্যবস্থা থাকলেও ঐ নিযুক্তি বৈষম্যমূলক প্রতীয়মান হওয়ায়, তা অচিরেই নিরসনপূর্বক, এক্ষেত্রেও প্যানেল বিশেষজ্ঞদের নিয়োগের জন্যে প্রচলিত নিয়মই অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

এছাড়া এ পরিকল্পনার অন্তর্গত উপাদানসমূহ বাস্তবায়নে দেশে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ থাকা সত্বেও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা জাতীয়ভাবে স্বয়ম্ভরতা নীতিকেই অবজ্ঞা করেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনা একটি জাতীয় সম্পদ বিধায় জাতীয় স্বার্থ রক্ষার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার উপাদানসমূহ বাস্তবায়নে জাতীয় স্বার্থ ও বেসরকারী স্বার্থের একটি দ্বন্দ্বমূলক অবস্থার সৃষ্টি কখনও কাম্য হতে পারেনা।

(চ) সুপারিশমালা ঃ

১। বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনার ৬টি উদ্দেশ্য এবং ১১টি সুনির্দিষ্ট নীতিমালাসহ সমগ্র বিষয়টি বাংলাদেশের পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক ও প্রযুক্তিগত বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিশদ নিরীক্ষণ করা প্রয়োজন।

২। কৃষি, আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত ভারসাম্যের প্রতিক্রিয়ার বিশদ গবেষণা ও সমীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বন্যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রশমনের বিকল্প পদ্ধতিসমূহের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

৩। বন্যা দুর্যোগ মোকাবেলার আসল উদ্দেশ্য হতে হবে কিরূপে বা কি প্রকারে বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমানো যায়। বন্যা নিয়ন্ত্রণ মতবাদের পরিবর্তে বন্যা দুর্যোগ adjustment এর ওপর জোর দেওয়া উচিত।

৪। বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনায় যে বিষয়টি বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বাগ্রে উল্লেখের দাবী রাখে তা'হলো কিভাবে কাঠামোগত ব্যবস্থাদি অকাঠামোগত ব্যবস্থাদির সাথে সমন্বিত করা যায়। অকাঠামোগত ব্যবস্থাদি দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী হতে পারে, এর বাস্তবায়নও সহজ এবং কম খরচে প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব। এ প্রকার ব্যবস্থাদি গ্রহণে শুধুমাত্র public sector'ই জড়িত হবে না, সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতার মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে এবং এসব ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমানোর প্রচেষ্টা সফল হতে পারে।

৫। বন্যা দুর্যোগ মোকাবেলায় যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক না কেন স্থানীয় জনগণের প্রত্যাশা, চাহিদা, সংস্কৃতি এবং প্রাপ্ত প্রযুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৬। বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনার আওতাধীন ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ এবং ১৯ প্রকল্পসমূহের দ্বারা উপাত্তসমূহ না পাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কোন ধরনের ব্যাপক ভৌত নির্মাণ কার্য শুরু না করার প্রস্তাব রাখা হল। অর্থাৎ কাঠামোগত ব্যবস্থাদি নেওয়ার পূর্বে সাহায্যকারী সমীক্ষার বিন্যাস এবং চূড়ান্তকরণ আশু কর্তব্য। একই সাথে বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনা ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯ এবং ২৩ স্বতন্ত্র অথবা অন্যতম একটি প্রধান উপাদান হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত।

৭। বন্যা প্রক্রিয়া পরিকল্পনার প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিশদ মূল্যায়ন প্রয়োজন। বিশেষ করে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষিতে সকল সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে মূল বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন করা প্রয়োজন এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৌশল ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়োগের পদ্ধতি অচিরে নিরসনপূর্বক, মূল বিশেষজ্ঞ প্যানেলের অনুরূপ নিয়োগ পদ্ধতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

73369

9 JUL 1992

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার ঢাকা

টাস্ক ফোর্স ঃ ভূমি নীতি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন	সমবায় ও বিপণন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	আহবায়ক
২।	ডঃ কামাল সিদ্দিকী	পি· এ· টি· সি·	সদস্য
৩।	ডঃ এ মুয়িদ চৌধুরী	মহাপরিচালক, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়	ঐ
৪।	ডঃ মাহবুব উল্লাহ	অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ঐ
৫।	ডঃ হোসেন জিল্লুর রহমান	বি· আই· ডি· এস·	ঐ
৬।	ডঃ মাহমুদা ইসলাম	সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ঐ

ভূমি নীতি

১। বাংলাদেশ ভূমি সংস্কারের ইতিহাস মূলতঃ কাগুজে কর্মসূচী প্রণয়নের ইতিহাস। উদাহরণস্বরূপ ১৯৮৪ এর ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের বর্গা প্রথা সংস্কার আইনের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রায় ৭ বৎসরের ব্যবধানে অর্থাৎ ১৯৯১ এর জরিপে প্রকাশ পায় যে গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৯০ ভাগ লোক এই কাগুজে সংস্কার থেকে কোন সুফল পাওয়া দূরের কথা এ ধরনের কোন আইন সম্বন্ধেই অবগত নয়।

২। মূলতঃ তিনটি দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র তথা সমগ্র সমাজের কল্যাণে ভূমি সংস্কার কর্মসূচী কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি।

(ক) রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আইন–প্রণেতা দুই দলই বাংলাদেশে জমির সামগ্রিক স্বল্পতার বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে অনুধাবন করেননি। এর ফলে নীতিমালা প্রণয়নে ভূমির সুষ্ঠু ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের বিষয়টি তুলনার মালিকানার বৈষম্যের বিষয়টির অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে যদিও বাস্তবে এ প্রাধান্য আরোপ কোন কার্যকর ফলাফল বয়ে আনতে পারেনি।

(খ) বাংলাদেশ আয়তনে ছোট হলেও ভূমি সম্পদ ও ভূমি সমস্যার দৃষ্টিকোন থেকে এখানে এলাকা ভিত্তিক অনেক ধরনের তারমত্য বিদ্যমান। নীতি প্রণয়নে এ বিষয়টিও যথেষ্ট অনুধাবিত হয়নি যার ফলশ্রুতিতে কর্মসূচী বাস্তবায়নও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ খাস জমি বিতরণ কর্মসূচীর উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশের সব জেলায় খাস জমি সমভাবে নাই। খাস জমির আধিক্য মূলতঃ কয়েকটি উপকূলীয় ও জোতদার প্রভাবিত এলাকায় সীমাবদ্ধ। খাস জমি বিতরণ কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করতে হলে প্রয়োজন এ সব নির্দিষ্ট কয়েকটি এলাকায় সময়সীমা বেঁধে দিয়ে উচ্চ পদস্থ প্রশাসনিক তদারকির আওতায় কর্মসূচীর সমাপ্তকরণ। সংশ্লিষ্ট গ্রামে পূর্ব ঘোষণা প্রদান করে জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর নেতৃত্বে পুলিশ সুপার/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রকাশ্য জনসভায় সরেজমিনে যাচাই ও বাচাই এর মাধ্যমে খাস জমি বরাদ্দ প্রাপকদের তালিকা প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করতে হবে। কিন্তু বর্তমান কর্মসূচী এ এলাকাভিত্তিক তারতম্যকে গুরুত্ব না দিয়ে সারা দেশের জন্যে একটি গতানুগতিক আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কর্মসূচী বাস্তবায়নের ওপরই প্রাধান্য দিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে এ কর্মসূচীর কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি (মূল রিপোর্টে বিস্তারিত তথ্য প্রনিধানযোগ্য)।

(গ) যে কোন ভূমি সংস্কার কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কখনই সম্ভব যখন এ ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাঠামো থাকে। এ কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে কর্মসূচী যত সৎ উদ্দেশ্যেই প্রণীত হোক না তা কাগুজে কর্মসূচীতে পর্যবসিত হতে বাধ্য। বাস্তবেও তা হয়েছে। এমতাবস্থায় ভূমি প্রশাসনের দুর্বলতা দূরীকরণই ভূমি সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশে ভূমি প্রশাসনের দুর্বলতা মূলতঃ দু'দিক থেকে বিবেচ্য। প্রথমতঃ জমির মালিকানা তথ্যের অসম্পূর্ণতা ও অবৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ। দ্বিতীয়তঃ ভূমি প্রশাসনভিত্তিক নির্দিষ্ট কোন প্রশাসনিক ক্যাডারের অনুপস্থিতি। এ দুই দুর্বলতার কারণেই শুধু যে ভূমি সংস্কার কর্মসূচী ব্যাহত হচ্ছে তা নয়, বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ ও খুনোখুনি একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি হিসেবে পুরো দেশটাকেই আক্রান্ত করে এসেছে এবং এখনও হয়ে আসছে।

(ঘ) এ পর্যন্ত যে সমস্ত ভূমি বিষয়ক আইন ও বিধিমালা প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে পরিবেশ রক্ষা (বিশেষ করে ভূমি সংরক্ষণ) এবং পরিবেশ ভারসাম্য দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন প্রচেষ্টার বিষয়াদির উপরে সুনির্দিষ্টভাবে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

৩. সুপারিশমালা ঃ

(ক) ভূমি ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও উন্নয়ন ভূমি নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হতে হবে।

(খ) সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বি,সি,এস, প্রশাসনিক ক্যাডারে একটি বিভাজন টেনে ম্যাজিষ্ট্রেট পুল ও ভূমি ব্যবস্থাপনা পুল তৈরী করতে হবে। ভূমি ব্যবস্থাপনা পুলে যে সব অফিসাররা প্রবেশ করবেন তারা চাকুরীর প্রথম সময়কাল (৬ থেকে ৮ বৎসর) উক্ত পুলের অধীনে চাকুরী করতে বাধ্য থাকবেন। এতে করে এ সব অফিসার ভূমি ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ পাওয়ার সুযোগ পাবেন। পরবর্তীতে ভূমি ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে পদোন্নতি পাওয়ার ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবস্থাপনা পুলের অফিসারদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(গ) ভূ–সম্পত্তি মালিকানা ও মালিকানা হস্তান্তর সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংরক্ষণের বর্তমান ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে হবে। বর্তমানে ভূ–সম্পত্তি হস্তান্তরজনিত দলিল রেজিষ্ট্রেশনের কাজ জেলা রেজিষ্টার অথবা সাব–রেজিষ্টারগণ করে থাকেন। হস্তান্তরিত জমি সম্বন্ধে কোন তথ্য রেজিষ্টারগণের কাছে না থাকায় পূর্ব মালিকানা যাচাই না করে প্রতিনিয়ত ভূয়া ও কাল্পনিক ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে থাকে। এরই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে অধিকাংশ দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সৃষ্টি হয়। তদুপরি ক্রয় বিক্রয়ের সংগে সংগে জারীর ব্যবস্থা চালু না থাকায় ভূয়া দলিল তৈরী করে একাধিক হস্তান্তর শুধু ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে নয় বরং খাস জমি, অর্পিত সম্পত্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রেও নানাবিধ জটিলতা সৃষ্টির সুযোগ আছে এবং অহরহ তা করা হচ্ছে।

প্রজাস্বত্ব সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনার স্বার্থে জমি হস্তান্তর সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাজকর্ম একই সাথে পরিচালিত হওয়া এবং জমি ক্রয়–বিক্রয়ের সংগে সংগে তাৎক্ষনিকভাবে নাম জারীর পদ্দতি চালু করা বাঞ্চনীয়।

এ বিবেচনায় জমি হস্তান্তরের নিবন্ধকরণ সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ উপজেলার সহকারী কমিশনারের (ভূমি) ওপর ন্যস্ত করার সুপারিশ করা হচ্ছে। এ ধরনের ব্যবস্থা চালু করা হলে ভূমি রেকর্ডে সব সময়ই ভূমির সর্বশেষ মালিকানা প্রতিফলিত হবে। এর ফলে বর্তমান ব্যয়বহুল ও জনগনের জন্য হয়রানীমূলক জরিপ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে (বিস্তারিতের জন্য পরিশিষ্ট–২ দেখুন)।

(ঘ) শহরাঞ্চলের জন্য জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, এবং ভূমির নিবিড় ব্যবহারের সংগে সম্পৃক্ত করে যথোপযোগী প্রগ্রেসিভ ভূমি কর কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে (বিস্তারিতের জন্য পরিশিষ্ট–৩ দেখুন)।

(ঙ) সরকারের জমি হুকুম দখলের প্রয়োজনীয়তা একটি জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতির আলোকে কঠোরভাবে নিরূপণ করতে হবে।

(চ) যে সব এলাকায় খাস জমির আধিক্য আছে যেমন উপকূলীয় জেলাগুলোতে সেখানে নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা করে সরকার নিযুক্ত উচ্চ পদস্থ কমিটির তদারকিতে খাস জমি বিতরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট গ্রামে পূর্ব ঘোষণা প্রদান করে জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর নেতৃত্বে পুলিশ সুপার/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সমন্বয় গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রকাশ্য জনসভায় সরেজমিনে যাচাই ও বাছাই এর মাধ্যমে খাস জমি বরাদ্দ প্রাপকদের তালিকা প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করতে হবে।

(ছ) জলমহাল ব্যবস্থাপনায় কোন একক নীতি অনুসরণ না করে আঞ্চলিক বৈশিষ্টের আলোকে একাধিক নীতির সমন্বয় সাধন করতে হবে।

(জ) জনস্বার্থে ঔপনিবেশিক আমলে প্রণীত বন সংক্রান্ত আইন ও প্রশাসনিক কাঠামোর সময়োপযোগী ও সুষ্ঠু পরিবর্তন সাধন করতে হবে যাতে বন সম্পদ উন্নয়ন দক্ষতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে আনয়ন করা যায় এবং বন ও মানুষের সম্পর্কে দারিদ্র নিরসন পরিবেশ রক্ষার কাজে ব্যবহার করা যায় (পরিশিষ্ট– ৪ দেখুন)।

টাস্কফোর্স ঃ দারিদ্র্য দূরীকরণ

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	ডঃ মাহবুব হোসেন	মহাপরিচালক বিআইডিএস	আহবায়ক
২।	জনাব বদিউর রহমান	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন	সদস্য
৩।	জনাব সালাহ উদ্দিন আহমেদ	ব্র্যাক	সদস্য
৪।	জনাব কে, মাহমুদুর রহমান	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৫।	মিসেস খুশী কবীর	নিজেরা করি	সদস্য
৬।	ডঃ বিনায়েক সেন	বি, আই, ডি, এস,	সদস্য
৭।	জনাব জিল্লুর রহমান	প্রাক্তন যুগ্ম–প্রধান পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৮।	ডঃ এস, আর, ওসমানী	বি, আই, ডি, এস,।	সদস্য

দারিদ্র্য দূরীকরণ

বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি অসহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত ১৯৮৮–৮৯ সালের পারিবারিক আয়–ব্যয় সংক্রান্ত জরিপের প্রাথমিক ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্যপীড়িত জনসংখ্যা প্রায় ৪৩ শতাংশ। এই হার পাকিস্তানে ২৩ শতাংশ, শ্রীলংকায় ২৭ শতাংশ এবং ভারতে ৩৫ শতাংশ। বাংলাদেশের মত জমির অপ্রতুলতা সত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়া ১৯৭০–৮৭ সময়কালে দরিদ্র জনসংখ্যা অনুপাত ৫৮ থেকে ১৭ শতাংশে কমিয়ে এনেছে অথচ স্বাধীনতা উত্তরকালে এ বিষয়ে আমরা তেমন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারিনি। সুতরাং দারিদ্র্য দূরীকরণ আমাদের উন্নয়ন প্রয়াসের যে প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত সে সম্পর্কে দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই।

মানুষের কতকগুলি মৌলিক সামর্থ্যের অভাবই দারিদ্র্য। অকাল মৃত্যু ও দুরারোগ্য ব্যাধির আশংকামুক্ত, সুস্থ ও সক্রিয় দীর্ঘ জীবন যাপন, পর্যাপ্ত বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকার নিয়ে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকা ইত্যাদি এসব মৌলিক সামর্থের অন্তর্গত। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে তাই আয় ও পুষ্টির বিষয়গুলো ছাড়াও স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অর্ন্তনিহিত গুণাবলীর বিকাশ সাধনের সুযোগ, রাষ্ট্রীয় সম্পদ বন্টন ব্যবস্থায় দরিদ্র জনগণের ন্যায্য অংশ নিশ্চিতকরণ, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনায় আনতে হবে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধি করতে পারলে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা জনগণ নিজেরাই মেটাতে পারতো। কিন্তু বর্তমানে শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধির হারও প্রকট বেকারত্বের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত নয়। এ টাস্ক ফোর্সের জন্যে সম্পাদিত শ্রমের চাহিদা ও যোগানের গতিধারার উপর একটি বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বর্তমান ৩·৮ শতাংশ থেকে ৫·০ শতাংশ উন্নীত করতে পারলেও ২০০০ সালেও প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব সম্পূর্ণ দূর করা যাবে না। সুতরাং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টার সাথে সাথে সরাসরি দারিদ্র বিমোচনমুখী কর্মসূচী সম্প্রসারণের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। অন্যথায় ২০০০ সালের মধ্যে দারিদ্র অবস্থা সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে না।

দারিদ্র্য বিমোচনের তিনটি প্রধান পন্থা চিহ্নিত করা যেতে পারে। (ক) সামাজিক অবকাঠামো বিশেষতঃ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতসমূহে বর্ধিত বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলার সার্মথ্য বাড়িয়ে দেয়া যায় এবং মানুষকে তার আশে পাশের সুযোগসমূহ গ্রহণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত জীবনাযাত্রার মান অর্জনে সহায়তা করা যায়, (খ) বিভিন্ন অর্থনৈতিক নীতিমালা ও উন্নয়ন কৌশলের উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন বা বর্দ্ধিত আয়ের বন্টনকে অধিকতর সুষম করে দারিদ্র্য নিরসনে সহায়তা করবে, এবং (গ) প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় যে সব জনগণ অবহেলিত থাকবেন তাঁদের জন্যে ন্যূনতম নিরাপত্তা বেষ্টনী (Safety net) সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন লক্ষ্যগ্রুপ মুখীন (target group oriented) কর্মসংস্থান ও আয় বর্দ্ধনকারী বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ।

উপরোক্ত বিবেচনায় টাস্ক ফোর্সে নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ সুপারিশ করছে ঃ

— সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টির জন্যে ১৯৯৫ সালের মধ্যে প্রতি দুই বর্গকিলোমিটারে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া।

— দীর্ঘমেয়াদে সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালের মধ্যে প্রতি ৪ বর্গকিলোমিটারে একটি এবং ২০০০ সালের মধ্যে প্রতি ২ বর্গকিলোমিটারে একটি মাধ্যমিক স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া।

—২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির ব্যবস্থা নেয়া এবং এ উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যনীতিকে ঢেলে সাজানো ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি।

—খাস জমি বন্টনে দুঃস্থ মহিলা পরিবার–প্রধানদের অগ্রাধিকার প্রদান।

—দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় প্রয়োজনীয় মূলধন যোগানে সহায়তা করার জন্যে ২০০০ সালের মধ্যে সকল ইউনিয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের মত ব্যাংকের শাখা স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া। এই উদ্দেশ্যে ঋণদান কর্মসূচীতে প্রয়োজনীয় ভর্তুকীর ব্যবস্থা করা।

—ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য পর্যাপ্ত ও সময়মত ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ঋণ পাশবই ব্যবস্থা চালু করা এবং তার জন্য পল্লী অঞ্চলে স্থাপিত ব্যাংক শাখাসমূহে একটি পৃথক কোষ (Window) রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ।

—ভিটের জমি সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে গৃহস্থালী খাতে শাকসব্জী উৎপাদন, গবাদিপশু পালন, বনজ সম্পদের সম্প্রসারণ ইত্যাদির জন্য কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো। এসব কর্মসূচীতে মহিলাদের টার্গেট গ্রুপ হিসাবে অগ্রাধিকার প্রদান।

—দুর্যোগ মোকাবেলায় সাহায্য করার জন্য জমি বন্ধক ব্যবস্থার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। এ উদ্দেশে পল্লী অঞ্চলের ব্যাংক শাখাসমূহে একটি বিশেষ কোষ খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ।

—ভূমিহীনদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে আধুনিক সেচ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ। এই লক্ষ্যে ভূমিহীন সমবায়কে সেচ যন্ত্রের মালিকানা প্রদান।

—অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার মাপকাঠিতে সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ উপজেলায় আশ্বিন–কার্ত্তিক ও ফাল্গুন–চৈত্র মাসে কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা দান কর্মসূচী গ্রহণ।

—সকল দুঃস্থ মহিলা পরিবার প্রধানদের ১৯৯৫ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ভিজিডি কার্যক্রমের আওতায় আনার ব্যবস্থা করা।

—১৯৯৫ সালের মধ্যে সকল গৃহহীন দুঃস্থ পরিবারের জন্য স্বল্প ব্যয়ে গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

—জাতীয় আয়ের মত দারিদ্র্য পরিস্থিতি নিয়মিত পরিমাপ ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ।

আনুমানিক হিসাবে উপরোক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে ১৯৯০—৯৫ সময়কালে সরকারী খাতে বাৎসরিক বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৮০০ কোটি টাকা যা বর্তমান মোট রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ১৫ শতাংশ। ১৯৯৫–২০০০ সময়কালে এসকল কর্মসূচীর জন্যে সরকারী অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন হবে ২৪০০ কোটি টাকার মত। প্রতি বছর বিদেশ থেকে দান হিসাবে যে খাদ্য সাহায্য পাওয়া যায় তা থেকেই দারিদ্র্য দূরীকরণ বাবদ উপরোক্ত খরচের প্রায় ৫০ শতাংশ মেটানো সম্ভব। বাকী অর্থ বর্তমান খাতওয়ারী বাজেটের সামঞ্জস্য বিধান, অবকাঠামো ব্যবহারকারীদের উপর করারোপ এবং স্থানীয় ভিত্তিতে Matching grant হিসেবে জমি, শ্রম ইত্যাদি অনুদানের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

দরিদ্র জনগণ যাতে সরকারী কর্মকান্ডকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন সেজন্যে প্রেসার গ্রুপ হিসেবে গ্রাম পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এ সংগঠনের লক্ষ্য হবেঃ (ক) 'নীচ থেকে' দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বরাদ্দের জন্যে প্রয়োজনীয় তাগিদ সৃষ্টি, (খ) গ্রাম পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত বৈষম্যমূলক ধারা, অপচয় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মত একটি মঞ্চ গরীব জনগোষ্ঠীকে প্রদান করা, এবং (গ) রাষ্ট্রীয় সম্পদের পূর্নতর ও সফল ব্যবহারের লক্ষ্যে 'নীচ থেকে' স্থানীয় পর্য্যায়ে বিভিন্ন গণ–উদ্যোগকে সহায়তা করা। দরিদ্র জনগণের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য ও দর কষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে এনজিও, বিভিন্ন রাজনৈতিকদলের গণ–সংগঠনসমূহ ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাম সংগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। 'গ্রাম–সংগঠন' হবে গ্রামের জনগণের দাবী আদায়ের সংস্থা। এটাকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসন যন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণ হিসেবে বিচার করা অনুচিত হবে। এ সংগঠন হবে অরাজনৈতিক, যাতে কোন ক্ষমতাবান শ্রেণী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একে ব্যবহার করতে না পারে।

টাস্কফোর্সঃ শিল্পনীতি

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	জনাব এস, এম, আল–হোসাইনী	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন	আহ্বায়ক
২।	ডঃ জাইদ বখ্ত	বি, আই, ডি, এস,	সদস্য
৩।	জনাব সাইয়েদ ইউসুফ ফারুক	সদস্য, নির্বাহী পরিষদ বোর্ড অব ইন্ডাষ্ট্রিজ	সদস্য
৪।	জনাব সোবিদ আলী	সভাপতি বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাষ্ট্রিজ	সদস্য
৫।	জনাব সালাহ্ উদ্দিন কাশেম খান	প্রাক্তন সভাপতি বাংলাদেশ বস্ত্রকল সমিতি	সদস্য
৬।	জনাব খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন	সদস্য
৭।	জনাব এ সালাম ভূঁইয়া	যুগ্ম–প্রধান পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৮।	জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ	প্রাক্তন চেয়ারম্যান বি, এস, ই, সি,।	সদস্য
৯।	জনাব ওয়ালিউল ইসলাম	সিনিয়র সভাপতি বাংলাদেশ বস্ত্রকল সমিতি	সদস্য
১০।	জনাব হাবিবুর রহমান	নির্বাহী চেয়ারম্যান বোর্ড অব ইনভেষ্টমেন্ট	সদস্য
১১।	জনাব সেমসন এইচ চৌধুরী	সহ–সভাপতি মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ	সদস্য
১২।	জনাব শরিফ এম, আফজাল হোসেন	সিনিয়র সহ–সভাপতি বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাষ্ট্রিজ	সদস্য
১৩।	ডঃ আবুল বায়েস	চেয়ারম্যান অর্থনীতি বিভাগ জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৪।	জনাব মোঃ আবুল কাসেম	উপ–প্রধান পরিকল্পনা কমিশন।	সদস্য

শিল্পনীতি

১.০ পটভূমি

১·১ বাংলাদেশের অর্থনীতি মুলতঃ কৃষিভিত্তিক হলেও এর অগ্রগতির জন্যে শিল্পের উন্নয়ন অপরিহার্য। দেশের আবাদী জমির পরিমাণ সীমিত, তাই প্রতিবছর শ্রমদানের উপযুক্ত বয়সের লোকের সংখ্যা যে বিপুলহারে বাড়ছে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগের বহুলাংশ কৃষিখাতের বাইরে করতে হবে। শিল্পায়ন ও তার আনুষঙ্গিক কর্মকান্ড এ কর্মসংস্থানের একটা প্রকৃষ্ট উপায়। তাছাড়া একদিকে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যেমন শিল্পজাত উপকরণ প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনকে উৎসাহিত করা এবং তার সদ্ব্যবহার সুনশ্চিত করার জন্যেও শিল্পের প্রয়োজন। উপরন্তু রপ্তানী ক্ষেত্রে কৃষিজাত কাঁচামাল বা স্বল্প প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যাদি বিশ্বের বাজারে মূল্য উঠা নামার কারণে যেভাবে মার খায় তা থেকে সেগুলোকে রক্ষা করারও একটি উপায় হলো তাকে অধিকতর প্রক্রিয়াজাত করে শিল্প সামগ্রীতে রূপান্তরিত করার পর রপ্তানী করা।

১·২ স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সরকার শিল্পের উন্নয়নের জন্যে যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছেন সেগুলো আশানুরূপ সুফল প্রদান করেনি। প্রথমদিকে ব্যাপক জাতীয়করণ বা পরবর্তীতে বিপুল বিরাষ্ট্রীয়করণ ও ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতকে প্রাধান্য প্রদান কোনটাই জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান বাড়াতে পারেনি, বরং আপেক্ষিকভাবে কিছুটা অবনতি ঘটেছে। ১৯৬৯–৭০ সালে জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান ছিল ৭·৭৮%, তা কিছুটা বেড়ে ১৯৭৯–৮০ সালে ১০·৮০% হলেও ১৯৮৮–৮৯ সালে আবার তা ৮·৪৯%–এ নেমে যায়। ১৯৭৩–৭৪ থেকে ১৯৭৯–৮০ সময়কালে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার গড়ে বার্ষিক ৭·০০% থাকলেও, ১৯৮০–৮১ থেকে ১৯৮৭–৮৮ সময়কালে এই হার কমে ৪·৮০% হয়। ১৯৮৮–৮৯ সালে এ হারের আরও অবনতি হয়ে ২·৭৮%–এ দাঁড়ায়।

১·৩ বাংলাদেশে সব সময়ই একটি মিশ্র অর্থনীতি বিদ্যমান ছিল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বিভিন্ন কারণে সরকারী খাতের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হলেও সত্তর এর দশকের মাঝামাঝি থেকে বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করার যে নীতি অনুসৃত হতে থাকে তা ১৯৮২ সালের শিল্প নীতিতে অনেকটা পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে। ১৯৮২ সালের শিল্প নীতির মূল লক্ষ্য ছিল, রাষ্ট্রীয় খাতকে সংকুচিত করে তার দক্ষতা বৃদ্ধি করা, অন্যদিকে বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করার জন্যে পাট, বস্ত্রসহ বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠিত শিল্পকে বেসরকারী হাতে ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে ব্যক্তি মালিকানাধীন নূতন শিল্প স্থাপনে সহায়তা প্রদান করা। এই সাথে তাতে বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়। ১৯৮৬ সালের শিল্প নীতিতে বেসরকারী-খাতে বিনিয়োগের পদ্ধতিকে আরও সহজ করা হয়। সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরও শিথিল ও সহজ করার লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে আরেকটা শিল্পনীতির খসড়া তৈরি করা হয় যা বিগত সরকারের সময়ে চূড়ান্ত করার অপেক্ষায় ছিল।

২.০ সামগ্রিক পরিস্থিতির বিরাজমান অবস্থা

২·১ রাষ্ট্রীয় খাতে শিল্প প্রতিষ্ঠার একটা প্রধান কারণ এই যে, যে সকল খাতে ব্যক্তি মালিকদের প্রবেশ বাঞ্ছনীয় নয় বা যে সকল খাতে বিনিয়োগ করতে তারা উৎসাহিত বোধ করবেন না সে সকল খাতের প্রবৃদ্ধি সাধন করা। সব সময়ই অবশ্য লক্ষ্য থাকে যে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতেও তার ইতিবাচক প্রভাব থাকবে। কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে দেশের অধিকাংশ রাষ্ট্রায়াত্তধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানই খুঁড়িয়ে চলছে এবং পুনর্বিনিয়োগের জন্য উদ্বৃত্ত মুনাফা সৃষ্টি করার পরিবর্তে আশঙ্কাজনকভাবে সরকারের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভর্তুকীর উপর নির্ভর করে চলছে। ব্যাংক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে তাদের বকেয়া দেনার পরিমাণ বিপুল যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে এবং এদের পুঞ্জীভূত লোকসানের অংকও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে (একটি হিসেব অনুসারে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর কাছে এদের বকেয়া দেনার পরিমাণ প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকা এবং কেবল১৯৮৫—৯০ এই পাঁচ বছরেই লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৭৫ কোটি টাকার উপর)।

২·২ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর এ রূপ শোচনীয় অবস্থা হওয়ার মূলতঃ দুই ধরনের কারণ দেখা যায়। একটি হলো সরকারী নীতির অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি। সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের যে শিল্পগুলো লাভজনক প্রধানতঃ সেগুলোই পুরোপরি বা আংশিকভাবে তাদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বেসরকারীখাতে স্থানান্তর করা হচ্ছে। তাছাড়া বিরাষ্ট্রীয়করণের নীতি অপরিকল্পিত ও অনির্দিষ্টভাবে চালিয়ে যাওয়ার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অর্জনের জন্যে কোন সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্ভবপর হচ্ছেনা। কাজেই আয়তন সঙ্কোচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প খাতের দক্ষতাবৃদ্ধির যে উদ্দেশ্য শিল্পনীতিসমূহে বর্ণিত আছে এইভাবে তা অর্জন করা হয়ত কোন কালেই সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয়খাতের দক্ষতাবৃদ্ধির দ্বিতীয় ধরণের অন্তরায় বিভিন্নমুখী, যাদের মধ্যে প্রধান হলো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনার স্বাধীনতার অভাব, যথাস্থানে যোগ্যলোকের অভাব, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার অভাব, আধূনীকিকরণের জন্য সুযোগের অপ্রতুলতা, ঐতিহাসিক কারণে আর্থিক কাঠামো অবাস্তব পর্যায়ে পর্যবসিত হওয়া, উৎপাদিত পণ্যের চাহিদার অপ্রতুলতা, প্রযুক্তি আত্নীকরণ ও উন্নয়নের পরিবেশের প্রতিকূলতা, উৎপাদনে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধের অভাব ইত্যাদি।

২·৩ অনুরূপ বেসরকারীখাতের স্থবিরতার কারণগুলো অনুসন্ধান করলে দেখা যায় এর অনেকগুলো শিল্পপতিদের উদ্যোগের অভাব বা ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার ঘাটতির সাথে জড়িত, কিছু ক্ষেত্রে অসাধুতা বা বিকল্পখাতে বিনিয়োগের আকর্ষণ এবং অনেক ক্ষেত্রে পরিমন্ডলের প্রতিকূলতা ও নীতির অনুপযোগীতা বা নীতির যথার্থ বাস্তবায়নে দুর্বলতার সাথে সম্পর্কিত।পূর্বে রাষ্ট্রায়াত্তধীন ছিল এমন সব শিল্পের যাঁরা মালিক হয়েছেন তাঁদের অনেকেই পূর্বে শিল্প পরিচালনায় জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই অনেকেই বাস্তব অবস্থার মোকাবেলা করতে পারছে না। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে তাঁদেরকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও দক্ষতাবিহীন শ্রমিক, ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি এমন সব যন্ত্রপাতি, অলাভজনক দ্রব্যাদির মওজুত ইত্যাদি অসুবিধা নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়েছে, ফলে ব্যক্তি মালিকানায় স্থানান্তরিত অনেক শিল্পই ঠিকমত চলছে না বা বন্ধ হয়ে আছে (একটি সাম্প্রতিক জরিপ অনুসারে ২১২টি বিরাষ্ট্রীয়কৃত শিল্পের মধ্যে ৯২টি উৎপাদনে আছে)। উদার শিল্পনীতি প্রবর্তনের পর থেকে বিস্তর নূতন শিল্প অনুমোদিত হয়েছে বা রেজেষ্ট্রী করা হয়েছে, কিন্তু এদের সিংহভাগের হয় অস্তিত্ব নেই বা তারা উৎপাদনে যায়নি। তাছাড়া দেশজ অনেক শিল্প দ্রব্যের মান আশানুরূপ নয় বা মূল্য অধিক, তাই চোরাপথে বা শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আমদানী করা সামগ্রীর সাথে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকা তাদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়ছে।

২·৪ বেসরকারী খাতে শিল্পায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন কিছুটা দুরূহ বিশেষ করে এ কারণে যে এই খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রকৃত বিনিয়োগ, উৎপাদন, বিক্রয়, লাভ–লোকসান ইত্যাদির বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ও সাম্প্রতিক তথ্যাদি অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না। পরিসংখ্যান ব্যুরো এই ব্যাপারে যে হিসেব প্রকাশ করে থাকেন তা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অনেক পুরনো ও অসম্পুর্ণ। তবুও বেসরকারী খাতে শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে মোটামুটি যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে যে জাতীয় আয়ের অনুপাতে এ খাতে বিনিয়োগ আশির দশকে অনেক কমে গেছে। বেসরকারীখাতে বিনিয়োগ দুইশালা পরিকল্পনাকালে (১৯৭৮—৮০) লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫৯% বেশী ছিল কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৮০—৮৫) এ হার কমে লক্ষ্যমাত্রার ৮১%–এ দাঁড়ায়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম চার বছরে (১৯৮৫—৮৯) প্রকৃত বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় আরও কমে ৪৮% হয়।

২·৫ বেসরকারী খাতের শিল্পের অর্থনীতিতে উল্লেখ করার মত অবদান না রাখার একটি প্রধান কারণ হলো নূতন শিল্পনীতি উৎসাহ সঞ্চার করলেও তেমনভাবে আস্থা সৃষ্টি করতে পারেনি বলে মনে হয়, যার ফলে দেশী বা বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ হয়েছে নগণ্য। অপ্রচলিত রপ্তানীতে বিপুল প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং তৈরি পোষাক শিল্পের মূল্য সংযোজন যৎসামান্য, তাই অর্থনীতিকে সার্থকভাবে উপকৃত করার ক্ষমতাও এর বর্তমানে অতিসীমিত। হিমায়িত খাদ্যের মত সম্ভাবনাময় শিল্পকেও বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে হিমসিম খেতে হচ্ছে কারণ তাদের কাঁচামালের উৎপাদনশীলতা অতি নিম্ন পর্যায়ের। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনগ্রসরতা, বিরাজমান দারিদ্রের ব্যাপকতাও সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার অভাব দেশের ভেতরে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজারের প্রসার বিলম্বিত করছে। অপরদিকে বহির্বাণিজ্যে অসম প্রতিযোগীতা বা ধনী দেশগুলোর

সংরক্ষণশীল নীতি বাংলাদেশের মত দুর্বল দেশগুলোর শিল্পায়নে বিশেষ প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার সাথে দেশীয় অর্থনীতির কাঠামোগত সমন্বয় বা ষ্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট সহনীয়ভাবে বাস্তবায়ন না করার ফলে উন্মুক্ত আমদানী নীতিও দেশজ শিল্পের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

২.৬ বেসরকারী শিল্পখাতে বিনিয়োগের স্বল্পতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো অনেক প্রভাবশালী বা সুযোগসন্ধানী ব্যক্তিরা নিজেরা বিশেষ ঝুঁকি না নিয়ে যেসব শিল্পের জন্যে ঋণ বা অন্যান্য অর্থ সাহায্য গ্রহণ করেছেন, হয় সেগুলো আদৌ স্থাপিত হয়নি অথবা যথার্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিনিয়োগ, অদক্ষ পরিচালনা, পরিবেশের নানাবিধ অন্তরায় প্রভৃতি কারণে অলাভজনক ও রুগ্ন হয়ে পড়েছে। এঁরা যেমন অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলোর দেনা পরিশোধ করছেন না, তেমনি যেসব শিল্প ভাল চলছে তাঁদের মালিকরাও ঋণ পরিশোধে গড়িমসী করছেন। তার ওপর মাঝে মাঝে দেনা মওকুফের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হওয়ায় অনেকে সমর্থ হলেও সময়মত দেনা পরিশোধ করে দেয়াকে অবিবেচকের কাজ বলে ভাবতে শুরু করেছেন। এসব কিছুর ফলশ্রুতি দাঁড়িয়েছে যে অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের অর্থ ফেরৎ না পাওয়ায় লগ্নী আবর্তিত করতে পারছে না, দাতা দেশ বা সংস্থাগুলো তাদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন এবং নূতন সাহায্য দেয়া বন্ধ করে রেখেছেন। ফলে প্রকৃত উদ্যোক্তারা বিনিয়োগের জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থসাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং শিল্পখাতে নূতন বিনিয়োগের গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে।

৩.০ শিল্পনীতি সংস্কারের প্রয়োজন

৩.১ বাংলাদেশের শিল্পায়নের সমস্যাগুলো সরকার বা সংশ্লিষ্ট কারুর কাছেই অবিদিত নয়। এর সমাধানকল্পে বিভিন্ন সময়ে যে সকল নীতি ও ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়েছে সেগুলো আশানুরূপ সুফল বয়ে আনতে পারেনি বলেই সেগুলোকে যথার্থভাবে সংস্কার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বহুলাংশে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর একটা অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নীতি প্রবর্তন সহজ কাজ না হলেও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে শিল্পক্ষেত্রে বাংলাদেশ কোনদিকে কিভাবে অগ্রসর হবে তা দেশের মানুষের প্রকৃত কল্যাণের কথা বিবেচনা করেই আমদানী করা মতাদর্শ বা বাইরের অবাঞ্ছিত কোন চাপকে উপেক্ষা করে স্থির করা প্রয়োজন। এজন্যে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা ও তার অর্থবহ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এবং নানাবিধ সমীক্ষা সম্পাদন অপরিহার্য। ১৯৮২ ও ১৯৮৬ সালের শিল্পনীতির দুর্বলতাগুলোর বহুলাংশে ১৯৯০ সালে খসড়া শিল্পনীতিতে কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস রয়েছে। এতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরও শিথিল করার প্রস্তাব আছে যা নিঃসন্দেহে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মূলতঃ বাজার অর্থনীতি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে এ লক্ষ্য সামনে রাখলে যে সকল শর্ত পুরণ করা দরকার তার সবগুলো প্রস্তাবিত শিল্পনীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়না। এর জন্যে একদিকে যেমন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন তেমনি কিছু আশু ব্যবস্থা নেয়ারও দরকার আছে। এই প্রেক্ষিতে এখনই যেসকল পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে মনে হয় সেগুলো সংযোজন এবং পূর্বেকার খসড়ানীতির কিছু কিছু পরিবর্তন করে টাস্কফোর্স "শিল্পনীতি ১৯৯১"–এর একটা সম্ভাব্য খসড়া তৈরি করেছেন যা সরকার বিবেচনা করে দেখতে পারেন। প্রস্তাবিত পরিবর্তন বা সংযোজনগুলোর বিশেষ কয়েকটির উল্লেখ এই সাথে করা যেতে পারে।

৩.২ বেসরকারীখাতের প্রসার নিঃসন্দেহে বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজন কিন্তু এর জন্যে সরকারী খাত থেকে প্রতিষ্ঠিত শিল্প বেসরকারী হাতে তুলে দেয়াই প্রধান প্রকৃষ্ট উপায় তা মনে করার কোন কারণ নেই। বিরাষ্ট্রীয়ত্তকরণ পরিকল্পিতভাবে করতে হবে, এবং রাষ্ট্রীয়খাতের সীমানা যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ধারিত হওয়ার পর রাষ্ট্রীয়খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠাগুলোকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনা করার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দিতে হবে। বেসরকারীখাতকে তার নিজের উদ্যোগে দেশের ভেতরে ও বাইরে তার বাজার খুঁজে নিতে হবে। কিন্তু তার জন্যে বেসরকারী খাতকে প্রয়োজনীয় সকল আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের প্রক্রিয়াকে অনেক জোরদার করতে হবে।

৩.৩ দেখা যাচ্ছে রুগ্ন শিল্পের বাহুল্য রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী উভয়খাতেই আছে। প্রতিষ্ঠিত শিল্পসমূহের সদ্ব্যবহারের জন্যে উপযুক্ত সমীক্ষা চালিয়ে এগুলোর মধ্যে যেসব শিল্প পূনর্বিন্যাস ও আধুনিকীকরণের পর লাভজনকভাবে চলতে পারে সেগুলোকে চিহ্নিত করে সুস্থ পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্যে সম্ভাব্য সব রকমের সাহায্য দিতে হবে। আর যেগুলোর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লাভজনক হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই সেগুলোকে দ্বিধা না করে বন্ধ করে দিতে হবে।

৩·৪ বিপুলভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণের নীতি গ্রহণের সময় একটা ধারণা করা হয়েছিল যে বেসরকারী মহলে প্রচুর দক্ষ ব্যবস্থাপক ও উদ্যোক্তা রয়েছেন যা কার্যতঃ প্রমাণিত হয়নি। তাই শিল্পনীতির একটা মূল লক্ষ্য হওয়া দরকার উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সব রকমের সুযোগ সৃষ্টি ও সহায়তা প্রদান। এর জন্যে একদিকে যেমন বিনিয়োগপূর্ব পরামর্শ, বিভিন্ন ধরণের কারিগরী সহায়তা, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি উদারভাবে করতে হবে অন্যদিকে উদ্যোক্তাকে বিনিয়োগের জন্য যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে। শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি সার্থকভাবে সাধিত হতে পারে একমাত্র যদি অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান ও তার গ্রাহকের মধ্যে সম্পর্ককে বাইরের প্রভাবমুক্ত রাখা হয় এবং লগ্নী ও ঋণের শর্তাদী কেবলমাত্র প্রকল্পের বস্তুনিষ্ঠ গুণাগুণ বিচার করে নিরুপিত হয়। বলা বাহুল্য লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ কাজে সমুচিত দক্ষতা অর্জন করতে হবে এবং তাদের যথার্থ জবাবদিহির ব্যবস্থা রাখতে হবে। অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার জন্যে দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হতে থাকবে এ অবস্থা কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

৩·৫ রপ্তানী শিল্পের উন্নয়ন প্রসারের জন্যে সুবিধাদি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধিকরা বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে দেশজ কাঁচামালের অধিকতর ব্যবহার ও মূল্যসংযোজন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাঁচামালের উৎপাদনকারীদেরকে ও রপ্তানীকারকদের সমান আর্থিক সুবিধাদি, যেমন কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ, হ্রাসকৃত সুদে ঋণ ইত্যাদি দেয়া প্রয়োজন। বিশ্ববাজারে গ্রহণযোগ্য মান বজায় রাখা, মূল্য প্রতিযোগীতামূলক রাখার জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে রপ্তানীমূখী ও রপ্তানী অন্বয়ী শিল্পকে প্রয়োজনীয় বৈদেশেক মুদ্রা সরবরাহ, কারিগরী সাহায্য ইত্যাদি অকুন্ঠিতভাবে প্রদান করতে হবে। রপ্তানীতে উৎসাহ প্রদানের জন্য এক্সপোর্ট পারফরমেন্স বোনাস (এক্স–পি–বি)–এর স্থলে ট্যাক্স একজেমপ্‌শান সার্টিফিকেট (টি–ই–সি) প্রদানের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে যা বৈদেশিক মুদ্রায় নীট ও প্রকৃত আয়ের ওপর নির্ভর করবে এবং যে সার্টিফিকেট নানাবিধ শুল্ক পরিশোধের জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে বা অন্য পণ্য আমদানীকারকদের কাছে বিক্রী করা যেতে পারে। রপ্তানী প্রসারের জন্যে মুদ্রা বিনিময় হারকে মুদ্রাস্ফীতি ও বিশ্ব বাজারে মুদ্রামানের সাথে সঙ্গতি রেখে সমন্বিত রাখাও অপরিহার্য।

৩·৬ তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখতে গেলে বাজার অর্থনীতির প্রক্রিয়ায় সব ধরণের সরকারী–বেসরকারী ও দেশী–বিদেশী উৎপাদনকারীদেরকে একই পর্যায়ে গণ্য করে সুষম প্রতিযোগীতার সুযোগ দেয়া দরকার এবং তার সাথে সাথে সকল নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধ সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থা প্রচলনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখার দরকার। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের নূতন শিল্পগুলোকে সীমিত সময়ের জন্যে অসম প্রতিযোগীতা থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু তার জন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ না করে উপযুক্ত শুল্ক আরোপের মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য সাধান করা যেতে পারে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দেশজ উৎপাদনগুলো প্রতিযোগীতার অভাবে অদক্ষ না হয়ে পড়ে এবং ভোক্তাদেরকে তার জন্যে মূল্য দিতে না হয়।শুল্ক, কর, ভর্তুকী ইত্যাদি নির্ধারণের সময়ে কেবলমাত্র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য সামনে না রেখে সেসব শিল্পের সহজাত আপেক্ষিক সম্ভাবনা বেশী সেগুলো যেন উপযুক্তহারে প্রকৃত সুবিধা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পুরো যন্ত্র আমদানী যাতে যন্ত্রাংশ আমদানীর চেয়ে সস্তা ও সহজতর না হয় তাও নিশ্চিত করতে হবে। শুল্ক ও কর সম্পর্কিত এই ধরণের বিষয়গুলো সুসমন্বিত করে পুনর্বিন্যাসের জন্যে উপযুক্ত বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা অপরিহার্য।

৩·৭ কর্পোরেট ট্যাক্সের উচ্চহার শিল্পে বিনিয়োগের একটা প্রধান অন্তরায় বলে অনেকে মনে করে থাকেন। একে কমিয়ে ৩০%–এ সীমিত করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়।

৩·৮ বর্তমানের শ্রম আইনে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দিকে প্রয়োজনীয় মনযোগ দেয়া হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়। তাই শ্রমিক ও মালিকের প্রকৃত স্বার্থে উভয়ের পারস্পরিক কল্যাণের বিষয়বস্তুকে অগ্রাধিকার দিয়ে উৎপাদন পরিমন্ডলকে বাইরের প্রভাবমুক্ত রেখে শ্রমনীতির উপযুক্ত সংস্কার বাঞ্ছনীয়।

৪.০ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

৪·১ অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্যে শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করা একটি দুরূহ প্রক্রিয়া এবং এর জন্যে বহুলাংশে বেসরকারী উদ্যোগের ওপর নির্ভর করতে হবেই। কিন্তু বেসরকারীখাতে দেশী বিদেশী শিল্পোদোক্তাদের স্থায়ীভাবে আস্থাভাজন হওয়া, একদিকে বেসরকারী খাতকে নিজস্ব হিসেবমত চলতে পারার স্বাধীনতা দেয়া, অপরদিকে কোন কর্মকান্ড যাতে রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণ ব্যহত না করে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা, প্রকৃত উদ্যোক্তাদেরকে অকুন্ঠভাবে যুক্তিসঙ্গত সব ধরণের সাহায্য প্রদান করা ইত্যাদি দায়িত্ব পালনের জন্যে সুদক্ষভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদির সংস্কার করা একান্ত অপরিহার্য দেশে শিল্প সহায়ক একটি কৃষ্টি ও পরিবেশ গড়ে তোলার জন্যে যে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা দরকার ও তার অংশ হিসেবে যে প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়ন প্রয়োজন তার বিভিন্ন আঙ্গিক আছে। শিল্প সংক্রান্ত কাজে লিপ্ত বিভিন্ন সরকারী, আধা সরকারী দফতর, অর্থলগ্নী প্রাতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা, যোগাযোগ ও পরিবহন সংস্থা, উপদেষ্টা প্রাতিষ্ঠান, নির্মাণ ও স্থাপনকারী ঠিকাদার ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাস্থানে যথাযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে এবং তাদের পেশাদারী দক্ষতা, পরিচালনা ও নেতৃত্ব প্রদানের মান উন্নত করতে হবে। কেবলমাত্র সদিচ্ছার বলে সুফল অর্জন করার সম্ভাবনা ক্ষীণ, তাই বিরাজমান অবস্থার প্রেক্ষিতে পুরো "সিস্টেমস ইম্‌প্রুভমেন্ট"–এর কথা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। তাছাড়া বিদ্যমান সমস্যার মোকাবেলা করার জন্যে অবিলম্বে কিছু কিছু বিশেষ পদক্ষেপ ও বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপনেরও প্রয়োজন আছে বলে টাস্কফোর্স মনে করে।

৪·২ নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে শিল্পে যথার্থ বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও ফলাফল মূল্যায়ন সম্ভবপর হচ্ছে না। বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্টের অধীনে তথ্য সংগ্রহ ও বিকল্প পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরতা যাচাই ও দ্রুত পরিবেশনের জন্যে অবিলম্বে একটি পেশাদারী বিভাগ খোলা দরকার এবং তাদেরকে ইলেক্টনিক, অপটিক্যাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় আধুনিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা অত্যন্ত আবশ্যকীয় পদক্ষেপ।

৪·৩ ট্যারিফ কমিশনের পেশাদারী যোগ্যতা অবিলম্বে জোরদার করা প্রয়োজন এবং এ প্রতিষ্ঠানে কেবল সেই ধরণের কর্মকর্তাদেরই নিয়োগ বাঞ্ছনীয় যাঁদের সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা ও আগ্রহ আছে এবং দৈনন্দিন প্রশাসনিক তাগিদে স্বল্পকালের ব্যবধানে তাঁদেরকে সেখান থেকে বদলী করে ফেলার প্রয়োজন হবে না।

৪·৪ এক্‌সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরোর জরিপ, মার্কেট রিসার্চ, বিদেশী বাজারের হাল তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশনা, দেশী রপ্তানীকারকদেরকে সম্ভাব্য বিদেশী গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন ধরণের সমীক্ষা পরিচালনা, পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য সুগঠিত করা আবশ্যক।

৪·৫ রুগ্ন শিল্পগুলো সম্পর্কে জরিপ, সেগুলোকে পুনর্বিন্যাস, আধুনিকীকরণ, ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, প্রযুক্তি পরিবর্তন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় লাভজনক করা যায় কিনা সে সম্পর্কে পেশাদারী সমীক্ষা চালানো, পরামর্শ প্রদান এবং প্রয়োজনবোধে সাময়িকভাবে পরিচালনা গ্রহণের উপযুক্ত করে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন।

৪·৬ প্রতিষ্ঠিত শিল্পে প্রযুক্তি যাচাই আত্মীকরণ, উন্নয়ন ও পরিবর্তনের জন্যে পরামর্শ প্রদান, বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নূতন প্রযুক্তি উদ্‌ভাবনে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কাজ হাতে নেয়ার জন্যে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়।

৪·৭ প্রকল্পের কারিগরী ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও পরিদর্শন ইত্যাদি কাজে সহায়তা প্রদান ও সম্পাদনে দক্ষতা অর্জনের জন্য একাধারে ব্যাংক, বিনিয়োগ বোর্ড, বিসিক প্রভৃতির প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাবৃদ্ধি এবং বেসরকারীখাতে দেশীয় পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী।

৪·৮ শিল্পায়নে সহায়তার জন্যে যেমন উন্নত আইন শৃঙ্খলার পরিবেশ এবং একটা অটল ও বিশ্বাসযোগ্য সরকার বাঞ্ছনীয়, তেমনি প্রয়োজন শিল্পনীতি এবং তার আনুষঙ্গিক অন্যান্য নীতি ও কৌশলের নির্ভরযোগ্যতা ও স্থায়ীত্ব। পরিবর্তনশীল পরিমন্ডলের সাথে তাল রেখে চলতে গেলে এই সকল নীতিকে অবশ্য গতিশীল হতে হবে, কিন্তু পশ্চাৎমুখী হওয়া চলবে না। কেবলমাত্র অপব্যবহার বা নেহায়েৎ অপরিহার্য কারণ ব্যতীত অনুমোদিত সুবিধাদি হঠাৎ করে খর্ব করা বিনিয়োগকারীদের কাছে গ্রহণ যোগ্য হবে না। সুবিধার পরিমাণের চেয়ে তার স্থায়ীত্বের অঙ্গীকার কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই সকল নীতি ও কৌশল প্রণয়ন এবং সংস্কার যদি কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে হয় তবে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বজায় থাকে। এ প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শিল্পখাতের ফলাফল পর্যালোচনা ও সমস্যা সমাধানকল্পে সরকারকে পরামর্শ প্রদানের জন্য টাস্কফোর্স কয়েকটি "খাতভিত্তিক" প্রতিনিধিত্বমূলক "স্থায়ী কাউন্সিল" স্থাপন করার প্রস্তাব করছেন।

৫.০ শেষ কথা

৫·১ দেশের অর্থনীতিকে কোন দিকে কি কৌশলে পরিচালিত করা হবে তা মূলতঃ রাজনৈতিক দর্শন ও দিক নির্দেশনার ওপর নির্ভরশীল যাতে সকল সংশ্লিষ্ট নীতি ও কৌশলসমূহে জনগণের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়। যে ধরণের বিশ্লেষণ ও সমীক্ষার ভিত্তিতে এ সকল বিষয় নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন তার জন্যে বেশ ব্যাপক ও সময়সাপেক্ষ প্রয়াস প্রয়োজন। টাস্কফোর্স মনে করেন যে সরকার শিল্পখাতসমূহের গুরুত্ব বিবেচনা করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উপযুক্ত সমীক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্পায়নে দীর্ঘ মেয়াদী কৌশল সম্বন্ধে সুপারিশ প্রণয়নের জন্যে শিল্প ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি "জাতীয় শিল্প কমিশন" স্থাপন করার কথা বিবেচনা করতে পারেন।

৫·২ শিল্প সংক্রান্ত বিষয়াদির সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও সংস্থা জড়িত এবং শিল্পায়নে সাফল্যের জন্য তাঁদের সকলেরই সহযোগীতা ও সাহায্য প্রয়োজন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি শিল্পায়নের মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে সংশ্লিষ্ট সকলের কর্মকান্ডকে সমন্বিত করতে পারেন এবং একই দিকে ধাবিত করাতে পারেন তবেই এই জটিল ও দুরূহ ব্রতে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব। তাছাড়া শ্রমনীতির সংস্কার বা সাহায্যদাতা বৈদেশিক উৎসগুলোর সাথে সম্পর্কের কৌশল পরিবর্তনের মত স্পর্শকাতর বিষয়গুলো পরিচালনা কিংবা শিল্পে অর্থায়নের প্রক্রিয়াকে বাইরের প্রভাবমুক্ত রাখা বা জনসাধারণকে দেশজ সামগ্রী ব্যবহারে আদর্শগতভাবে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা, এসব বিষয়গুলিও রাজনৈতিক সংকল্পের ওপর নির্ভরশীল। টাস্কফোর্স আস্থা রাখেন আগামী সরকার এ দিকেও যথাযথ দৃষ্টি দেবেন।

টাস্ক ফোর্সঃ বেসরকারী খাতের ভূমিকা

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	ডঃ আবদুল্লাহ্ ফারুক	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আহ্বায়ক
২।	প্রফেসর তাহেরুল ইসলাম	অর্থনীতি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩।	জনাব লতিফুর রহমান	সভাপতি, বাংলাদেশ কর্মচারী সংগঠন	সদস্য
৪।	জনাব হামেদ শফিউল ইসলাম	সেক্রেটারীজেনারেল ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি	সদস্য
৫।	জনাব খুরশেদ আলম	ফাডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি	সদস্য
৬।	জনাব এ,বি,এম, মাহ্বুবুল আমিন খান	বি, আই, বি, এম,	সদস্য
৭।	ডঃ নাজমুল বারী	ডি, জি, এম, রিসার্চ এণ্ড ইকনোমিকস ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক	সদস্য
৮।	জনাব দেলোয়ার হোসেন	প্রাক্তন চেয়ারম্যান বি,এফ, আই, সি,	সদস্য
৯।	মিসেস লায়লা কবির	প্রাক্তন সভাপতি বাংলাদেশ চা সংসদ।	সদস্য

বেসরকারী খাতের ভূমিকা

ভূমিকাঃ

আলোচ্য টাস্ক ফোর্সের সকল সদস্য একমত যে, বাংলাদেশের বেসরকারী খাতের ভূমিকা দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে ঃ ব্যাপক অর্থে (কৃষি, ব্যবসা প্রভৃতি সকল কার্যাবলীসহ) এবং সংকীর্ণ অর্থে শুধুমাত্র শিল্প খাতে। আলোচ্য টাস্ক ফোর্স প্রধানতঃ বাংলাদেশের বেসরকারী শিল্প খাতের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছে যেহেতু বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যাদি সম্পর্কে অন্যান্য টাস্ক ফোর্সের প্রতিবেদনে আলোচনা থাকিবে। বেসকারী খাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অতীতের নীতি ও উদ্দেশ্যাবলী বিশ্লেষণ করিয়া সরকার কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাধাগুলি নিরসনের মাধ্যমে বেসকারী শিল্প সমূহের বিকাশে সুষ্ঠু ও অগ্রণী ভূমিকা রাখিতে পারে এবং ভবিষ্যতে সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতই কিভাবে কর্ম সংস্থান, আয় এবং শ্রম ও মূলধনের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখিতে পারে সেই সব ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য খাতের সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং সেইগুলি নিরসনের জন্য সরকারের নীতিসমূহের উপর টাস্ক ফোর্সের প্রত্যেক সদস্যই স্ব–স্ব মতামত ব্যক্ত করেন। আলোচনাক্রমে ভবিষ্যত গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পূর্ণ বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা হয়।

১৯৪৭ সালের পর বিগত চার দশকে বাংলাদেশের বেসরকারী খাতের অগ্রগতির ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। ১৯৪৮ সাল হতে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সময়ে দেখা যায় যে, রাজনৈতিক কারণে উদ্যোক্তা এবং পুঁজিপতিগণের একটি বৃহৎ অংশ দেশের বাহিরে পুঁজি বিনিয়োগ করে। বাংলাদেশী উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন ধরনের সরকারী নিয়ম–নীতি ও প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। ১৯৭১ সালের পূর্বে বাংলাদেশী উদ্যোক্তা বেশী ছিল না। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানার অনুপস্থিতিতে ১৯৭৩ সালে সেইগুলিকে জাতীয়করণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় যাহাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসকারী খাত আরও গতিশীল অবদান রাখিতে পারে। ১৯৮২ সালে 'নতুন শিল্প নীতি' সরকারী খাতের পাশাপাশি বেসরকারী শিল্প খাতের গতিশীল ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এবং সরকারী শিল্প খাতের একটি অংশ বেসরকারীকরণ করা হয়। ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকিং খাতের বিকাশকে উৎসাহিত করা হয়। ষ্টক এক্সচেঞ্জ পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়া হয় এবং এই ক্ষেত্রে সরকারী ব্যাংকের মাধ্যমে অধিকতর মূলধন যোগানের ব্যবস্থা লওয়া হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার শিল্পায়নের উদ্দেশ্যাবলী ছিল কৃষি খাতকে সহায়তা প্রদান করা, জনগণের মৌলিক প্রয়োজন মেটানো এবং রপ্তানী মুখী ও আমদানী বিকল্প শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বাণিজ্য–লেনদেন পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধন। চতুর্থ পরিকল্পনায় শ্রমের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মানুবর্তীতা, প্রশিক্ষণ এবং লভ্যাংশ ভাগাভাগির প্রস্তাব করা হইয়াছে। উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ এবং লভ্যাংশ ভাগাভাগির প্রস্তাব করা হইয়াছে। উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ এবং বাজার গবেষণা, অপচয়রোধ, ভুর্তকী প্রত্যাহার প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রস্তাবনা করা হইয়াছে। শিল্পনীতি ১৯৮৬ সালে পুনরায় সংশোধন ও সহজতর করা হয় এবং বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের উৎসাহ প্রদান করা হয়। বর্তমানে মোট জাতীয় উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান প্রায় ১০%। শিল্প খাতে প্রায় ৩০·৯ লক্ষ লোক সরাসরি নিয়োজিত আছে যাহা মোট কর্মস্থানের এক তৃতীয়াংশ বৃহৎ, মাঝারী এবং আধুনিক ক্ষুদ্র শিল্পে নিয়োজিত। উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য সংযোজন ১৯৮৫–৮৬ তে ছিলঃ ভোগ্য সামগ্রী ৫৯%, মধ্যস্থ পণ্যাদি ৩৯% এবং মূলধন সামগ্রী ২%। এক্ষেত্রে বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহের অংশ হইতেছেঃ মূল্য সংযোজনে ৫৭·৫% এবং কর্মসংস্থানে ১৭·৮%। পরিকল্পনা কমিশনের সাম্প্রতিক গবেষণা হইতে দেখা যায় যে, বিগত দশকে শুধু সরকারী খাত নয় বেসরকারী খাতে শিল্প সমূহের অবস্থারও বিরাট অবনতি ঘটিয়াছে। উক্ত গবেষণায় দেখা যায় যে, যাবতীয় ব্যবসা সংক্রান্ত এবং অভ্যন্তরীণ নীতিসমূহের প্রভাব শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকেই বহন করিতে হয়। (Effective Rate of Assistance) এবং ইহার পরিবর্তনের সাথে উদ্দেশ্যাবলীর সম্পর্কও পরিবর্তনশীল। ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৮২ সালে নতুন শিল্পনীতি প্রবর্তনের পর যাবতীয় শিল্প সংক্রান্ত চলক

(যেমন–বিনিয়োগ, উৎপাদন, মোট উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা প্রভৃতি) হ্রাস পাইয়াছে অথবা এইগুলোর প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাইয়াছে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদিত দ্রব্যাদির চাহিদার অভাব, অধিক উৎপাদন খরচ, অথবা সস্তা দামে বাজারে আমদানীকৃত দ্রব্য প্রাপ্তি প্রভৃতি কারণে বর্তমানে শিল্প খাতে ঋণ পরিশোধ করা হইতেছে না। অন্য কথায় শিল্পনীতি (যাহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে রাজস্ব এবং আর্থিকনীতির অন্তর্গত) অকার্য্যকর পরিলক্ষিত হইতেছে। এই অবস্থা পরিবর্তনে কি ব্যবস্থ্য গ্রহণ করা যায় তাহা জানার জন্য গবেষকগণ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মতামত সংগ্রহ করিয়াছেন। এই মতামত জরিপে আমদানী নিষিদ্ধকরণ এবং অধিকতর ঋণ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।তাহাদের অভিযোগ যে চোরাকারবারীগণ ব্যবসায়ীগণের চেয়ে বেশী এবং ব্যবসায়ীগণ শিল্পপতিগণের চেয়ে বেশী উপার্জন করে। যদিও শিল্পপতিদের চাইতে তাহাদের ঝুঁকি অনেক কম। বাংলাদেশের শিল্পখাতে দূর্বলতা নিরসনে উপরোক্ত সুপারিশমালা। গবেষকদের প্রদত্ত সুপারিশের পরিপন্থি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উদাহরণস্বরূপ পণ্য আমদানী নিষিদ্ধকরণ চোরাচালানের অন্যতম কারণ। কাজেই তাহা পরিহার করা উচিৎ। অদক্ষ আমদানী বিকল্প শিল্প স্থাপন উচ্চ উৎপাদন খরচের অন্যতম কারণ। অর্থনীতি অধিক বাধা নিষেধে আবদ্ধ বলিয়া মনে হয়। রাজস্ব এবং আর্থিক সুবিধাসমূহ শিল্পপতিগণকে উৎসাহ দেয় না বরং ব্যবসায়ী এবং চোরাকারবারীগণ তাহা ভোগ করে। এই সকল নীতিতে উচ্চ 'লুক্কায়িত খরচ' বিদ্যমান যাহা অর্থনীতিতে স্থবিরতার জন্য আংশিক দায়ী। গবেষকগণ তাহাদের সুপারিশমালায় উৎপাদনশীলতা এবং প্রযুক্তি উন্নয়নের উপর জোর দিয়াছেন। এই জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উৎসাহ এবং প্রকৃত উৎপাদন খরচ কমানোর ব্যবস্থা করা দরকার। শুধুমাত্র রাজস্ব এবং আর্থিক উৎসাহ প্রদান নীতি কৃত্রিমভাবে 'ব্যক্তিগত খরচ' কমায় কিন্তু জাতির জন্য ইহাতে উচ্চ 'লুক্কায়িত ব্যয়' বিদ্যমান।'গবেষণা এবং উন্নয়নে' সম্পদের অধিক বরাদ্দ প্রয়োজন। এই ছাড়া আমদানী পরিমাণ নির্ধারণ ও উপযোগী প্রযুক্তির বিস্তার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ 'মুলধন–ঘনত্ব' বৃদ্ধি নয়। দুর্বল শিল্পগুলিকে অধিকতর দক্ষ করিতে হইবে অথবা বাদ দিতে হইবে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে স্বল্প করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাবলী যেমন–খোলা বাজারে নির্ধারিত সুদের হার, শুল্ক হারকে ২০% উর্ধ্বে নির্ধারণ না করা, অনুমতি পত্রের জন্য নিলাম ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সমগ্র অর্থনীতির জন্য একটা মাত্র ন্যূনতম মজুরী হার নির্ধারণ প্রভৃতি গ্রহণ করা আবশ্যক। এই পটভূমিতে টাস্ক ফোর্স তাদের নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা পেশ করিতেছে ঃ

কতকগুলি নীতি নির্ধারণঃ

বেসরকারী খাত সংক্রান্ত আমাদের শিল্প নীতির পরিবর্তনের সূচনা ঘটে ১৯৭৪ সাল হইতে। প্রথমতঃ এই ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ সীমা বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীকালে সরকারী খাতের কিছু কিছু শিল্প বেসরকারীকরণ করা হয়। বেসরকারীকরণের এই প্রক্রিয়া এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারী শিল্প খাতে বিনিয়োগের উপর জোর ১৯৮২ সাল পর্যন্ত চলে। ১৯৮২ সালের নতুন শিল্পনীতিতে নীতিমালায় অনেক পরিবর্তনের সূচনা করা হয়। এই সময় ঘোষিত এই নীতি শুধুমাত্র কয়েকটি বিষয় সরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত রাখে। কয়েকটি ক্ষেত্রে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় খাতের জন্য চিহ্নিত হয় এবং অবশিষ্ট ক্ষেত্রগুলি বেসরকারী খাতের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। নতুন শিল্প নীতির আওতায় বেসরকারী খাতের ভূমিকা যে পর্যাপ্ত নয় তাহা অনুধাবনের জন্য সরকারের দীর্ঘ ৪ বৎসর সময় লাগে। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে 'সংশোধিত শিল্প নীতি' ঘোষণা করা হয়।

১৯৮৬ সালে সংশোধিত শিল্পনীতি বর্তমান শিল্পনীতি মূল্যায়নের অপর একটি স্তম্ভ। এতে ১৯৮২ সালের নতুন শিল্প নীতির সম্মিলিত তালিকা বাতিল করা হয় এবং সরকারী খাতের জন্য শুধুমাত্র ৬টি ক্ষেত্র সংরক্ষিত রাখিয়া বাকী সকল ক্ষেত্র বেসরকারী খাতের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

সরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত ক্ষেত্রগুলি হইতেছে ঃ

(১) অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সুক্ষ্ম যন্ত্রপাতি,

(২) জেনারেশন (ষ্ট্যাণ্ডবাই/ক্যাপটিভ জেনারেশন বাদে)
বৈদ্যুতিক প্রেরণ ও বন্টন যন্ত্রাদি,

ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে আমদানীকৃত খুচরা যন্ত্রাংশ স্বল্পতা কাঁচামালের অভাব, কর ও বিদ্যুৎ সরবরাহ জটিলতা ইত্যাদি অসুবিধা বিরাজ করে তবে এইসব ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিনিধি এবং শিল্প ও বণিক সমিতির মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত ঐ সকল সমস্যার নিষ্পত্তি করা।

(গ) ব্যবহৃত প্রযুক্তি উন্নয়নে দেশীয় সম্পদ ব্যবহারের জন্য নিয়োজিত সরকারী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থাসমূহের কার্য্যকলাপ ত্বরান্বিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন (আর এণ্ড ডি) প্রজেক্টের উৎপাদন-শীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধার ব্যবস্থা থাকা দরকার। যে সকল প্রতিষ্ঠান গবেষণা ও উন্নয়ন (আর এ্যান্ড ডি) এবং তাহাদের শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে খরচ করিতেছেন তাহাদের জন্য কর সুবিধাদি থাকা প্রয়োজন। বেসরকারী খাত তাহাদের গঠিত চেম্বারের মাধ্যমে প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং তাহাদের ব্যবহার নিরূপণ করিতে পারেন। যখন নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসিবে তখন টেক্সটাইল, সাইকেল, সাইকেল টায়ার, টিউব, খুচরা যন্ত্রাংশ ইত্যাদির চোরাচালান বিডিআর, পুলিশ, এবং আনসার বাহিনী দ্বারা কার্যকরভাবে বন্ধ করার জন্য তাহাদের প্রতি অনুরোধ থাকিবে। এই ক্ষেত্রেও চেম্বারের সহিত আলোচনা সাপেক্ষে কার্যকরী সংস্কার করা যাইতে পারে।

(ঘ) উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী খাত পুনর্জীবিত করা উচিৎ এবং এই দুই খাতের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকা বাঞ্ছনীয়। এক খাতকে কোন প্রকার সুবিধা প্রদান যেমন বৈদেশিক মুদ্রা বন্টনে বৈষম্য, ঋণ সুবিধা প্রদান, দেশীয় পণ্য ক্রয়ে সুবিধা প্রদান, মূল্য নির্ধারণ, বিদেশ ভ্রমণ ও শ্রমিক নিয়োগে সুবিধা ইত্যাদি যুক্তিযুক্ত নয়। সকলের জন্য সমান নিয়ম ও সুযোগ থাকা দরকার।

(ঙ) সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতে জবাবদিহির ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠাসহ ভাল কাজের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তির বিধান রাখা দরকার। বেসরকারী খাত যাহাতে অন্যের মূলধন ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করিতে পারে সেইজন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোম্পানী আইন সংশোধন করা এবং উপযুক্ত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তাহাদেরকে দেউলিয়াত্ব থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে ষ্টক এক্সচেঞ্জ তাহাদের কর্মকাণ্ড পুনর্বিন্যাস করিয়া নিয়ম ও আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে যৌথ কোম্পানীর নিবন্ধকের মাধ্যমে শাস্তি প্রদানের বিধান করিতে পারে।

(চ) ট্রেড ইউনিয়নসমূহের যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা উচিৎ এবং যে সব ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে সেই সব ক্ষেত্রে এককভাবে লভ্যাংশ ঘোষণা করা সরকারের উচিৎ নয়। ট্রেড ইউনিয়নসমূহের শ্রমিক ও মালিক উভয়কেই আই, এল, ও, কনভেনশন মানিয়া চলা দরকার।

(ছ) এক দিকে যেমন সরকারের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো প্রস্তুত করা উচিৎ অন্য দিকে বেসরকারী খাতের উচিৎ যে তাহারা সময় মত ঋণ পরিশোধ করেন। চেক অগ্রাহ্য করার ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন কঠোরভাবে অনুসরণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিৎ। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিফোন ইত্যাদির মূল্য যখন তখন বৃদ্ধি রোধ করা এবং উক্ত সেবাসমূহের মান উন্নয়ন করা উচিৎ।

(জ) বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, নোরাড ও সিডা প্রভৃতি সাহায্য দাতা সংস্থার সাহায্য কর্মসূচীর ঋণ শর্তসমূহ পুনঃপরীক্ষা করা দরকার। যদি সেগুলি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্তরায় হয় তাহা হইলে নতুনভাবে চুক্তি করা দরকার। সকল বিদেশী ঋণ প্রস্তাবসমূহে গবেষণা ও প্রযুক্তি স্থানান্তর ও দেশীয় সম্পদের অধিক ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

অনুচ্ছেদ—৩ঃ

(ক) নীতি নির্ধারকগণের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কল্যাণমুখী কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা। ইহা বিধি প্রণয়নের কাজ নয় বরং উত্তরণ সম্বন্ধীয় কাজ। অতীত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র রাজনৈতিক অভিপ্রায় দ্বারা বেসরকারী খাতের উন্নয়ন সম্ভব নয়। ইহার জন্য দরকার বেসরকারী খাতের পক্ষে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য সরকারের প্রকাশ্য সমর্থন ও প্রয়াস। মুনাফা অর্জনের

জন্য উৎসাহ প্রদান করা দরকার, তবে উহা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় পারমিট ও কোটার মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা হইতে ভিন্নতর হইবে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় অর্জিত এই ধরণের মুনাফা বর্জন করা দরকার নতুবা কাল টাকা ভাল টাকাকে অর্থনীতি হইতে বিতাড়িত করিতেই থাকিবে।

(খ) বেসরকারী খাতে সরকারী সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা কি হইতে পারে তাহা এশিয়ান টাইগার্স পরিষ্কারভাবে তুলিয়া ধরিয়াছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষ ও নিবেদিত প্রাণ কর্মকর্তা নিয়োগ বেসরকারী খাত সক্রিয় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। অতীতে এই বিষয়টির উপর খুব কম দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। বিনিয়োগ বোর্ড গঠন করা হইয়াছে সত্য কিন্তু একথা সরকারের জানা আছে যে উহার আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলায় নাই।

(গ) ব্যবসার চেয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিকভাবে লাভজনক এবং আর্কষণীয় করিয়া তোলা দরকার যাহাতে জনগণ শিল্পে বিনিয়োগের জন্য আগাইয়া আসে। ব্যবসায়ের চাইতে শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ শুধু লাভজনক নহে বরং সহজ ও কম ঝুঁকিপূর্ণ এইকথা যাহাদের বিনিয়োগের জন্য মূলধন আছে তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে। বিনিয়োগের অনুকূল রাজস্ব ও শুল্ক নীতি অবশ্যই ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। বিগত ১০ বৎসরে এইক্ষেত্রে কোন উন্নতি হয় নাই ফলে শিল্প খাতে উন্নয়ন ব্যাহত হইয়াছে। শুধু রাজস্ব ও শুল্কনীতির পরিবর্তন নয়, ট্যারিফ কমিশন ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্য্যপদ্ধতিও বদলাইতে হইবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্য্যাবলী আমাদের দৃষ্টিতে শুধু রাজস্ব আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(ঘ) বিগত ২০ বৎসর যাবৎ একের পর এক সরকারকে বিশেষ কর হার নির্ধারণ করার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে যাহাতে অনেকেই আয়কর ফাঁকি দিয়াছে। সুতরাং কেউ যাহাতে কর ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ না পায় সেই জন্য একটি বাস্তব করনীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

(ঙ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ডি, এফ, আই, গুলিকে আরও ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত যাহা বেসরকারী শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির সহায়ক হইবে।

(চ) উচ্চ সুদের হার এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদানে কড়া শর্তের ফলে শিল্পে উদ্বৃত্ত তহবিল গঠনে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। ১৯৭২-৭৩ সাল হইতে ১৯৮৯-৯০ সালের মধ্যে সুদের হার ১৫০% বৃদ্ধি পাওয়া ইহার প্রমাণ। মূলধন খরচ বৃদ্ধি পাইয়াছে ২৯ ভাগ। সুদের হার এমনভাবে নির্ধারণ করা দরকার যাহাতে একজন আমানতকারী তাহার প্রদত্ত আমানত হইতে পর্য্যাপ্ত লাভ পায় তবে সুদ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্নভাবে যাচাই করা যাইবে না। আমরা উৎপাদন খরচকে অগ্রাহ্য করিতে পারি না বিশেষতঃ যে সকল ক্ষেত্রে বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হয় এবং যেখানে আমাদের দেশের শিল্পে অন্যদের তুলনায় মূলধন উৎপাদনেরহার বেশী।

অনুচ্ছেদ—৪ঃ

বাংলাদেশের বেসরকারী শিল্প খাতে অপ্রতুল উদ্যোগের মূল সমস্যা হইতেছে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি যাহাতে ইহার উৎপাদিত দ্রব্য দেশে ও বিদেশে প্রতিযোগিতামূলক থাকিতেছে না। উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির সহায়ক উপাদানগুলিনিম্নরূপঃ

(১) উপকরণ ব্যয়ঃ বস্তুগত ও আর্থিক

(২) শ্রমিকের স্বল্প উৎপাদনশীলতা

(৩) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা ক্যাডারের অভাব

(৪) গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সহজ লভ্যতার অভাব

যে সকল দেশ আমাদের প্রতিযোগী তাহাদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে হইলে উপরোক্ত উপাদানগুলির সহজ লভ্যতার তুলনামূলক ব্যয় নিশ্চিত করিতে হইবে।

(ক) আমদানীকৃত উৎপাদন উপকরণের মূল্যের উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই উপরন্তু পর্য্যায়ক্রমে টাকার অবমূল্যায়ন সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলে। সুতরাং শিল্পে ব্যবহৃত উপকরণের মূল্য স্থিতিশীল রাখিবার জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখার দরকার। আমদানীর বিকল্প শিল্প সম্ভাব্যতাকে সক্রিয় বিবেচনায় আনিতে হইবে। তবে বিকল্প শিল্পের উৎপাদিত মান ও মূল্য আমদানীকৃত পণ্যের তুলনামূলক হইতে হইবে। অন্যথায় ফলাফল দাঁড়াইবে এই যে হিমায়িত চিংড়ী প্যাকিং এর জন্য যে বাক্স ব্যবহৃত হয় তাহার অনুরূপ আমদানীকৃত কার্টুন স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কার্টুনের চেয়ে সস্তা এবং ফেঞ্চুগঞ্জে সার কারখানায় উৎপাদিত এমোনিয়া সালফেটের মূল্য আমদানীকৃত ফসফেটের মূল্যের চেয়ে অধিক।

শিল্প খাতে ব্যবহৃত উৎপাদন খরচের মধ্যে বিদ্যুৎ ও গ্যাস একটি মুখ্য উৎপাাদন। অদক্ষতার কারণে ব্যবহারকারীদের উপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ শিল্পে বিশেষ করিয়া রফতানী শিল্পে যেমন-চা, হিমায়িত চিংড়ী, পাট ইত্যাদির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যেখানে উৎপাদনকারী অতিরিক্ত খরচের ভার আন্তর্জাতিক ভোক্তাদের উপর চাপাইতে পারে না। অনুরূপভাবে ঋণ প্রতিষ্ঠানসমুহের অযোগ্য ব্যবস্থাপনা ও অনাদায়ী ঋণের জন্য শিল্প ঋণের সুদের হার অযৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু সুদের উচ্চ হারের ফলে সৃষ্ট ঋণ পরিশোধ সমস্যা শিল্প খাতের নিষ্ক্রিয়তার কারণগুলির অন্যতম।

যে সকল দেশের পণ্য আমাদের পণ্যের প্রতিযোগী সেই সকল দেশের উৎপাদনের উপর উপযোগ ও ঋণ আমাদের দেশের শিল্পেও প্রদান করার জন্য নিষ্ঠা ও সততার সহিত প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে।

(খ) শ্রমিকের কম উৎপাদনশীলতা উৎপাদন খরচকে বাড়াইযা দেয়। যাহার সাথে দক্ষতার অভাব এবং দায়িত্বহীন ট্রেড ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ যোগ আছে। শিল্প ক্ষেত্রে শিক্ষার সংগে সংগে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ অত্যাবশ্যক। উক্ত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত করিতে হইবে এবং শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পাঠ্যসুচী প্রস্তুত করিতে হইবে।

এই দেশের ট্রেড ইউনিয়নসমূহ উৎপাদনশীলতা ও মজুরীর মধ্যে সম্পর্ককে স্বীকার করিতে রাজী নয়। আসলে তাহারা এই ধরণের সম্পর্ক স্থাপনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। উৎপাদনশীলতার সাথে সামঞ্জস্যহীনভাবে মজুরী বৃদ্ধির কারণে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুটাইয়া ফেলিতে হয়। যদিও মজুরী ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক আই, এল, ও, স্বীকার করে। ইহার প্রয়োগের জন্য দেশে আইন প্রণয়ন প্রয়োজন।

(গ) একটি প্রতিষ্ঠানের সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার উহার দক্ষ ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে। বাংলাদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ব্যবস্থাপনার যথেষ্ঠ অভাব রহিয়াছে। সুতরাং দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে যে কোন উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং কারিগরী মহাবিদ্যালয় সমূহ এই অভাব দুর করিবার জন্য ফলিত বিজ্ঞান ও শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে পারে। তাহাদের জন্য পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করিতে পারে। এই সকল কোর্স উচ্চ কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ ব্যবস্থাপকের নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক শিল্পগত শিক্ষার প্রসার ঘটাইতে পারে।

(ঘ) নুতন ধ্যান-ধারণা ও কলাকৌশল ব্যবহারের মাধ্যামে শিল্পে উচ্চতর দক্ষতা অর্জন করা যায়। এই পর্যায়ে শিল্প সমিতিগুলি তাহাদের নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন সুবিধাদির ব্যবস্থা করিতে পারে যাহাতে

গবেষণার ফলাফল শিল্প উৎপাদনে সরাসরি ফলপ্রসূ হইবে। সরকার এই জন্য কর ও সেচ আয়ের এক অংশ ব্যয় করিয়া এই ক্ষেত্রে সহায়তা দিতে পারে। সরকারের আর্থিক সহায়তায় যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য 'বোর্ড অব ডাইরেক্টর' উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে গঠন করা দরকার।

(ঙ) সরকারের বিনিয়োগ নীতি প্রণয়নের পূর্বে বেসরকারী খাতের সহিত ব্যাপকভাবে আলোচনা করা উচিৎ যাহাতে এইগুলি বাস্তব সম্মত হয় এবং প্রত্যাশিত ফল প্রদান করিতে পারে।

অনুচ্ছেদ—৫ঃ

(ক) আর্ন্তজাতিক অর্থ তহবিল ও বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ অনুযায়ী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করার জন্য আমদানী নীতি অধিকতর অবাধ করা হইয়াছে। ইহাতে দেশীয় শিল্পের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং দেশীয় শিল্পের উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ বিষয়টি পুনঃ বিবেচনা ও পুনবীক্ষণ করিতে পারে। অপরদিকে সরকারী খাতের দক্ষতা ও দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে যথাযথ উন্নতি করা উচিৎ।

(খ) ১৯৬৯ সালের সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল অর্ডিন্যান্স এর ২৮ ধারা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনতিবিলম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জের প্রশাসক এবং ২৭ ধারা অনুযায়ী একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(গ) টাস্কফোর্স মনে করে যে ব্যক্তি মালিকানায় বিনিয়োগের বর্তমান সিলিং সময়ের সাথে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া বিভিন্ন সেক্টর কর্পোরেশনের শিল্প ইউনিটগুলিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত করিয়া উহার অংশীদারীত্ব সর্বসাধারণের জন্য ছাড়িয়া দেওয়ার কাজটি পর্য্যায়ক্রমে চালাইয়া যাওয়া উচিৎ।

টাস্কফোর্সঃ বাংলাদেশের সরকারীখাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	ডঃ রফিক উদ্দিন আহম্মেদ	প্রাক্তন পরিচালক, আইসিটিভিটিআর	আহবায়ক
২।	জনাব নেফাউর রহমান	চেয়ারম্যান, বি,সি, আই, সি	সদস্য
৩।	জনাব আবু সাইয়েদ	চেয়ারম্যান, বি, আই, ডব্লিউ,টি, এ,	সদস্য
৪।	ডঃ হারুন-অর-রশিদ	অতিরিক্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	জনাব জিয়াউল হক	ব্যবস্থপনা পরিচালক, ওরিওকিস লিঃ	সদস্য
৬।	ডঃ দূর্গাদাস ভট্টাচার্য্য	ম্যানেজামেন্ট বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৭।	জনাব রফিক সিদ্দিকী	ব্যবস্থপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরী	সদস্য
৮।	জনাব সৈয়দ হুমায়ুন কবির	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ফাইজার ল্যাবরেটরীজ (বাংলাদেশ) লিঃ	সদস্য
৯।	জনাব মোজাফফর আহমেদ	অর্থ পরিচালক, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা	সদস্য
১০।	অধ্যাপক হাফিজ সিদ্দিকী	আই,বি, এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য

বাংলাদেশের সরকারীখাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন

বাংলাদেশের সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি), বাংলাদেশ ষ্টীল এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারীং করপোরেশন (বিএস ইসি), বাংলাদেশ সুগার এ্যান্ড ফুড ইন্ডাষ্ট্রীজ করপোরেশন (বিএসএফআইসি) এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি) সমূহের কার্যাবলী পর্যালোচনাপূর্বক এই সকল প্রক্রিয়াজাত ব্যবস্থাপনায় যে সকল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলো চিহ্নিত করে নিম্নবর্ণিত সংক্ষিপ্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছেনঃ-

(ক) স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ঃ

১৯৭২ সানে বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান (জাতীয়করণ) আদেশে করপোরেশনসমুহকে প্রদত্ত স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ দেয়া হচ্ছে না।

সুপারিশঃ

(১) সরকার এবং করপোরেশন ও করপোরেশন এবং অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক ১৯৭৬ সনের সরকার কর্তৃক দিক নির্দেশনার বাস্তবায়ন।

(২) করপোরেশনসমুহের উৎপাদন কর্মকান্ডের স্বাধীনতা এবং অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহের শেয়ার সংশ্লিষ্ট করপোরেশনসমুহে প্রদান সম্পর্কিত ১৯৮৩ সনে সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন।

(খ) প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারঃ

স্বায়ত্তশাসিত করপোরেশন এবং অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে জন্মগত দুর্বলতার জন্য এই প্রতিষ্ঠানসমুহ দায়িত্ব পালনে অনুকূল ক্ষমতার অভাবের এবং অনাকাংখিত সমস্যা ও চাপের সম্মুখীন হচ্ছে।

সুপারিশঃ

১৯৮৩ সনের সরকারী সিদ্ধান্ত এবং ১৯৮৭ সনের ৭নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিসিআইসি, বিএসইসি, বিএসএফ আইসি, এবং বিটিএমসিকে হোল্ডিং করপোরেশনে রূপান্তর করা হোক।

(গ) জবাবদিহি ব্যবস্থার প্রবর্তনঃ

ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার স্থগিত রেখে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতিবিধান সম্ভব নয়। অন্যদিকে, দায়িত্ব পালন, ক্ষমতার প্রয়োগ এবং জবাবদিহির পূর্ব শর্ত হচ্ছে মন্ত্রণালয়, করপোরেশন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে অঙ্গীকারাবদ্ধ আত্মনিবেদিত এবং স্বীয় কাজে দক্ষ কর্মকর্তাদের উপস্থিতি যারা জবাবদিহির ক্ষেত্রে নিজ নিজ স্তরে জ্ঞান ভিত্তিক নেতৃত্ব দিতে সক্ষম।

সুপারিশঃ

(১) করপোরেশন বোর্ড কর্তৃক একজন পরিচালকের নেতৃত্বে একটি নিরীক্ষা উপ-কমিটি গঠনপূর্বক আভ্যন্তরীণ, বাণিজ্যিক (সরকারী) এবং সংবিধিবদ্ধ বড় ধরনের নিরীক্ষা আপত্তিসমুহ পরীক্ষা ও পর্যালোচনাপূর্বক যথোচিত ব্যবস্থাগ্রহণ।

(২) চেয়ারম্যান এবং ফাংশনাল ডাইরেক্টরবৃন্দ নির্মাণাধীন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, উৎপাদন বন্ধের কারণ বিশ্লেষণপূর্বক দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করে উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্যে সচেষ্ট হওয়া।

(৩) **করপোরেশনগুলির অন্যতম কার্য্যক্রমঃ**

(ক) নিয়মিত ও পর্যাবৃত অর্থনৈতিক এবং ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষা পরিচালনা করা।

(খ) করপোরেশন এর চেয়ারম্যান, পরিচালকমন্ডলী এবং প্রকল্প/শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার (ইন্টার একশানের) ব্যবস্থা করা।

(গ) কার্যকর জবাবদিহি প্রবর্তন করার জন্যে বিভিন্ন ধরণের উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(৪) কেবলমাত্র নিদিষ্ট দায়িত্ব পালনই কাউন্সিল ফর পাবলিক করপোরেশন (সিপিসি) এর জন্যে যথেষ্ট হবে না। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পাদিত কার্যাবলীর পর্যালোচনা নির্দিষ্ট ছকে যে সকল সংশোধন ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে ঐগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথভাবে অনুসরণ ও অনুশীলন করা হচ্ছে।

(ঘ) **ব্যবস্থাপনা সমস্যাঃ**

বিসিআইসি, বিএসইসি, বিএসএফআইসি এবং বিটিএমসি এর অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহে বর্তমানে বার্ষিক যথাক্রমে ১৩২০˙৪২ কোটি, ৪৫২˙০৯ কোটি, ৫৫২˙·০০ কোটি এবং ৩৯৬·৫৪ কোটি টাকা মূল্যমানের দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয় এবং সরকারী তহবিলে শুল্ক বাবদ বার্ষিক যথাক্রমে ১২৭˙৭৩ কোটি, ৮৯˙ ৩১ কোটি, ৬৬˙ ৫৭ কোটি, এবং ১৪·০৩ কোটি টাকা এবং সুদহিসেবে ১৭০৪৪ কোটি, ৫২˙২৬৭ কোটি, ২৩·১৩ কেটি, ও ২৯·৮৫ কোটি টাকা প্রদান করে। এই করপোরেশনসমুহে ১,১৯,৬৭০ জন লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে। এর ফলে আনুমানিক ৪·০০ লক্ষ আখ চাষী পরিবার পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু ৩০–৬–৯০ইং তারিখ অর্থ বছরে এই করপোরেশন গুলোর মোট ক্ষতির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে বিসিআইসি টাঃ ৬০·৭৩ কোটি, বিএসইসি টাঃ ২০৯˙০৬ কোটি, বিএসএফআইসি টাঃ, ৮৬˙২১ কোটি এবং বিটিএমসি টাঃ ২৫৫·৫৮ কোটি। ঋণ/ইকুইটির অনুপাত যথাক্রমে ৬৮%৩২, ৮৩:১৭, ·১০৫:(০৫) এবং ৯৪:৬। সুতরাং করপোরেশনসমুহের বাণিজ্যিকভিত্তিক সাফল্য উৎসাহব্যঞ্জক নয়, যদিও এই করপোরেশনসমুহের অধীনস্থ বেশ কয়টি প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতামূলক বাজারেও প্রশংসাযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তবে এটা অনস্বীকার্য্য যে, বাদবাকী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর এবং করপোরেশনগুলোর সার্বিক কর্মকান্ডের সুষ্ঠু উন্নয়ন সাধন অপরিহার্য্য।

সুপারিশঃ

(১) ঋণ/ইকুইটির পূনর্বিন্যাস শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মুলধন কাঠামো পর্য্যালোচনাপূর্বক অবিলম্বে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা ঃ

(ক) সরকারী ঋণ, যা বহুবিলম্বে ইকইুটি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে তার সুদের অংশ ইকুইটি থেকে অবলোপনকরা।

(খ) সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত ক্ষতিসমুহ পূরণ করা ঃ

(১) সরকার কর্তৃক মূল্য নির্ধারিত বিলম্বজনিত ক্ষতি;

(২) সরকার কর্তৃক ত্রুটিপূর্ণ এবং একতরফাভাবে গৃহীত আমদানী নীতির ফলশ্রুতিতে বাজার সংকোচন জনিত ক্ষতি ;

(৩) অযৌক্তিকভাবে শুল্ক কর নির্ধারণজনিত ক্ষতি।

(৪) উৎপাদিত পণ্যের আনুপাতিক মূল্য বৃদ্ধি বিবেচনা না করে কাঁচামালের মূল্য নির্ধারণ জনিত ক্ষতি, এবং

(৫) সরকারী কাজে নিয়োজিত উচ্চ পর্য্যায়ের রাজনীতিবিদ কর্তৃক নিয়ম বহির্ভূতভাবে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারন, ডিলার ও ঠিকাদার নিয়োগজনিত ক্ষতি।

(গ) দীর্ঘ মেয়াদী বৈদেশিক ঋণ যা অনুদান হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে, তা সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদান হিসেবে বিবেচনা করা।

(ঘ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন কাঠামোতে নতুন শেয়ার মূলধন অন্তর্ভুক্ত করা।

(২) **রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহের উন্নতি সাধনঃ** যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্রমাগত আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে ঐ গুলোকে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে সমীকরণ ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি সাধনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো। চির রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলোকে ক্রমান্বয়ে পুনর্বাসন করা।

(৩) **উদ্বৃত্ত ও অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহারঃ**

(ক) সীমান্তের ওপার হতে তুলা, সুতা, শাড়ি, সুতি বস্ত্র, চিনি, যন্ত্রাংশ ও ব্লেডের মত দ্রব্য সামগ্রীর চোরাচালান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণপূর্বক স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এসব দ্রব্যাদির চাহিদা বাড়ানো।

(খ) বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী (বিএমটি এফ), বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট (বিডিপি), জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যেকচারিং কোম্পানী (জিইএমকো) চিটাগাং ষ্টীল মিলস (সিএসএম) এবং চিটাগাং ড্রাই ডক এর মত ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প সামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থাকরণের লক্ষ্যে গবেষণা ডিজাইন ও উন্নয়ন (আরডিডি) পদ্ধতি নিবিড় ভাবে শুরু করা হোক। বিএসইসি কর্তৃক পরিচালিত এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, উদবৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহারের মাধ্যমে বিএমটিএফ, বিডিপি, জিইএমকো ও প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রীজ লিঃ (পি আই এল) প্রতিষ্ঠানসমুহে মাত্র ১১.০০ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে যথাক্রমে ট্রাক ও বাসের বর্তমান মূল্যের প্রায় ৬৫% ও ৭৯% বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করা সম্ভব বার্ষিক আনুমানিক আমদানীর ৫ লক্ষ টন ইস্পাত সামগ্রীর অংশ বিশেষ চিটাগাং ষ্টীল মিল স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে গবেষণা ডিজাইন ও উন্নয়ন এর জন্য নিবিড় কার্য্যক্রমের ব্যবস্থা করা হোক।

(গ) ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহের সাথে সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করার প্রচেষ্টা জোরদার করা।

(ঘ) বৈদেশিক উৎপাদনকারীদের সাথে উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ চুক্তি সম্পদন করা।

(ঙ) যে সকল মৌলিক শিল্পজাত (ক্যাপিটাল) দ্রব্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদন সম্ভব সে সকল দ্রব্যের আমদানী নিষিদ্ধ করা।

(চ) নিবিড় বাজার ব্যবস্থাপনা পরিচালনার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেয়ন, তুলা, সুতা ও কাপড় ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং এই সকল দ্রব্যের আমদানী নিষিদ্ধ করা।

(ছ) তৈরী পোষাক শিল্পে ব্যবহারের জন্য সুতি বস্ত্র মিলসমুহের উৎপাদিত পণ্যের বেকওয়ার্ড ইনটিগ্রেশনের জন্যে প্রচেষ্ঠা করা।

(জ) উচ্চ সুক্রোজ যুক্ত আখের একর প্রতি ফলন বৃদ্ধির জন্য কৃষি সম্প্রসারণ কার্য্যক্রম জোরদার করা।

(ঝ) যে সকল শিল্পে প্রতিষ্ঠানকে উচ্চমানের সঙ্কর ইস্পাত ইনগট উৎপাদনের অনুমতি দেয়া হয়েছে সে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্ন মানের ইস্পাত ইনগট উৎপাদন বন্ধকরা হয়।

(ঞ) অবৈধ আমদানী কৌশল বন্ধ করার লক্ষ্যে বাণিজ্যিক মানের আমদানীকৃত ইস্পাত প্লেটের শুল্ক বৃদ্ধি করে লয়েড মানের ইস্পাত প্লেটের শুল্কের সমপরিমাণ করা।

(ট) জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর অনুকূলে প্রদত্ত সুবিধা যেমন শুল্কাধীন পণ্যাগার সুবিধা, পরিচালন মূলধনের উপর ৯% সুদ এবং বৈদেশিক মুদ্রায় বিক্রিযোগ্য পণ্যের উপর শতকরা ১৫% ভাগ নগদ রেয়াত প্রদান সুবিধা অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্যে সম্প্রসারণ করা।

(ঠ) বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী অথবা রপ্তানীর জন্য উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহৃত মধ্যবর্তী কাঁচা-মাল (ইন্টারমিডিয়েটর ম্যাটেরিয়াল) উৎপাদনকারীর জন্য শুল্কাধীন পণ্যাগার সুবিধা প্রদান।

(ড) উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানী বাজার সৃষ্টির জন্যে জোর প্রচেষ্টা চালানো।

(৪) ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস/লভাংশের উন্নয়নঃ

(ক) শতকরা পঞ্চাশ ভাগ, বিশেষ করে অলাভজনক ও প্রান্তিক লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহ'পারফরমেন্স কন্ট্রাক্ট' এর আওতাধীনে আনা। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এবিডব্লিউ উইংকে আরো শক্তিশালী করে গড়ে তোলা এবং পারফরমেন্স কন্ট্রাক্ট উপযুক্ত 'মটিভেশনাল মিক্স' এর ব্যবস্থা করা।

(খ) অটোনমাস বডি উইং (এবিউইং) এবং সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহ এমআইএস প্রকোষ্ঠের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও ব্যবহারিক অনুপাত নির্ধারণের জন্য কম্পিউটার তথ্য ভিত্তি গড়ে তোলা।

(গ) উৎপাদিত পণ্যের দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ, চুক্তিসমুহ সম্পাদন, ডিলারদের নিয়োগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সরাসরি হস্তক্ষেপ রোধ নিশ্চিত করা।

(ঘ) বিভিন্ন সরকারী ডিপার্টমেন্ট/এজেন্সী কর্তৃক চিনি, সার ইত্যাদির উত্তোলনের ক্ষেত্রে গড়িমসির দরুন যে আর্থিক ক্ষতি হয় তার ক্ষতিপূরণের এবং উত্তোলিত পণ্যের মূল্য প্রদানে বিলম্ব জনিত আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্যে সুদ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(ঙ) ইপিএইচ (এষ্ট্যাবলিশমেন্ট পারমিট হোল্ডার) ব্যবস্থার অধীনে চিনি বিক্রয় ব্যবস্থা বাতিল করা এবং এর পরিবর্তে খোলাবাজারে চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা উল্লেখযোগ্য যে, চিনির বর্তমান মজুদের পরিমাণ প্রায় ১,৭০,০০০ মে টন যার মূল্য প্রায় ৫০০.০০ শত কোটি টাকা।

(চ) সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৮২ সনে অবসায়িত (লিকিউডেটেড) বিটিএমসির চারটি মিলের ব্যাংক দায় সরকার কর্তৃক গ্রহণ।

(ছ) প্রস্তাব দাখিলের এক সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয়/সিপিসি কর্তৃক সংবেদনশীল পণ্যের মূল্য নির্ধারণকরা।

(জ) পণ্য বিনিময় বার্টার) অথবা শর্তযুক্ত উৎস থেকে তুলা ক্রয়ের দরুন উৎপাদন ব্যয় ন্যূনপক্ষে ২০% কমিয়ে আনার জন্য সেকেন্ডারী একচেঞ্জ মার্কেটের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা জোগাড় করে তুলা চয়ন মৌসুমে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে তুলা সংগ্রহের জন্য বিটিএমসি কে অনুমিত প্রদান। বিকল্প হিসাবে বিশ্ব ব্যাংকের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অনুযায়ী মিলসমুহকে শর্তযুক্ত উৎস থেকে ক্রয়জনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা।

(ঝ) কর নীতি, কাঁচামালের মুল্য নির্ধারণ নীতি প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট করপোরেশনসমুহের অংশ গ্রহনের সুযোগ প্রদান। আনুপাতিক হারে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ।

(৫) করপোরেশনসমুহ এবং তাদের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমুহে মানব সম্পদ উন্নয়ন সিস্টেমস এর প্রবর্তন ও বাস্তবায়নঃ

(ক) সিস্টেমস এ্যাপ্রোচের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন জরিপ করা।

(খ) করপোরেশনসমুহের স্বীয় এবং দেশের অভ্যন্তরে স্থাপিত প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(গ) প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠানসমুহকে আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে পরিচালনা করা এবং

(১) প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ,

(২) আধুনিক প্রশিক্ষণ রীতিনীতির প্রবর্তন, ও

(৩) প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণোত্তর সমীক্ষার ব্যবস্থা করা।

(ঘ) প্রারম্ভিক ভাবে মানব সম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য প্রত্যেক কর্পোরেশনের বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচিত করা।

(ঙ) ব্যবস্থাপানা পদ্ধতির দৃষ্টিভর্ংগির আলোকে কর্পোরেশনের উর্ধতন কর্মকর্তাদের জন্য রিফ্রেসার কোর্সের ব্যবস্থা করা।

(চ) কর্পোরেশনসমুহে 'ক্যারিয়ার প্লানিং' এর প্রবর্তন করা।

(ছ) কর্পোরেশনসমূহ ও তাদের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্যে পৃথক বেতন স্কেল পুনঃ প্রবর্তন করা এবং বেতনের পুনঃস্তর বিন্যাস পরীক্ষা নিরীক্ষা করা।

(জ) প্রশিক্ষণ এবং 'আর, ডি, ডি' কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য পৃথক পদোন্নতি বিধি প্রবর্তন করা।

(ঝ) কর্পোরেশনসমূহ এবং তাদের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীদের জন্যে এমন একটি উপযুক্ত উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া প্রবর্তন করতে হবে যাতে পুরস্কার এবং শাস্তি উভয়েরই ব্যবস্থা থাকে।

(ঞ) ধারাবাহিকতা ও পেশাদারিত্বঃ ব্যয়সাধ্য প্রশিক্ষণ ও দক্ষতাবৃদ্ধির প্রক্রিয়ার সদ্ব্যবহারের জন্যে একই ধরণের কার্য্য পরিধিতে সম্ভবপর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

(ট) কার্যাবলীর মাপকাঠি নির্ধারণ করা এবং প্রশাসকবৃন্দ ও তাদের অধীনস্তদের সাফল্য ও ব্যর্থতা মূল্যায়নের ষান্মাসিক নিরীক্ষা ও পরামর্শদানের ব্যবস্থা করা।

(ঠ) বৃহৎ প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি 'কোর প্রজেক্ট' বাস্তবায়ন গ্রুপ নিয়োগ করা। এই গ্রুপ 'ইউনিডো' কর্তৃক নির্ণীত আদর্শ চুক্তিপত্র পদ্ধতি, চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নিয়মাবলী, প্রকল্প বাস্তবায়নকৌশল, কম্পিউটারভিত্তিক কর্মসূচী প্রণয়ন এবং 'পার্টসিপিএম' ভিত্তিক কর্মসূচী পুনঃপ্রণয়ন সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত হতে হবে। প্রকল্প কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ এবং ঋণদাতাগণ কর্তৃক সম্মত একটি সাধারণ 'সিপিএম' থাকতে হবে যাতে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহের কর্মসূচী অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য জবাবদিহি করা যায়। এই ব্যবস্থা অতীতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সময় এবং ব্যয় বৃদ্ধি ঘটেছে তা এড়াতে উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করবে।

(ড) পেশাগতভাবে উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে কর্পোরেশনসমূহ ও তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নতি ও শক্তিশালী করা।

(ঙ) ক্ষমতা প্রদান

দায়িত্ব, ক্ষমতা এবং জবাবদিহিতা অঙ্গাংগিভাবে জড়িত। কর্পোরেট এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনের আইনগত গঠনতন্ত্রে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিধান রয়েছে। সরকারী কর্পোরেশনসমূহকে হোল্ডিং কর্পোরেশনে রূপান্তরিত করার সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কথাও এতে উল্লেখ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় পারস্পরিক বিশ্বাসযোগ্যতার মাধ্যমে আমাদের পক্ষে ক্ষমতা প্রদান কষ্টসাধ্য হওয়া উচিত নয়।

সুপারিশসমূহ

(১) অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী পদসৃষ্টি, নিয়োগ, পদোন্নতি ও অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া, সম্পদের সঞ্চালন, মূল্য নির্ধারণ, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারজাতকরণের জন্যে প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতাসহ কর্পোরেশনসমূহের পুর্ণ কার্যনির্বাহী ক্ষমতা থাকতে হবে। একইভাবে আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেট অনুমোদিত হয়ে গেলে বাজেট বরাদ্দের আওতায় তাদেরও কার্যনির্বাহী ক্ষমতা থাকবে। তবে 'ক্যারিয়ার প্লানিং', কাঁচামালের বৃহদাকার আমদানী এবং সূক্ষ্ম রক্ষণাবেক্ষণ, ইত্যাদির ক্ষেত্রে কর্পোরেশনসমূহ ও তাদের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্মত ব্যতিক্রম থাকতে হবে।

(২) কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বোর্ডগুলির সিদ্ধান্তের গুণগত দিকের প্রতি নজর রাখবেন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের যথোচিত শিল্প সংস্কৃতি গঠনে উৎসাহিত করবেন।

(৩) সরকার হোল্ডিং কর্পোরেশনের চেয়াম্যান এবং পরিচালকমন্ডলীর সদস্যদের নিয়োগ করবেন। কর্পোরেশন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালন বোর্ডের কর্মপরিধি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

(৪) কর্পোরেট প্রশাসনের ভারসাম্য সংরক্ষণের জন্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্পোরেশনসমূহের চেয়ারম্যান ও পরিচালকবৃন্দের নিয়োগের পূর্বতন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে।

(৫) কর্পোরেশনসমুহের উর্ধতন পদসমুহ কর্পোরেশন কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাপনা ও কারিগরী কার্য্যকারিতার মাপকাঠির ভিত্তিতে পুরণ করতে হবে, যাতে যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং পরিবেশগত ভারসাম্য ও আত্মনিবেদনের ধারণা সংরক্ষণ করা যায়। জ্যেষ্ঠতার চাইতে কর্মদক্ষতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বিশেষভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনসমুহে "লেটারেল এন্ট্রি" ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(চ) গবেষণা, ডিজাইন ও উন্নয়ন

খসড়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উৎপাদনশীলতার উন্নতি বিধান, উৎপাদন পরিকল্পনা, পণ্যের উন্নয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ, বাজার গবেষণা ও 'দক্ষতা ধারণার উন্নয়ন' এবং জাতীয় কারিগরি ক্ষমতাসমুহের উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার উন্নতির বিধান এবং উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ১৯৮৯–৯০ সালের মূল্য অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ব খাতে ৪১৪৮˙০০ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বিনিয়োগের মধ্যে ২২৪২˙৯০ কোটি টাকা (প্রায় ৫৪˙৬%) চালু প্রকল্পসমূহের জন্যে ব্যয় হবে এবং অবশিষ্ট ১৮৯৭˙১০ কোটি টাকা (৪৫˙৪%) নূতন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই অবশিষ্ট অর্থ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিল্প উন্নয়ন কর্মসুচীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। আশা করা যাচ্ছে যে সরকারী খাতের উৎপাদনশীল কর্পোরেশনসমূহ এই উন্নয়ন প্রেক্ষাপট, যার মধ্যে রয়েছে মানব সম্পদ উন্নয়ন সিসটেমস, ব্যালান্সিং ও মডার্নাইজেশন, রির্সাচ, ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট, উৎপাদন ইত্যাদি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা এবং সম্যক ব্যবহার করবেন।

সুপারিশঃ

(১) প্রকৌশল শিল্পখাতে অতি প্রয়োজনীয় অগ্রগতি অর্জনের জন্যে (ব্রেক থ্রু) সূচিহ্নিত উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিএমটিএফ–বিডিপি কমপ্লেক্সে একটি প্রয়োজনভিত্তিক ধাতু প্রক্রিয়াকরণ, গবেষণা ডিজাইন এবং উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। (ক) প্রারম্ভিকভাবে ই আর ডি ডি কেন্দ্রকে বিএসএফআইসি এর প্রস্তাবিত দুটি চিনিকল নির্মাণের জেনারেল কন্ট্রাকটর নিয়োগ এবং (খ) বিএসইসির আওতাধীন বিএমটিএফ, বিডিটি জিইএমকো, সিডিডি, ডিইডব্লিউ ও পিআইএল এ প্রাপ্তব্য সুবিধাবলী ব্যবহার করে একটি প্রটোটাইপ ট্রাক/বাস নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ এবং (গ) উচ্চতর উৎপাদনশীলতা ব্যবস্থাবলী ও উৎপাদিত পণ্যে ক্ষেত্রে বিভিন্নতা আনয়ন বাস্তবায়নের জন্যে পরীক্ষা নিরীক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে।

(২) বর্তমানে আমদনীকৃত পাঁচ লক্ষ মেঃ টন ইস্পাতজাত দ্রব্যের আংশিক আমদানী বিকল্প উৎপাদনের লক্ষ্যে সিএসএম এ একটি আরডিডি কেন্দ্র স্থাপন করা।

(৩) বিএসএফআইসি–র ঈশ্বরদীতে অবস্থিত ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (এসআরটিআই) উন্নয়ন করা

(৪) সাভারে অবস্থিত বিটিএমসি–র বস্ত্র শিল্প উন্নয়ন কেন্দ্রের (টিআইডিসি) উন্নতি বিধান করা।

(৫) বহির্বিশ্বের প্রখাত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কারিগরি ও প্রকৌশল সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন এবং ভারী শিল্প/কারখানা ও বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রাংশ তৈরী করা, যাতে উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হয়।

(৬) গবেষণা কেন্দ্রসমুহে বাংলাদেশী মেধাবী ব্যক্তিদের এবং বিদেশে কর্মরত সুপরিচিত মেধাবী ব্যক্তিদের আকর্ষণীয় সুবিধা ও বেতন ভাতাদি প্রদানের মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা করা। গবেষণা, ডিজাইন ও উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের একটা পৃথক বেতনক্রম ও টাইমস্কেলের প্রয়োজন হবে। এ জাতীয় কেন্দ্রসমুহের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করতে হবে।

(ছ) নীতিগত বিষয়সমূহঃ

লক্ষ্য করা গেছে যে নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কর্পোরেশন ও তাদের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কর্মকর্তাদের সাথে সাধারণত আলোচনা করা হয় না।

সুপারিশঃ

সরকারী প্রতিষ্টানসমূহের বাণিজ্যিক ও আর্থিক কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়ন নীতি এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন, বিতরণ, বিক্রয়, ইত্যাদি বিষয়ে নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় এ সব প্রধান কর্মকর্তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দান করা হোক।

(জ) **প্রচলিত আইনসমূহের সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থাঃ**

(১) সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রায়শঃ শ্রমিক ইউনিয়নের বে-আইনী চাপের শিকার হয়।

(২) বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক কার্য্যকারিতা না থাকা সত্ত্বেও চির রুগ্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবসায়ন না করে চালু রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

সুপারিশঃ

(১) বে-আইনী শ্রমিক আন্দোলন নিরস্ত করার জন্যে শিল্প সম্পর্ক আইন (আইআরও) সংশোধন করা হোক।

(২) কোম্পানী আইনের অবসায়ন করার ধারার কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা হোক।

(৩) একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকৌশল শিল্পজাত পণ্যের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধান স্থানীয় মূল্যহার বৃদ্ধি ন্যূনপক্ষে ৫০% বাধ্যতা মুলক করা হোক। এ জন্যে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

(৪) শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়স ধার্য্য করা হোক এবং শ্রম আইনে অবসর গ্রহণ বয়স অর্ন্তভুক্ত করা হোক।

(৫) বর্তমান আইনানুযায়ী কারখানা বন্ধ সময়ের জন্যে দেয় মজুরীর ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করে দেখা হোক।

টাস্ক ফোর্সঃ ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের ভূমিকা ও উন্নয়ন কৌশল

নাম ও ঠিকানা		পদ
ডঃ কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশউন্নয়নপরিষদ।	..	আহ্বায়ক
অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়।	..	সদস্য
জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন।	..	সদস্য
ডঃ হামিদা হোসেন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র।	..	সদস্য
জনাব মির্জা নাজমুল হুদা, পরিচালক (উন্নয়ন), মাইক্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিটেন্ট সোসাইটি।	..	সদস্য
জনাব নজরুল ইসলাম, উপ–প্রধান (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ রেশম বোর্ড।	..	সদস্য
ডঃ এম এ আজিম জাহাংগীর, প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন), বাংলাদেশতাঁতবোর্ড।	..	সদস্য
ডঃ এম, এ লতিফ, গবেষণা সহযোগী, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান;, উপদেষ্টা টি আই পি।	..	সদস্যসচিব
জনাব এম ফয়জুর রাজ্জাক, যুগ্ম সচিব, বাংলাদেশনির্বাচনকমিশন।	..	সদস্য
মিসেস খালেদা সালাহ উদ্দিন, উপদেষ্টা (গ্রামীণ কর্মসংস্থান), টি এস এম ইউ, বস্ত্র মন্ত্রণালয়।	..	সদস্য
জনাব এ মান্নান তালুকদার, যুগ্ম প্রধান (ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প উইং), পরিকল্পনা কমিশন।	..	সদস্য
জনাব কে এম সিদ্দিক উল্লাহ, মহাপরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।	..	সদস্য

টাকা এবং ৫,০০০ টাকা। স্বল্প পুঁজির ব্যক্তিগণ এ ধরণের শিল্পের মালিক হতে পারেন, ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তেমন কোন প্রতিবন্ধকতা নেই এবং এর ভৌগোলিক বিস্তরণ অপেক্ষাকৃত সহজ ও সম্ভাবনাময়; অনুন্নত এলাকায় এ সকল শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে ভারসাম্যময় আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এ সকল শিল্পোদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট সরবরাহের উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে; এ শিল্প গুলো নতুন পণ্যের ও ধ্যানধারণার একটি বীজক্ষেত্র হিসেবে কাজ করতে পারে এবং কাজের মাধ্যমে আয়ত্বকরণ প্রক্রিয়ায় মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম। এ শিল্পগুলোর অত্যন্ত শক্তিশালী সম্মুখ ও পশ্চাৎ সংযোগ সম্পর্ক রয়েছে; শ্রম বিভাজনের ক্ষেত্রে এ সকল শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে; বৃহৎ শিল্পের উপ-ঠিকাদার (সাব-কন্ট্রাক্টর) হিসেবে বিশেষায়ণ ঘটায় ও খরচ কমিয়ে আনে। এ সকল শিল্পে তুলনামূলকভাবে সহজ প্রযুক্তি ও স্বল্প মূল্যের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ প্রয়োজন হয় বলে সেগুলো স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা যায় এবং বৈদেশিক প্রযুক্তি নির্ভরতা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। এ সকল শিল্প মহিলাদের জন্য পূর্ণ বা খন্ডকালীন সময়ের জন্য ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে; বৃহৎ শিল্পের তুলনায় এগুলো অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মূলধন ব্যবহার করে এবং বিশেষ ধরণের নকশা ও আংগিকের দ্রব্যাদি সরবরাহ করে নির্দিষ্ট বাজার বা বাজারের কোন একটি অংশের চাহিদা পূরণ করতে পারে।

দীর্ঘ মেয়াদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, ক্রমান্বয়ে উন্নততর প্রযুক্তির সূচনা, ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উন্নয়ন ও চাহিদা ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ, কর্মসূচী পরিচালনা ও কাজের মাধ্যম (অন দ্যা জব) দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টি করে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প একটি গতিশীল শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার ভিত্তি তৈরীতে সক্ষম।

প্রতিবন্ধকতা ও নীতি পর্যালোচনা

ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের প্রতিবন্ধকতাসমূহকে সরবরাহ ও চাহিদার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং তৎসংগে নীতিগত বিষয়াবলীর প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সরবরাহ দিকের প্রতিবন্ধকতাসমূহের মধ্যে রয়েছে কাঁচামালের প্রাপ্যতা এবং সংগ্রহ সম্পর্কিত সমস্যা, স্থায়ী এবং চলতি মূলধনী ঋণের দুস্প্রাপ্যতা, প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা, ব্যবস্থাপনা অদক্ষতা, অনুন্নত অবকাঠামো এবং অপর্যাপ্ত শিল্পোদ্যোক্তা এবং দক্ষ প্রশিক্ষণ সুবিধার অভাব ইত্যাদি। চাহিদার দিক থেকে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের বিশ্লেষণে গ্রামীণ শিল্পের প্রধান সমস্যা হচ্ছে নিম্ন মাত্রার গ্রামীণ আয়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ হচ্ছে অনুন্নত উৎপাদন সংযোগ, শহরাঞ্চলের সীমিত চাহিদা এবং রপ্তানী বাজারে প্রবেশের ব্যর্থতা।

নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ বহু দিন ধরে আমাদের কাছে পরিচিত যার মধ্যে রয়েছে সঠিক নীতি প্রণয়নের অথবা তা বাস্তবায়নের ব্যর্থতা। আরো সুনির্দিষ্ট ভাবে বললে বলা যায় যে, ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প উন্নয়নের জন্য দেশে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। ফলে যদিও বিভিন্ন সরকারী দলিলে এই খাতকে কর্মসংস্থান এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বর্ধনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু সম্পদ বরাদ্দও নীতিগত সমর্থনের ক্ষেত্রে একে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

এটি সর্বজন স্বীকৃত যে, খাতওয়ারী এবং সামষ্টিক পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্ত যে কোন খাতের মাঠ পর্যায়ের কাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে উপযোগী ব্যাষ্টিক (ম্যাক্রো) পরিবেশও অপরিহার্য। তাই এটি প্রয়োজনীয় যে, সাধারণ সরকারী নীতিমালাসমূহ যেমন—সামগ্রিক সম্পদের প্রাপ্যতা, প্রযুক্তি নীতি, উন্নয়নমূলক ও সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ, রপ্তানী ও আমদানী নীতিমালা ও নীতিসমূহ বাস্তবায়নের পদ্ধতি ইত্যাদি এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন প্রয়াস সহজতর হয়।

সুপারিশঃ

বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের প্রতিবন্ধকতাসমূহের পর্যালোচনার ভিত্তিতে এবং ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত নীতিমালা প্রয়োগ

করা হয়েছে তা বিবেচনায় রেখে এ প্রতিবেদনে কতিপয় সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। সুপারিশগুলোকে মুলতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা-সাধারণ সুপারিশমালা, মহিলা বিষয়ক সুপারিশমালা এবং কতিপয় নির্বাচিত শিল্প সম্পর্কিত সুপারিশমালা। নির্ধারিত স্বল্প সময়ে তথ্য ও উপাত্ত পাওয়ার উপর ভিত্তি করে কয়েকটি শিল্প নির্বাচন করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র শিল্প এবং গ্রামীণ শিল্প শুধু আকারগত ভাবেই স্বতন্ত্র নয়, প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সামর্থ্যের দিক থেকেও তা স্বতন্ত্র ধরণের। দেশে যেখানে প্রায় ৪০.০০০ ক্ষুদ্র শিল্প রয়েছে, সেখানে দেশে গ্রামীণ শিল্প রয়েছে কয়েক লক্ষ। বি আই ডি এস পরিচালিত (১৯৭৮-৮১) গ্রামীণ শিল্প সমীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, জরিপে অন্তর্ভুক্ত এগারোটি উপজেলায় গ্রামীণ শিল্প ছিল ৫৭,০০০। তাই এটা সহজেই অনুমেয় যে, সারা দেশে বিশেষেতঃ গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গ্রামীণ শিল্পসমূহে সহায়তা পৌছানো খুবই কঠিন।কাজেই এ ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদির ব্যবস্থাদি এ খাতটির লক্ষ্য অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত হতে হবে। নিম্নে প্রণীত সুপারিশসমূহের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের জন্যে আলাদা আলাদা প্রস্তাব রাখা হয়নি। অনেকগুলো সুপারিশ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং যেগুলো শুধুমাত্র ক্ষুদ্র বা গ্রামীণ কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য সেগুলোও সহজেই চিহ্নিত করা যাবে।

সাধারণ সুপারিশমালাঃ

১। প্রতিষ্ঠান

(ক) ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প ক্ষেত্রে কর্মরত মন্ত্রণালয়, সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী/স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্যে কার্যকরভাবে সমন্বয় সাধন করতে হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়কে এর জন্যে উপযুক্ত পদ্ধতি বের করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

(খ) **বিসিকের পুনর্গঠনঃ** সংস্থাটি ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প উন্নয়নের জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্য সরকারী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দেখা গেছে যে, সংস্থাটি ঐতিহ্যগতভাবে গ্রামীণ শিল্পের চাইতে ক্ষুদ্র শিল্প ও শিল্প নগরীর প্রতিই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। এ জন্যে এ প্রতিষ্ঠানে দু'টি স্বতন্ত্র উইং থাকা প্রয়োজন, যার প্রতিটি একজন করে ডেপুটি চেয়ারম্যান বা অন্য কোন উপযুক্ত পদবীবিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রতিটি উইংয়ের কর্মকান্ড পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত থাকবে। আঞ্চলিক, জেলা ও মাঠ পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো একইভাবে বিভাজিত হবে।

(গ) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ও বাংলাদেশ রেশম বোর্ডকে উপযুক্ত ভাবে পুনর্গঠন করতে হবে, যাতে প্রতিষ্ঠান দু'টি গ্রামীণ শিল্পের দিকে পর্যাপ্ত দৃষ্টি দিতে পারে।

(ঘ) বিসিক, তাঁত বোর্ড ও রেশম বোর্ডের উপর প্রাথমিকভাবে উন্নয়নমূলক, সহায়ক ও বিপণন কার্যাবলী সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন-উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদকে অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট করতে হবে।স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বিসিক, তাঁত বোর্ড ও রেশম বোর্ডের সহায়তায় অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করবে।

২। উপাত্ত ভিত্তি

ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প উন্নয়নের নিমিত্তে কার্যকরভাবে পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নের জন্য উপাত্ত ভিত্তির উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

বিসিক, বি আই ডি এস, তাঁত বোর্ড বা রেশম বোর্ড যদিও নির্দিষ্ট সময় পরপর জরিপ বা সাময়িক জরিপের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে থাকে, তা সত্ত্বেও সঠিক উপাত্তের প্রাপ্যতা একটি বড় সমস্যা। তাই প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় অবিরত বিস্তারিত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

৩। তথ্য পরিধারণ ও বিশ্লেষণে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

বিদ্যমান প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার, পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (স্কীটি)-কে তথ্য পরিধারণ ও বিশ্লেষণের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে। এর জন্য স্কীটি-র দু'টি বিভাগ থাকবে, যথা-প্রশিক্ষণ শাখা ও গবেষণা শাখা। সংস্থাটি যাতে এর উপর অর্পিত উভয় দায়িত্বই সুচারুরূপে পালন করতে পারে তজ্জন্য এর কর্ম পরিসরকে আরো উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করা আবশ্যক। স্কীটি কিভাবে এ দু'টি কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে তার জন্যে ত্বড়িত কার্যক্ষেত্র তৈরী করে এগিয়ে যেতে হবে। সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদনের জন্যে সংস্থাটিকে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় উন্নীত করা যেতে পারে।

৪। তহবিল বরাদ্দ

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্যে এডিপি বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন; প্রয়োজনে বর্তমানের তুলনায় তা দ্বিগুণ করতে হবে। বরাদ্দকৃত তহবিল যাতে যথাসময়ে ও পুরোপুরি ছাড় পায় তারও নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৫। বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিনিয়োগ সীমা

বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগযোগ্য ঋণ তহবিলের ন্যূনতম ৫% ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প খাতে বিনিয়োগের যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তা ৫% থেকে বাড়িয়ে ১০%-এ উন্নীত করা আবশ্যক। এবং উক্ত ঋণ তহবিলের ন্যূনতম ৫০% স্থায়ী মুলধন খাতে বিনিয়োগের জন্যে প্রদান করতে হবে।

৬। বিসিক শিল্প নগরীর জন্য লীড ব্যাংক পদ্ধতি চালুকরণ

বিসিক শিল্প নগরীগুলোর মধ্যে বিশেষ করে যে সমস্ত শিল্প নগরী অনুন্নত এলাকায় অবস্থিত তার মধ্যে গুটিকতক শিল্প নগরীকে পরীক্ষামূলক ভাবে লীড ব্যাংক পদ্ধতির আওতায় এনে এ কর্মসূচী হাতে নেয়া যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট শিল্প নগরীর জন্যে একটি নির্দিষ্ট ব্যাংককে মনোনীত করতে হবে। উক্ত লীড ব্যাংক সংশ্লিষ্ট শিল্প নগরীতে যে সমস্ত শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে তার প্রত্যেকটি শিল্প কারখানায় প্রয়োজনীয় স্থায়ী ও চলতি মূলধন যোগান দিবে। এ পদ্ধতি প্রবর্তন করলে তা শিল্প নগরীতে শুধু নতুন নতুন শিল্প ইউনিট স্থাপনেই সহায়তা করবেনা বরং স্থাপিত শিল্প ইউনিটগুলো সময়মত ঋণ তহবিল প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাবে এবং শিল্প ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ ছাড়াও এ পদ্ধতিতে শিল্প নগরীতে লীড ব্যাংক শিল্প ইউনিটগুলোতে তার বিনিয়োজিত তহবিলের উন্নততর নিরাপত্তার (সিকিউরিটি) নিশ্চয়তা পাবে। কারণ শিল্প উদ্যোক্তাগণ শুধুমাত্র নির্ধারিত লীড ব্যাংকের মাধ্যমেই তাদের প্রয়োজনীয় ঋণ তহবিলের যোগান পাবে। পরীক্ষামূলক ভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকটি নির্ধারিত শিল্প নগরীতে এ কর্মসূচী চালু করা যেতে পারে এবং এর সফলতার ভিত্তিতে পরবর্তীতে আরো অধিক সংখ্যক শিল্প নগরীতে এ কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

৭। রুগ্ন শিল্পের জন্য আলাদা ঋণ তহবিল

রুগ্ন শিল্প চিহ্নিত করে তা মূল্যায়নের ভিত্তিতে উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করে রুগ্ন শিল্পকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৮। ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের জন্য উন্নয়নমূলক ব্যাংক

ক্ষুদ্র ও বাণিজ্যিক ঋণ প্রদানের জন্যে বেসরকারী খাতে স্থাপিত ক্ষুদ্র শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যাংক (বসিক)-কে পুনর্গঠন করা আবশ্যক, যাতে ব্যাংকটি ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ব্যাংকটি তা করছে না। যদি তা করা সম্ভব না হয় তবে শুধু এ খাতকে ঋণদান দ্বারা সহায়তা করার জন্য সতন্ত্র একটি উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার প্রয়োজন রয়েছে। ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ

শিল্পের জন্য স্থাপিত উক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র এ খাতে সরাসরি অর্থায়ন করবে না, পাশাপাশি নেতৃত্ব গ্রহণ করবে এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকেও অর্থ এ খাতে যাতে আসে তার জন্য পদক্ষেপ নেবে।

৯। ঋণ নিশ্চয়তা বিধান কর্মসূচী (ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম)

বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার জন্যে যে সকল উদ্যোক্তা ঋণের জামানত হিসাবে বন্ধকী প্রদানে অসমর্থ, সে সকল উদ্যোক্তাকে (মহিলা ও পুরুষ উভয়কেই) প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ঋণ নিশ্চয়তা বিধান কর্মসূচী (ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম) চালু করা দরকার।

উল্লেখ্য যে, বিসিক ঋণ নিশ্চয়তা বিধান কর্মসূচীর একটি রূপরেখা প্রণয়ন করে ইতিমধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পেশ করেছে।

১০। সীড ক্যাপিটাল যোগান

শিক্ষিত ও কারিগরী যোগ্যতা সম্পন্ন যে সকল ব্যক্তি ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে আগ্রহী অথচ মূলধনের অভাবে শিল্প স্থাপন করতে পারছেন না, তাদেরকে শিল্প স্থাপনে সহযোগিতা দানের লক্ষ্যে সীড ক্যাপিটাল যোগানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিসিক এ সকল উদ্যোক্তাকে (মহিলা ও পুরুষ) চিহ্নিত ও বাছাই করবে এবং মূলধনের অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে প্রাথমিক পুঁজি যোগান দেয়ার দায়িত্ব নেবে। এ ক্ষেত্রে বিসিক প্রাথমিক মূলধনের শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত প্রদান করতে পারে (প্রসংগত উল্লেখ্য যে, অনুরূপ পদ্ধতি ভারতে চালু রয়েছে)।

১১। ঋণের জন্য জামানত

গ্রামীণ শিল্প স্থাপনে শিল্পোদ্যোক্তাদের (মহিলা ও পুরুষ উভয়ই) যারা জামানত (কোলেটারাল) প্রদানে সক্ষম হচ্ছে না তাদের জামানত ব্যতিরেকেই কিংবা সহজ জামানতের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

১২। হায়ার পারচেজ ব্যবস্থা

ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে হায়ার পারচেজ ভিত্তিতে তাদের শিল্প কারখানায় প্রয়োজনীয় দেশী ও বিদেশী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করতে হবে।

উক্ত পদ্ধতি গৃহীত হলে সকল পদক্ষেপ সহজ ও দ্রুততর হবে বলে আশা করা যায়।

১৩। বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান

ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে তাদের শিল্পের জন্য আমদানীযোগ্য যন্ত্রপাতি যথাসময়ে ও সহজ পদ্ধতিতে আমদানীর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার যোগান নিশ্চিত করতে হবে।

যন্ত্রপাতি আমদানীতে উদ্যোক্তাদের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা প্রায় ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ বিভিন্ন দাতা সংস্থা থেকে সহজ শর্তের ঋণ অথবা অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে মেটানো হয়ে থাকে। ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বিসিক ও বেসিক লীড ব্যাংক লীড এজেন্সী হিসেবে মূল দায়িত্ব পালন করবে। এ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সকল ঋণ কর্মসূচী সদ্ব্যবহারের মুখ্য দায়িত্বও এ দু'টি সংস্থা পালন করবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারষ্ট্যান্ডিং প্রণয়ন করতঃ বিসিক এবং ব্যাংকগুলোর দায়িত্বাবলী সুস্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৪। ক্ষুদ্র শিল্পের বিনিয়োগ সীমা

ক্ষুদ্র শিল্পের বিনিয়োগ সীমা টাকা ১.৫০ কোটি হতে ৩.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা আবশ্যক। মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে টাকার মূল্যমান হ্রাস পেয়েছে বিধায় ইতিপূর্বে নির্ধারিত বর্তমান বিনিয়োগ সীমা একেবারে অপ্রতুল।

১৫। সাব–কন্ট্রাকটিং ব্যবস্থা

সাব–কন্ট্রাকটিং ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ভাবে বিন্যাস করা আবশ্যক। অনেক দেশেই সাব–কন্ট্রাকটিং ব্যবস্থা শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু বাংলাদেশে এ পদ্ধতি এখনও গঠনমূলক পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। জুন ১৯৯০ পর্যন্ত মাত্র ৬০২ টি সাব–কন্ট্রাকটিং ইউনিট বিসিকের কাছে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

সরকার সম্প্রতি সাব–কন্ট্রাকটিং নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন যা সুষ্ঠুভাবে পালন করা আবশ্যক। যে সমস্ত যন্ত্রপাতি খুচরা যন্ত্রাংশ এবং ভোগ্যপণ্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে সেগুলোর আমদানী বন্ধের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পক্ষান্তরে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে শর্তসাপেক্ষে ঋণ মঞ্জুরী প্রদান করতে হবে যাতে এনসিলিয়ারী ইউনিটগুলো উপ–ঠিকাদারী ভিত্তিতে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের পাশাপাশি উক্ত শিল্পের পণ্য উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

১৬। কাঁচামাল ব্যাংক

কাঁচামাল ব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে এরূপ নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যাতে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প ইউনিটগুলো তাদের স্থানীয় বা আমদানীকৃত সকল কাঁচামাল সব সময় ন্যায্য মূল্যে পেতে পারে এবং তাদের উৎপাদন অব্যাহত রাখতে পারে। এ ধরণের ব্যাংক স্থাপনে সংশ্লিষ্ট বণিক সমিতিগুলোকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

১৭। পণ্য বাজারজাতকরণ সহযোগিতা

ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। পণ্য বাজারজাতকরণে প্রয়োজনীয় জরিপ পরিচালনা, ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প পণ্যের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রর্দশনীর ব্যবস্থা করা এবং বাজার তথ্য সংগ্রহ করে উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ প্রসংগে বিসিক ইতিমধ্যে যে কম্পিউটার পদ্ধতি চালু করছে তাকে আরো জোরদার করা যেতেপারে।

শিল্পোদ্যোক্তাদের বিদেশে তাদের পণ্যের বাজার অনুসন্ধানের জন্যে প্রেরণ করে এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদান ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে নতুন বাজার সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১৮। সরকারী ক্রয়নীতি

সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য সরকারী সংস্থাসমূহ তাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত দ্রব্য সামগ্রী যাতে দেশে উৎপাদিত ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সংগ্রহ করে তার জন্যে সুস্পষ্ট সরকারী নীতিমালা প্রণয়ন আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প ইউনিসমূহ যাতে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করে তার জন্যে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

১৯। ক্লাষ্টার এ্যাপ্রোচ

একই কাজে নিয়োজিত কারুশিল্পীদেরকে পণ্য বাজারজাতকরণসহ অন্যান্য সহায়তা যাতে সহজে প্রদান করা যায় সেই লক্ষ্যে তাদের একই স্থানে কাছাকাছি শিল্প স্থাপন করার জন্যে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

অনেক প্রচলিত ও কিছু কিছু নতুন কারুশিল্পীগণ সাধারণতঃ তাদের কাজের জন্যে একই স্থানে কেন্দ্রীভূত। ধোলাইখাল ও জিঞ্জিরার কারুশিল্পীগণ এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়াও অনেক শিল্পকর্ম যেমন—প্রকৌশল, অটোমোবাইল সার্ভিসিং, টেক্সটাইল, লেদার ক্র্যাফটস, হোসিয়ারী ইত্যাদী শিল্প কর্ম ব্যক্তি উদ্যোগে একই স্থানে কেন্দ্রীভূত অবস্থায় গড়ে উঠেছে। এ সমস্ত কেন্দ্রীভূত কারুশিল্পীদের চিহ্নিত করে স্ব–স্ব শিল্প কর্মের উন্নয়ন সাধনের জন্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে হবে।

২০। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন

ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প খাতের প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণপূর্বক দেশীয় প্রযুক্তিকে যথার্থভাবে কাজে লাগাতে হবে এবং বিদেশ থেকে উন্নততর প্রযুক্তি সংগ্রহ করে তা দেশীয় উৎপাদকদের নিকট পৌছাতে হবে যাতে করে তারা লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে তাদের উৎপাদিত পণ্যের মান ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন। বিসিক, বাংলাদেশ শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ (বি সি এস আই আর), ইনষ্টিটিউট অফ এ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজী (আইএটি), বিটাক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সংগে যৌথভাবে এ ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

২১। উদ্যোক্তা উন্নয়ন/ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ

সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে শিল্প ব্যবস্থাপনা এবং শিল্প পরিচালনা পদ্ধতির মৌলিক দিকসমূহে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে সাহায্য করতে হবে যাতে তারা যথাসম্ভব সহজে শিল্প স্থাপন করতে পারেন।

২২। শ্রমিক প্রশিক্ষণ

দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে কর্মরত শ্রমিক শ্রেণীর দক্ষতা উন্নয়ন করতঃ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। বিসিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ী ট্রেডের প্রতিনিধিদের সংগে আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ করে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী তৈরী করবে।

২৩। ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প সংক্রান্ত কর্মকান্ডের সমন্বয়

ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নকল্পে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতার উন্নয়ন প্রয়োজন। পদ্ধতিগত সহযোগিতাপূর্ণ সর্বাত্মক কর্মসূচীর জন্যে বিসিক মূখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন কার্যাবলীতে সমন্বয় সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে, এবং এ জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টায় যাতে একই ধরনের একাধিক কার্যক্রম এড়ানো যায় এবং সুযোগ চিহ্নিতকরণে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

২৪। জ্বালানী তেলের উপর ভর্তুকী

দেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে এবং অন্য যে সমস্ত স্থানে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা নেই সেখানে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প ইউনিটসমূহের জন্যে ভর্তুকী প্রদান সাপেক্ষে জ্বালানী তেল সরবরাহের ব্যবস্থা করা উচিত। উৎপাদন ব্যয় কম রাখার জন্যে ঐ সব এলাকায় বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা হয়ে গেলে জ্বালানী তেলে ভর্তুকী প্রদান করবার প্রয়োজন নেই।

২৫। নতুন উৎপাদন ক্ষমতা মঞ্জুরী

বাজারে কোন উৎপাদনের চাহিদা না থাকলে সেই ক্ষেত্রে নতুন শিল্প ইউনিট মঞ্জুরী দেয়া যাবেনা। উদাহরণস্বরূপ ফ্লোরেসেন্ট টিউব বাল্বের মঞ্জুরীকৃত ক্ষমতা এবং স্থাপিত ক্ষমতা ৫০ লক্ষ পিস্। কিন্তু সারা দেশে উক্ত উৎপাদনের চাহিদা তার অর্ধেকের মত। এ ধরণের চাহিদাতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যমান।

২৬। উদ্যোক্তাদের পরামর্শ সেবা প্রদান

ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ বিশেষতঃ গ্রামীণ শিল্পের উদ্যোক্তাদেরকে নামমাত্র মূল্যে অথবা বিনামূল্যে পরামর্শ সেবা প্রদানের (প্রকল্প প্রস্তাব তৈরী, প্রয়োজনীয় লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রভৃতি) কার্যকর ব্যবস্থা করতে হবে। জেলা পর্যায়ে বর্তমানে বিসিক কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শ সেবা অনাঙ্খাখিত দ্বৈততা সৃষ্টি করছে এবং এর

গুণগতমানেরও অভাব রয়েছে। এ ধরণের সেবা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে আঞ্চলিক পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং জেলা অফিসগুলোর মাধ্যমে তা উদ্যোক্তাদের নিকট পৌঁছে দিতে হবে। প্রয়োজনে বিসিক বাইরের উপদেষ্টাদের সহায়তা গ্রহণ করতে পারে।

২৭। বিনিয়োগোত্তর তত্ত্বধান

বিনিয়োগোত্তর উৎপাদনশীল কর্মকান্ড নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষতঃ গ্রামীণ শিল্পের ক্ষেত্রে। এ কাজ শুধুমাত্র ঋণ আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে উদ্যোক্তার কারখানা পরিচালণা সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা সমাধানে সহযোগিতার উপরও জোর দিতে হবে।

২৮। শিল্প নগরীর অগ্রাধিকার নির্ণয়

প্রাপ্ত সম্পদের আলোকে নির্মিতব্য শিল্প নগরীসমূহের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় শিল্প নগরী স্থাপনের উচ্চভিলাসী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভবপর নয়। যে সকল শিল্প নগরী তাদের অবস্থানগত কারণে এবং অর্থনৈতিক যৌক্তিকতার আলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গৃহীত হবে সেগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করার নীতি গ্রহণ করতে হবে।

বিসিক বেসরকারী খাতকে শিল্প নগরী স্থাপনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সাবেক ই পি আই ডি সি মডেলের অনুরূপভাবে বিসিক মোট খরচের ২০-২৫% প্রদান করতে পারে এবং বাকী খরচ বেসরকারী খাত বহন করতে পারে।

২৯। বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক গ্রামীণ শিল্পে অর্থ যোগান

এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সরকারী নীতি/নির্দেশনা অনুযায়ী ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করছে। বর্তমানে এ সকল ব্যাংক স্থায়ী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মোটেই অর্থ যোগান দিচ্ছে না এবং চলতি মূলধনের ক্ষেত্রে অতি সামান্য অর্থ যোগান দিচ্ছে।

মহিলা বিষয়ক সুপারিশমালা

১। অর্থ বরাদ্দ

যে সকল শিল্পে/প্রকল্পে বিনিয়োগ মহিলা উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে, অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সেগুলোকেপ্রধান্য দেয়াউচিত।

২। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়ক সেবা প্রদান

গ্রামীণ শিল্পে মহিলা উদ্যোক্তা, বিশেষ করে যে সকল মহিলা পরিবার প্রধান, তারা যাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারীভাবে প্রদত্ত সহায়ক সেবা পান তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। সংস্থাসমূহে মহিলা

বিসিক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম বোর্ডসহ অন্যান্য সংস্থার বিশেষ করে পরিকল্পনা এবং সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ডে মহিলা নিয়োগে প্রাধান্য দিতে হবে।

৪। ঋণ

নির্দিষ্ট আয় সীমার নীচে অবস্থানরত লোকদের জন্যে নির্ধারিত ঋণ (ঋণ কর্মসূচীর আনুমানিক শতকরা ১ ভাগ)-এর এক বড় অংশ মহিলাদেরকে, বিশেষ করে যারা পরিবার প্রধান, তাদেরকে দিতে হবে।

· মহিলা গ্রুপ এবং বিসিক/তাঁত বোর্ড/রেশম বোর্ড–এর সাথে যৌথ উদ্যোগে যে সকল মহিলা ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী তাদেরকে ঋণ দিয়ে সহায়তা করতে হবে। মহিলা শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচীর ব্যবস্থাপনা ও কারিগরী দক্ষতা শক্তিশালী করতে হবে।

৫। বিসিক শিল্প নগরীতে বিনিয়োগ সুবিধাবলী

মহিলা গ্রুপ প্রতিষ্ঠানকে বিসিক শিল্প নগরীতে প্লট বরাদ্দে বা অন্যান্য সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতেহবে।

৬। মহিলাদের প্রশিক্ষণ

গ্রামীণ শিল্পে মহিলাদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রচলিত খাতসমূহ যথা–সেলাই, হস্তশিল্প ইত্যাদির চেয়ে যে সকল পণ্যের চাহিদা বেশী হতে পারে যেমন, বৈদ্যুতিক মেরামত, আলপিন তৈরী, জেমসক্লিপ উৎপাদন, পোষাক শিল্পের সরঞ্জামাদি তৈরী ইত্যাদি বিষয়ে বেশী জোর দিতে হবে।

৭। কতিপয় নির্বাচিত শিল্প সম্পর্কিত সুপারিশমালা

(ক) তাঁত শিল্প

১। ঋণ ব্যবস্থাকরণ

ক্ষুদ্র তাঁত শিল্প মালিকদের মেশিন বা তাঁত পরিবর্তন এবং চলতি মূলধনের জন্য পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। ঋণ প্রশাসনের মাধ্যমে তাঁতীদের জন্যে বরাদ্দকৃত ঋণ যাতে তাঁতী বহির্ভূত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতরণ করা না হয় এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এ বিষয়ে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত এনজিও–দের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

২। যথেষ্ট পরিমাণ ও সময়মত সূতা সরবরাহ

তাঁতওয়ারী সূতা ও সূতার কাউন্ট হিসাব করে দেশের সূতার চাহিদা নিরূপণ করে দেশে উৎপাদিত সুতা ও বিদেশ থেকে আমদানীকৃত সূতার হিসাব করার প্রেক্ষাপটে দেশে সর্বদা সময়মত তাঁতীদের সুতা সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডকে দেশে সূতার চাহিদা নিরূপণ করতঃ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় পদ্ধতিগত কার্যাদি সম্পাদন করে সর্বদা তাঁতীদের পর্যাপ্ত পরিমাণ সূতা সময়মত সরবরাহ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৩। সূতা বিতরণ

সূতার বাজার প্রতিযোগিতামূলক হলে তাঁতীদের নিকট সূতা বিতরণ সুষ্ঠু হবে। বিভিন্ন প্রকার বিতরণ পদ্ধতির পাশাপাশি বাজারে চালু থাকতে পারে। প্রথমতঃ স্পীনিং মিলগুলো তাঁত সমৃদ্ধ এলাকাতে খোলা বাজারে বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে সূতা বিক্রয় করবে। দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে এ সুতা সরবরাহ ব্যবসায় যারা নিয়োজিত আছেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে তারা তা চালু রাখবেন। তৃতীয়তঃ উপরোক্ত দু'টি পদ্ধতি চালু থাকার পরও সরবরাহে কোন ঘাটতি/অসুবিধা থাকলে সরকারীভাবে তা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড অতীত ও বর্তমান পদ্ধতিসমূহের সুবিধা ও অসুবিধার নিরীখে নতুন সূতা সরবরাহ পদ্ধতি চালু করারব্যবস্থা নেবে।

৪। সূতার দাম

সূতার দাম কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বর্তমানে চালু মিলগুলোর সামঞ্জস্যকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপণ ও সম্প্রসারণ (বি এম আর ই) করে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, সরকারী খাতের

মিলগুলোর অতিরিক্ত শ্রমিক ছাটাই এবং ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। কাঁচা তুলা ও সূতার উপর আমদানী শুল্ক বিলুপ্ত করতে হবে অথবা অনেক কমিয়ে আনতে হবে। সূতার দাম কমলে কাপড়ের দাম কমবে এবং এর ফলে দেশীয় কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভারত হতে কাপড়ের চোরাচালান নিরুৎসাহিত হবে।

৫। **বিপণন**

উৎপাদিত বস্ত্রের বিপণনে সহায়তা করার জন্য ফিনিশিং সুবিধাসহ একটি কেন্দ্রীয় বিপণন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ কেন্দ্রে সরকারী সংস্থা কিংবা কোন বেসরকারী সংগঠনও হতে পারে। এর উদ্দেশ্য হবে তাঁতীদের কাছ থেকে কাপড় সংগ্রহ করে ফিনিশিং ইউনিটে তা প্রক্রিয়াজাতকরণ। অতঃপর তা রপ্তানীমুখী পোষাক শিল্প কারখানায় সরবরাহ করতে হবে। উক্ত কেন্দ্রে স্থানীয় বাজারে চাহিদা মেটানোর জন্য দেশের অভ্যন্তরে খুচরা দোকানও পরিচালনা করবে।

৬। **তাঁত প্রতিস্থাপন কর্মসূচী**

তাঁত প্রতিস্থাপন কর্মসূচী গ্রহণ করে ফ্লাইশাটল পিট তাঁতের পরিবর্তে চিত্তরঞ্জন/আধাস্বয়ংক্রিয় তাঁত বসিয়ে তাঁত শিল্পে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডকে প্রস্তাবিত এ উন্নত সংস্করণের তাঁত তাঁতীদের মাঝে সরবরাহের দায়িত্ব নিতে হবে। উক্ত বোর্ড তাঁতীদেরকে এ সকল তাঁত চালনা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ এবং তাঁত ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করবে।

৭। **শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা**

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডকে শ্রমিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে আরও শক্তিশালী করে মহিলা তাঁত শ্রমিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে তারা যাতে বুনন কর্মে নিয়োজিত হতে পারে এবং তাদের আয়ের পথ প্রশস্থ হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁত শিল্পে কর্মরত মহিলারা বর্তমানে সাধারণতঃ বুনন-পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কাজ করে থাকেন, যার ফলে বুনন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের চাইতে তাদের মজুরী বহুলাংশে কম হয়ে থাকে।

(খ) যান্ত্রিক ও ধাতব শিল্প

১। **সাব-কন্ট্রাকটিং**

সাব-কন্ট্রাকটিং পদ্ধতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক-উভয় পর্যায়ে উন্নততর করতে হবে। উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণ সাব-কন্ট্রাকটিং ব্যবস্থার সাফল্যজনক সম্প্রসারণের পূর্বশর্ত। সুতরাং পন্যের মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তন করতে হবে। কর ছাড়, কর হ্রাস এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাব-কন্ট্রাকটিং ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২। **প্রযুক্তি উন্নয়ন**

লাগসই প্রযুক্তি চিহ্নিতকরণ ও হস্তান্তর এবং গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন করতে হবে। একটি জাতীয় প্রযুক্তি নীতি এবং এর পাশাপাশি একটি কার্যকর বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক। প্রযুক্তি সংগ্রহ, স্থানান্তর ও প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্যে বুয়েট, বিটাক, বি সি এস আই আর, বি এস টি আই এবং বিসিক প্রভৃতি সংস্থাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক কার্যকর সহযোগিতা আবশ্যক।

৩। সংরক্ষণ

ট্যারিফ ও বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। দক্ষতা উন্নয়ন

শিল্পোদ্যোক্তাদের সাথে পরামর্শক্রমে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়নের মাধ্যমে শ্রমিক ও কারিগরদের দক্ষতা উন্নয়ন করতে হবে।

৫। পরামর্শ সহায়তা

একযোগে উপযুক্ত প্রযুক্তিক, আর্থিক ও বিপণন সহায়তা প্রদানে সক্ষম এমন পরামর্শ সহায়তা সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে এবং উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে হবে।

(গ) ধাতব শিল্প

১। বি এস টি আই আইন

নিম্নমানের পণ্য বাজারজাতকারী শিল্প ইউনিটসমূহে বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউশন আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

২। পণ্যের মূল্য নির্ধারণ

যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রে যথাযথ মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বিসিকের সাব–কন্ট্রাকটিং সেল কর্তৃক এ দায়িত্ব পালিত হওয়া উচিত।

৩। আমদানীর উপর বিধি–নিষেধ আরোপ

ফার্নেস ও ধাতব শিল্পের অন্যান্য যে সকল যন্ত্রপাতি স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত হয়, ঐ সকল সামগ্রীর আমদানী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধ করতে হবে।

(ঘ) হোসিয়ারী শিল্প

১। শিল্প নগরী

যত শীঘ্র সম্ভব চলতি হোসিয়ারী শিল্প নগরী প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হবে। শিল্প নগরীটির নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করা দরকার।

২। উপদেষ্টা পরিষদ

হোসিয়ারী পণ্য সামগ্রীর উন্নয়ন ও রফতানী জোরদার করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রফতানী উন্নয়ন ব্যুরো, বিসিক, বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আমদানী–রফতানী নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ হোসিয়ারী এসোসিয়েশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সমন্বয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ষ্ট্যান্ডিং উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা যেতে পারে।

৩। বিনিয়োগ পরবর্তী পরামর্শ কোষ

উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ পরবর্তী পরামর্শ, প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সম্প্রসারণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বস্ত্র দপ্তর ও বিসিকের আওতায় স্বতন্ত্র পরামর্শ কোষ গঠন করা যেতে পারে।

(ঙ) পাদুকা শিল্প

১। **বিনিয়োগ তহবিল মঞ্জুরী**

ঋণ তহবিলের দ্রুত বিতরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা যাতে 'ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস,-এর আওতায় স্বল্পতম সময়ে সম্পন্ন হতে পারে তজ্জন্য সহায়ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বিত কর্মসূচী থাকা বাঞ্চনীয়।

২। **প্রযুক্তি স্থানান্তর ত্বরান্বিতকরণ**

প্রযুক্তি স্থানান্তর প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে বিদেশী দক্ষ কারিগরদের ৫ বছর পর্যন্ত কাজ করার অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

৩। **ব্যয় হ্রাসের জন্য উৎসাহ/সুবিধা প্রদান**

এ খাতের প্রতি উদ্যোক্তাদেরকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ১০০% রফতানীমুখী ইউনিটগুলোকে অবচয় (ডেপ্রিসিয়েশন) ও মূলধনী ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎসাহ/সুবিধাদি প্রদান করা যেতে পারে।

ছোবড়া শিল্প

১। **কাঁচামাল সরবরাহ**

নারকেলের ছোবড়া সরবরাহ বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যা নিম্নোক্তভাবে করা যেতে পারেঃ

(ক) জনগণকে নারকেল ছোবড়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করে ও একই সাথে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ডাব বিক্রির পরিমাণ কমিয়ে এনে;

(খ) উচ্চ ফলনশীল নারকেল চাষের মাধ্যমে; এবং

(গ) বর্ধিত এলাকায় নারকেলের চাষ করে।

২। **প্যাকেজ কর্মসূচী**

এ খাতের জন্যে উৎপাদ উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন, দেশে-বিদেশে বাজার উন্নয়ন প্রভৃতি কর্মকান্ডের জন্যে একটি প্যাকেজ কর্মসূচী হাতে নেয়া যেতে পারে।

উৎপাদ উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় থাকবে নয়া উৎপাদ চিহ্নিতকরণ এবং বিদ্যমান উৎপাদনের মানোন্নয়ন। বাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রদর্শনীর আয়োজন এবং বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কারুশিল্পীদেরকে প্রশিক্ষণের জন্যে ভারত ও অন্যান্য দেশে প্রেরণ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে বিসিক উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এবং বাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর সাথে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও জোরদার করতে পারে।

৩। **প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উন্নয়ন**

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের 'গ্রামীণ শিল্প উন্নয়ন সমীক্ষার' আলোকে একটি 'নারকেল গবেষণা ও উন্নয়ন' কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে।

(ছ) রেশম শিল্প

১। **অর্থায়ণ**

দরিদ্র রেশম চাষীদেরকে রেশম আহরণ খামার স্থাপন ও তজ্জন্য সরঞ্জামাদি সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন। তাছাড়া বাংলাদেশ রেশম বোর্ড ও রেশম সরবরাহকারী ব্যবসায়ীদেরকে রেশম গুটি ক্রয় করার জন্য, রেশম কারখানাগুলোকে চলতি মূলধন হিসেবে ব্যবহার করার জন্য, বাংলাদেশ

রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটে রেশম আহরণ খামার স্থাপন এবং রাজশাহী রেশম কারখানা ও ঠাকুরগাঁওয়ে রেশম কারখানার বি এম আর ই-র জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

২। **যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ**

প্রয়োজনীয় ক্ষমতাসম্পন্ন গুটি শুকাবার ড্রায়ার সংগ্রহ এবং সেগুলো নার্সারী, কারখানা ও অন্যান্য সম্প্রসারণ এলাকায় সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটে বিদ্যুৎ সরবরাহ নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে সেখানে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন (এইচ টি) ট্রান্সফরমার স্থাপন করা যেতে পারে।

৩। **তুঁত গাছ রোপণ ও সেচের ব্যবস্থাকরণ**

বাংলাদেশ রেশম বোর্ড তুঁত রোপণ কর্মসূচীর আওতায় উচ্চ ফলনশীল তুঁত গাছ রোপণ ও তজ্জন্য জল সেচের ব্যবস্থাকরতেপারে।

৪। **বিপণন**

দেশে-বিদেশে শিল্পজাত পণ্যের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করতে হবে। স্থানীয় পণ্যের গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশী-বিদেশী বাজারে সেগুলোর উপযোগিতা সৃষ্টি করতে হবে।

৫। **প্রকল্প বাস্তবায়ন**

রেশম বস্ত্রের নকশা ও মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা ও নকশা সংক্রান্ত প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬। **প্রশিক্ষণ**

রেশম উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে রেশম শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য উপযুক্ত বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। **তুঁত চাষের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা জোরদারকরণ**

তুঁত চাষের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন-বন বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, উপজেলা পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করতে হবে।

৮। **বি আর ডি বি, উপজেলা পরিষদ ও এন জি ও-দের অংশ গ্রহণ**

রেশম শিল্পের উন্নয়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ ও বিভিন্ন এন জি ও-দেরকে অংশ গ্রহণে আগ্রহী করে তুলতে হবে।

(জ) **উদ্ভাবনা ও সম্ভাবনাময় শিল্প**

উদ্ভাবনা ও সম্ভাবনা শিল্পসমূহ চিহ্নিত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করে সেগুলোর উন্নয়ন ঘটাতে হবে। কৃত্রিম ফুল, ফোলানো খেলনা, পোষাক শিল্পের উপকরণাদি প্রস্তুতকরণ এ জাতীয় শিল্প হিসেবে গণ্য হতে পারে।

টাস্ক ফোর্স ঃ নগরায়নের সামাজিক প্রভাব

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	অধ্যাপক নজরুল ইসলাম	ভূগোল বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আহ্বায়ক
২।	জনাব এ,সি, দাস	পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৩।	অধ্যাপক মীর শহিদুল ইসলাম	উন্নয়ন ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	ঐ
৪।	জনাব এ, এইচ, এন, এ, চৌধুরী	যুগ্ম–সচিব, পূর্ত মন্ত্রণালয়	ঐ
৫।	জনাব জাকির হোসেন	টাউন প্লানার, রাজউক	ঐ
৬।	অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী	অর্থনীতি বিভাগ জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	ঐ
৭।	মিসেস রিতা আফসার	বি, আই, ডি, এস	ঐ
৮।	জনাব আবদুল কাদের	যুগ্ম–প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন	ঐ
৯।	জনাব কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী	প্রকৌশল উপদেষ্টা, এল, জি, ই, বি,	ঐ
১০।	জনাব এস, এ, এন, এম, ওয়াহেদ	প্রধান প্রকৌশলী, ওয়াসা	ঐ
১১।	জনাব রবিউল হোসেন	সভাপতি, শহিদুল্লাহ্ এন্ড এসোসিয়েটস্ লিঃ	ঐ
১২।	ডঃ মুনতাসির মামুন	সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ঐ
১৩।	সৈয়দা রওশন কাদির	এন, আই, এল, জি	ঐ
১৪।	মিসেস হোমায়রা ইসলাম	প্রকল্প পরিচালক মানবিক সাহায্য সংস্থা	ঐ
১৫।	জনাব ওয়ালিউল ইসলাম	কমিশনার, ঢাকা বিভাগ।	ঐ

(৭) বাংলাদেশের নগরায়ণ ধারার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নগরায়ণের আঞ্চলিক/বিভাগ অথবা পুরাতন জেলা ভিত্তিক নগরায়ণ মাত্রার বৈষম্যমূলক হার। নগরায়ণ মাত্রার দিক থেকে রাজশাহী বিভাগ অন্যান্য তিন বিভাগের তুলনায় বেশ পশ্চাদপদ। পুরাতন জেলার ভিত্তিতে ঢাকা জেলা সবচেয়ে বেশী নগরায়িত (৩৮%, ১৯৮১)। অন্যদিকে রাজশাহী বিভাগের বগুড়া জিলা ছিল সবচেয়ে কম নগরায়িত (৭.৬%, ১৯৮১)।

(৮) বাংলাদেশের মোট নগর জনসংখ্যার এক বড় অংশই (৪৫%, ১৯৮১)। মাত্র চারটি মহানগরীতে পুঞ্জীভূত হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে একমাত্র ঢাকা মহানগরীতেই মোট নগর জনসংখ্যার প্রায় ২৫ ভাগ। এই তুলনামূলক পরিস্থিতির আরো অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ঢাকা মহানগরীর বা বৃহত্তর ঢাকার জনসংখ্যার নগরায়ণ আরো বিসদৃশভাবে বেড়ে যেতে পারে।

(৯) বাংলাদেশে গ্রাম ও শহর এলাকার মধ্যে ভৌত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান গড়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, নগর এলাকায় মাথাপিছু আয় গ্রাম এলাকার প্রায় দ্বিগুণ। অবশ্য জীবনযাত্রার ব্যয়ের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো পরিস্থিতি বিরাজ করতে দেখা যায়।

(১০) বাংলাদেশে শহর এলাকার ভিতরে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য বিদ্যমান। বিশেষ করে ঢাকা ও অন্যান্য মহানগরে এ বৈষম্যের মাত্রা তীব্রতর। ক্রমশই এ বৈষম্যের মাত্রা বাড়ছে। অতি দ্রুত একটি ক্ষুদ্র বিত্তবান শ্রেণীর হাতে ভূমির মালিকানাসহ বিভিন্ন সম্পদ বিসদৃশ্যভাবে কুক্ষীগত হচ্ছে এবং এ শ্রেণী অতিশয় ধনিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে নগর এলাকায় দারিদ্র্য বাড়ছে, দারিদ্রদের সংখ্যা বাড়ছে এবং দরিদ্র এলাকার পরিবেশগত ও অন্যান্য পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে।

(১১) বাংলাদেশের নগরায়ণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নগর এলাকায় দারিদ্রের প্রকোপ। সর্বসাম্প্রতিক অনুমানের ভিত্তিতে দেখা যায় নগর জনসংখ্যার প্রায় ৫৬ ভাগই দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থান করে। এই মাত্রা যদি ৫০ শতাংশও ধরা হয় তাহলেও নগর দরিদ্রদের সংখ্যা বর্তমানে ১১ মিলিয়নের বেশী। ২০০০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১৭ মিলিয়নে এবং ২০১০ সালে প্রায় ২৩ মিলিয়নে। উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া না হলে এই সংখ্যা আরো স্ফীত হবে বলেই ধারণা করা যায়।

(১২) এই প্রকার গণ-দারিদ্র্যের সহযোগী বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের নগর-পরিবেশকে চিহ্নিত করে। নগর জনসংখ্যার মধ্যে, বিশেষতঃ নিম্নবিত্তদের মাঝে, বেকারত্ব কম, কিন্তু আধা-বেকারত্ব অত্যন্ত প্রকট। দরিদ্রদের মধ্যে অধিকাংশই তাদের উপার্জনের দ্বারা খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করতে ব্যর্থ। কর্মসংস্থান হয় বেশীর ভাগই অপ্রাতিষ্ঠানিক (ইনফরমাল) খাতে। এক বিপুল জনগোষ্ঠীর আশ্রয় বলতে রয়েছে অতিশয় অস্বাস্থ্যকর বস্তি বা বাস্তুহারা এলাকার ঘর। এসব এলাকার ভৌত পরিবেশ রীতিমত সংকটজনক। পয়ঃ ব্যবস্থা, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদির পরিস্থিতিও খারাপ। স্বাস্থ্য পরিবেশ খুবই আশংকাজনক। এমনকি বাংলাদেশের গ্রামের তুলনায় শহরের বস্তি এলাকায় শিশুমৃত্যুহার অনেক বেশী। বিভিন্নরকম রোগ-ব্যাধির প্রকোপও বেশী। শিক্ষা ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি অত্যন্ত হতাশাজনক। গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহর এলাকায় নিরক্ষর জনসংখ্যার বৃদ্ধিহার বেশী, এমনকি সামগ্রিকভাবেও নিরক্ষরতার মাত্রা বেশ উঁচু। নগর এলাকায় পরিবহন ও চলাচলের পরিস্থিতি সংকটজনক। দুর্ঘটনার সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। শহরের পরিবেশ দুষণের মাত্রাও বাড়ছে। নগর এলাকায় নানারকম সামাজিক সমস্যাও বাড়ছে।

(১৩) নগরাঞ্চলে ভৌত ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের অনুন্নয়ন বা অবক্ষয়ের জন্য কোন কোন মহলে দরিদ্র গ্রামবাসীদের শহর-মুখী স্থানান্তরকে দায়ী করা হলেও, মূল কারণ অবশ্য উন্নয়ন সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় নীতিমালা। বিগত চারদশকে গৃহীত নীতিমালা ও কর্মকান্ডে গ্রাম কিংবা শহর কোন এলাকাতেই দারিদ্র্য দূরীকরণ বা সংকোচন সম্ভব হয় নাই। বরং উত্তরোত্তর আঞ্চলিক ও সামাজিক বৈষম্য বেড়েছে।

সরকারের কোন কোন নীতিমালার ঘোষিত উদ্দেশ্য মোটামুটি গণমূখী হলেও বাস্তবায়নের সময় অনেক গড়মিল দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই নীতিমালা রীতিমত গণ-বিরোধী বা দরিদ্র-বিরোধী।

(১৪) শহর এলাকায় ব্যাপক দারিদ্র্য বিরাজমান থাকা সত্বেও শহরে দারিদ্র্য-নিরসন প্রকল্প নেয়া হয় নাই বা ব্যাপকভাবে বৈষম্য-সংকোচন নীতিও গ্রহণ করা হয় নাই। ফলে পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে, বৈষম্যআরোবেড়েছে।

(১৫) নীতিমালার গণ-বিরোধী চরিত্র ছাড়াও নগরায়ণ সমস্যা তীব্র আকার ধারণের পেছনে রয়েছে নাগরিক বা পৌর সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার চরম ব্যর্থতা, পরিকল্পনাবিদদের অভাব ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নেরনানাবিধসমস্যা।

(খ) নগরায়ণ ও নগর উন্নয়ন ষ্ট্রাটেজি

বাংলাদেশে নগরায়ণের সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতি এবং বর্তমান পরিস্থিতি একটি সংকটজনক নাগরিক ভবিষ্যতের ঈঙ্গিত দেয়। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নগরায়ণ একটি শক্তিশালী উপাদান, কিন্তু এক্ষেত্রে নগরায়ণ হওয়া উচিত সঠিক খাতে, সুষ্ঠুধারায়। এজন্যে নগরায়ণ সম্পর্কিত সর্বজন সম্মত নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই নীতিমালার মৌল বিবেচ্য হবেঃ

(ক) দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং স্ব-নির্ভরতা ও স্ব-মর্যাদা বৃদ্ধি,

(খ) আঞ্চলিক, গ্রাম-শহরভিত্তিক, আন্তনগর এবং অন্তনগর ভৌত ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য সংকোচন ও দূরীকরণ,

(গ) গ্রাম ও নগর পর্যায়ে দারিদ্র্য নিরসন, যাতে করে দেশের সকল নাগরিক মানবিক পরিবেশে জীবন-যাপন করতে পারে।

উপরোক্ত লক্ষ্য বিবেচনায় বর্তমান টাস্ক ফোর্স নিম্নবর্ণিত চারটি ষ্টাটেজি উপস্থাপন করছেঃ

(১) জাতীয় ভিত্তিক নগর-ব্যবস্থা উন্নয়ন ষ্টাটেজি

(২) নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা ষ্টাটেজি

(৩) নগরীয় দারিদ্র্য নিরসন ষ্টাটেজি

(৪) ঢাকা মহানগর ষ্টাটেজি

(১) জাতীয় ভিত্তিক নগর ব্যবস্থা উন্নয়ন ষ্ট্রাটেজি

এতে বাংলাদেশের বর্তমান নগরায়ণ বৃদ্ধি হারকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে বা নিকট ভবিষ্যতেও বাড়তে থাকবে, সে পরিপ্রেক্ষিতে নগরায়ণ ছাড়া এদেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করা দুস্কর। অবশ্য এই নগরায়ণ ধারায় মহানগরসমূহের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার শ্লথ করবার প্রয়োজনীতা স্বীকার করতে হবে। বিশেষ করে মহানগরী ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার কমানো প্রয়োজনহবে।

এই ষ্টাটেজি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে আঞ্চলিক মহানগর বা "রিজিওনাল গ্রোথপোল" সৃষ্টির ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে রাজশাহী বিভাগে এক বা একাধিক আঞ্চলিক মহানগর গড়ে তুলবার প্রয়োজন হবে। সামগ্রিকভাবে এই বিভাগের নগরায়ণ মাত্রা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য বিশেষ ব্যবস্থায় শিল্পায়ন করা আবশ্যক। রাজশাহী বিভাগের দ্রুত উন্নয়নের খাতিরে যমুনা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এই ষ্ট্রাটেজির আরেকটি বিশেষ দিক হচ্ছে মাঝারী পর্যায়ের শহরসমূহের (সেকেন্ডারী সিটিজ/ইন্টারমিডিয়েট সিটিজ) দ্রুত উন্নয়ন ও বৃদ্ধি। অর্থাৎ পুরাতন জেলা সদর এবং অন্যান্য মাঝারী শহরে শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতির দ্রুত প্রসারের ব্যবস্থা করে উৎপাদনশীল ও আকর্ষণীয় করে তোলা।

বর্তমান নতুন জেলা শহর ও অন্যান্য ছোট শহর গুলোকেও একইভাবে উৎপাদনমুখী ও আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলে।

নূতন উপজেলা কেন্দ্রগুলোকে আশপাশের গ্রামাঞ্চলের জন্যে একাধারে বাজার ও সেবা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা।

গ্রামীণ হাট-বাজারগুলোকে জাতীয় নগর-ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

গ্রামাঞ্চল, গ্রামীণ হাট-বাজার, উপজেলা শহর, ছোট শহর, মাঝারী শহর, আঞ্চলিক/বিভাগীয় মহানগর ও রাজধানী মহানগর এ ব্যাপক জাতীয় নগর তথা গ্রামীণ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও পরিপূরক সম্পর্কের মধ্যে আনার জন্যে এসবের মধ্যে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য। বস্তুতঃ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই গ্রাম-শহর স্থানান্তর প্রক্রিয়ার স্থায়ী ব্যবস্থার পরিবর্তে আবর্তনশীল করে তুলতে সাহায্য করবে। কমিউটিং ব্যবস্থা আরো জনপ্রিয় করতে সাহায্য করবে। এতে গ্রামাঞ্চল আর্থ-সামাজিক অর্থে নগরায়িত হতে পারবে।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

জাতীয় ভিত্তিক নগর ব্যবস্থা মূলতঃ বৃহত্তর মানব বসত ব্যবস্থার (হিউম্যান সেটেলমেন্ট সিস্টেম) অংশ। ভূমি-স্বল্প বাংলাদেশে ভূমির ব্যবহার হওয়া উচিত অত্যন্ত পরিকল্পিত। গ্রাম ও নগর উভয় এলাকার ভূমির জন্যেই একথা প্রযোজ্য। উপরোক্ত ষ্ট্রাটেজি বাস্তবায়নের জন্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন ও অগ্রগতি পরিলক্ষণের জন্যে একটি সংস্থা থাকা আবশ্যক। এই সংস্থাকে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা পরিষদ বা ন্যাশনাল ফিজিকাল প্লানিং কাউন্সিল (এনপিপিসি) নামে অভিহিত করা যায়।

বর্তমানে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এই পরিষদের প্রশাসনিক সংগঠন হিসাবে কাজ করবে। গ্রামীণ ভূমি ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধায়নের জন্য স্থানীয় সরকারের অধীনস্থ বর্তমান স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো দায়িত্ববান থাকতে পারে। নগর বিশেষের পরিকল্পনা ও উন্নয়নের দায়িত্ব মূলতঃ নগরের নির্বাচিত সংস্থার উপরই ন্যস্ত থাকবে। তবে তারা এনপিপিসির সাহায্য সহযোগীতা পাবেন। উপজেলা ভূমি ব্যবহারের পরিকল্প নার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা বহাল থাকবে।

(২) নগর পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা ষ্ট্র্যাটেজি

নগর বিশেষের ভৌত, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্যে এ ষ্ট্রাটেজি সুপারিশ করা হয়েছে। এর মৌল উদ্দেশ্য নগরের পরিকল্পিত উন্নয়ন, যাতে এর ভৌত পরিবেশ সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়। নগরে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য হ্রাস পায়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। সকল পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে গণ-প্রতিনিধি তথা সাধারণ নাগরিকদের মতামত ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

প্রাসঙ্গিত নানা বিষয়ক সুপারিশ এই ষ্ট্রাটেজিতে সন্নিবেসিত হয়েছে। এসবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

(ক) প্রতিটি শহর ও নগরের জন্যে (ভৌত ও আর্থ-সামাজিক) উন্নয়ন পরিকল্পনা (মহা-পরিকল্পনা) গ্রহণ। এ ধরণের পরিকল্পনায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসিক এলাকা চিহ্নিত করা আবশ্যক,

(খ) পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা,

(গ) নগর উন্নয়ন ভূমি ব্যবহার বিধি প্রণয়ন/পরিমার্জন,

(ঘ) নগরীয় ভূমি ব্যবহার ও গৃহায়ন নীতিমালা প্রণয়ন, এতে ভূমি মালিকানা, ভূমি স্বত্ব, গৃহস্বত্ব ইত্যাদি নির্ধারণ,

(ঙ) গৃহায়ন ক্ষেত্রে সরকারী, বেসরকারী ও অন্যান্য খাতের বিশেষতঃ এনজিওদের ভূমিকা চিহ্নিতকরণ,

(চ) নগরীয় পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাজধানী শহরে রিকশার ভূমিকা চিহ্নিত করা,

(ছ) নগর পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক জনশক্তির বৃদ্ধি ও উন্নয়ন,

(জ) প্রতিটি বড় শহরে পরিকল্পনা বিভাগ ও নগর দরিদ্র বা বস্তি-উন্নয়ন বিভাগ স্থাপন, এবং

(ঝ) নগর সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা জোরদার করা।

(৩) নগরীয় দারিদ্র্য দূরীকরণ ষ্ট্র্যাটেজি

বাংলাদেশের নগর জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত। অথচ নগরীয় দারিদ্র্য নিরসনমূলক ইতিপূর্বে কোন নীতিমালা বা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নাই। নগর দরিদ্রদের অধিকাংশই সাম্প্রতিক গ্রাম-শহর স্থানান্তরকারী। অর্থাৎ স্থানান্তর প্রক্রিয়া নগরায়ন প্রক্রিয়ার এক মূল শক্তি। বর্তমান টাস্ক ফোর্স এ প্রক্রিয়ার বিরোধী নয়। বরং প্রক্রিয়াটি বাস্তবসম্মত বিবেচনা করে এর দ্বারা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার ষ্ট্রাটেজি সুপারিশ করে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকা মহানগরীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার স্থিতিশীল বা কমানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে গ্রামত্যাগী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গন্তব্য হতে হবে আঞ্চলিক নগর, মাঝারী শহর ও উপজেলা শহর। সে সব শহরেও দারিদ্র্য সমস্যা অত্যন্ত তীব্র, সুতরাং সেখানে দারিদ্র্য দূরীকরণ বা দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়ন করা আবশ্যক।

নগরীয় দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রক্রিয়াগত মৌল দিকগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

(ক) নগর-দরিদ্রদেরকে নগরের অবিচ্ছেদ্য ও প্রয়োজনীয় অংশ বিবেচনা করা। সুতরাং আশ্রয়সহ সকল প্রকার মৌলিক চাহিদার ক্ষেত্রে তাদের যথাযথ প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হতে হবে।

(খ) প্রতিটি সিটি করপোরেশন ও পৌরসভায় দারিদ্র্য নিরসন বা বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচী ও বিশেষ বিভাগ থাকতে হবে।

(গ) নগরায়ণ ও নগর উন্নয়ন নীতিমালায় নগরীয় দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রম একটি উল্লেখযোগ্য স্থান পাবে।

(ঘ) দরিদ্রদের কর্মসংস্থান ও আয়-বৃদ্ধি এ জাতীয় দারিদ্র নিরসন কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় উপাদান হবে।

(ঙ) দারিদ্র্য নিরসন এবং বস্তি উন্নয়নসহ অন্যান্য নগর-উন্নয়ন কার্যক্রমেও নগর-দরিদ্রদের অংশগ্রহণের সুযোগ ও খরচ বহনের দায়িত্ব থাকবে।

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্যে বিভিন্ন ধরণের কৌশল গ্রহণ প্রয়োজন হবে। এসব কৌশলের মধ্যে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক বা বিশেষ ব্যবস্থার খাত থেকে মূলধন ঋণ। প্রসঙ্গতঃ গ্রামীণ ব্যাংকের অনুরূপ ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রচলনের সুপারিশ করা হয়েছে।

শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে কর্মজীবী শিশুদের জন্য 'ইউসেপ' মডেলের শিক্ষা পাঠক্রম ব্যাপকভাবে বাড়ানো যেতে পারে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় সহ উচ্চতর শিক্ষায়তনের ছাত্র–ছাত্রীদের ভূমিকার কথা বিবেচনা করা যায়।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা ও ভ্রাম্যমান চিকিৎসা ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে।

বস্তি এলাকার ভৌত পরিবেশ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার সাহায্য ও এনজিওদের অংশগ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। গৃহসংস্থানে গ্রামীণ ব্যাংক মডেলের গৃহায়ন ঋণ বিবেচনা করা হয়েছে।

দরিদ্রদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্যে রাজনৈতিক ও আর্থ–সামাজিক সংস্থাসমূহের ভূমিকার করা উল্লেখ করা হয়েছে।

(৪) রাজধানী শহর ঢাকার জন্যে স্ট্রাটেজি

বর্তমানে ঢাকার (অর্থাৎ ঢাকা ষ্টটিস্টিকাল মেট্রোপলিটান এরিয়া, ১৬০ বর্গমাইল) জনসংখ্যা আনুমানিক ৭ মিলিয়ন। বর্তমান ধারায় চললে, ২০০০ সালে একই এলাকা বিশিষ্ট ঢাকার লোকসংখ্যা হবে সম্ভবতঃ ৯ মিলিয়ন, ২০১৫ সালে ১৫–২০ মিলিয়ন। রাজউকের ৬০০ বর্গমাইল এলাকায় ২০১৫ সালে লোকসংখ্যা হবে ২০–১৫ মিলিয়ন।

টাস্কফোর্স মনে করে, ঢাকার ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা এ ধরণের আয়তনের মধ্যেই সীমিত রাখার চেষ্টা করতে হবে। এটা সম্ভব হবে একমাত্র যখন পূর্বোল্লিখিত নগর ব্যবস্থা ষ্ট্রাটেজি বাস্তবায়ন করা যায়, অর্থাৎ নগরায়ণ বিকেন্দ্রীভূতভাবে গড়ে তোলা যায়। কিন্তু উপরোক্ত ঢাকা ষ্ট্যাটেজিতেও (অর্থাৎ DSMA এলাকায় ২০০০ সালে ৯ মিলিয়ন এবং ২০১৫ সালে ১৫–২০ মিলিয়ন জনসংখ্যা ধরে) নিম্নলিখিত পদক্ষেপ প্রয়োজন হবে ঃ

(ক) বর্তমান ঢাকা সিটি করপোরেশন এলাকায় নতুন কোন বড় শিল্প কারখানা স্থাপনের অনুমতি না দেয়া।

(খ) রাজউক এলাকার মধ্যে অবস্থিত বর্তমান উপ–শহর (যেমন সাভার, জয়দেবপুর, ইত্যাদি) সমূহের অধিকহারে বৃদ্ধি এবং নতুন কিছু উপ–শহর স্থাপন করা।

(গ) কেন্দ্রীয় শহর, বর্তমান ও প্রস্তাবিত উপ–শহর এবং আশপাশের গ্রামীণ এলাকার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। প্রসঙ্গতঃ ঢাকা বিষয়ক ১৯৮১ সনের এডিবি/ইউএনডিপি/পরিকল্পনা কমিশনের জন্য সম্পাদিত ঢাকা মেট্রোপলিটান এরিয়া ইন্টেগ্রেটেড আর্বান ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের সুপারিশসমূহের আলোকে নতুন চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। ১৯৮৮ সনের বন্যার পরে তড়িঘড়িভাবে নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করতে হবে এবং এই বাঁধ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করা হলে রাজধানীর ভূমি ব্যবস্থার পরিকল্পনা সেই অনুযায়ী হতে হবে।

উপরোক্ত সকল কারণেই রাজধানী ঢাকার জন্য জরুরী ভিত্তিকে একটি নতুন মহাপরিকল্পনা অথবা ষ্ট্রাকচার প্ল্যান প্রণয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

নগর পরিকল্পনার অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে ২ নং ষ্ট্রাটেজির সুপারিশসমূহ ঢাকা মহানগরের ক্ষেত্রেও সাধারণভাবে প্রযোজ্য।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

ঢাকা মহানগরের জন্য দুইটি বিকল্প প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা উপস্থাপন করা হয়েছে। এর প্রথমটিতে রয়েছে বর্তমান ব্যবস্থার উন্নয়ন। দ্বিতীয় ব্যবস্থায় রয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন বিকল্প ব্যবস্থা।

প্রথম মডেলেঃ রাজউককে ঢাকা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে (DMDA) উন্নীত করা হবে, এছাড়া থাকবে ঢাকা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অথরিটি (DMPA), যা মূলতঃ বর্তমান নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (UDD) এর রূপান্তর হবে। ঢাকা সিটি করপোরেশন বর্তমান ভূমিকা পালন করবে।

বিকল্প মডেলেঃ তৈরী হবে ঢাকা মেট্রোপলিটান এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (DMADC) এটির চরিত্র গণতান্ত্রিক সংস্থার এবং সদস্যরা সবাই হবেন নির্বাচিত। এর প্রধান একজন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা বিশিষ্ট হবেন। (DMADC) মহানগরের "ষ্ট্রাকচার প্ল্যান" প্রণয়ন করবেন অন্যদিকে এর এলাকা অন্তর্ভূক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য পৌরসভাসমূহের দায়িত্ব হবে নিজ নিজ এলাকার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। টাস্ক ফোর্স নীতিগতভাবে বিকল্প মডেলটি সুপারিশ করে।

টাস্কফোর্সঃ বিকেন্দ্রীকরণ

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	ডঃ এ, এম, এম, শওকত আলী	যুগ্ম–সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।	আহবায়ক
২।	জনাব সাফিউর রহমান	সদস্য, ডাইরেক্টিং স্টাফ, পি, এ, টি, সি।	সদস্য
৩।	জনাব এম, ফয়জুল্লাহ	অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৪।	অধ্যাপক লূৎফুল হক চৌধুরী	লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য
৫।	ডঃ আবদুল হাই মন্ডল	বি, আই, ডি, এস,	সদস্য
৬।	জনাব এম, ফজলুর রহমান	মহাপরিচালক, রাষ্ট্রপতিরসচিবালয়।	সদস্য

বিকেন্দ্রীকরণ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপদেষ্টা অধ্যাপক রেহমান সোবহান বাংলাদেশের প্রশাসন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত যে সকল টাস্কফোর্স গঠন করেছিলেন তার মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত বিষয়টি অন্যতম। এই অনুবেদন সম্পর্কে ২রা জানুয়ারী ১৯৯১ ইং তারিখের টাস্ক ফোর্সের আহবায়ক ও অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে অধ্যাপক রেহমান সোবহান যে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন তা হলোঃ

(ক) বিকেন্দ্রীকরণের আওতায় পরিকল্পনা, উন্নয়ন, প্রশাসন ও ব্যয় খাতে কাঠামো কি হতে পারে? যদি স্থানীয় পর্যায়ে এ সকল দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিশ্চিত করা যায় তা' হলে কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে কিনা?

(খ) স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির দ্বারা বিভিন্ন পর্যায়ে পরিচালিত পরিষদসমূহের চাহিদার আলোকে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কিভাবে জবাবদিহীমূলক এবং দায়িত্বশীল করা যায়? স্থানীয় সরকার কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকুরী কাঠামো করা সম্ভব কিনা যা' রাজনৈতিকভাবে নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের কাছে সহজে এবং সহজভাবে প্রতিক্রিয়াশীল;

(গ) এককেন্দ্রীক রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কি নীতিমালার আলোক স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনা ও উন্নয়নের চাহিদা মোতাবেক সম্পদ বরাদ্দ করা যায় তা' নিরূপণ করা;

(ঘ) গ্রাম সরকার বা পল্লী পরিষদকে পুনঃজীবিত করার প্রয়োজন আছে কিনা;

(ঙ) উপরে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের সমাধানের জন্য কি ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক এবং নীতি পুনঃর্বিন্যাসের প্রয়োজন তা' নিরূপণ করা।

(২) বিকেন্দ্রীকরণের উপর প্রণীত অনুবেদনটি সাতটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার ধারণা ও বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে উপজেলা পরিষদের আলোকে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয়াংশে উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কাজ সম্পাদনের যোগ্যতা নিরূপণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। চতুর্থাংশে জেলা, ইউনিয়ন এবং পল্লী পরিষদের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পঞ্চমাংশে স্থানীয় সরকার বহির্ভূত অন্যান্য ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের কথা আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠাংশে সামগ্রিকভাবে বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত নীতি পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তমাংশে সমাপনী মন্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

(৩) লোক প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণ একটি বহুল আলোচিত বিষয়। বিকেন্দ্রীকরণ বলতে মূলতঃ জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জনবিষয়ক কার্যাদি সম্পাদন করাকে বোঝান হয়ে থাকে। এই ধরণের সংজ্ঞা সাধারণভাবে ভৌগলিক পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ সীমাবদ্ধ রাখে। কেন্দ্র থেকে অন্য কোন পরিধিতে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে দায়িত্ব পালনের বিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতা অর্পণ করার বিষয়ে এই সংজ্ঞায় কোন উল্লেখ নেই, যেমন কোন আধা-সরকারী, স্বশাসিত বা সরকারী বিভাগকে ক্ষমতা অর্পণ করা। লোক প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ দিকটি সম্পর্কে যে সকল পন্ডিত ব্যক্তিগণ তাঁদের ধ্যান ধারণা ব্যক্ত করেছেন তাঁরা একটি বিষয়ে সবাই একমত যে কেন্দ্রীকরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া অপরিবর্তনশীল নয় বরং এটি একটি পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া। পন্ডিত ব্যক্তিগণ এ ধারণা পোষণ করেন যে, সম্পূর্ণরূপে বিকেন্দ্রীভূত সরকারী কাঠামোর কথা চিন্তা করা যায় না বরং কেন্দ্রীকরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া যুগপৎভাবে চলতে পারে।

(৪) উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা বলা যায় যে, বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় মূলতঃ দু'টি উদ্দেশ্য থাকে। এক, প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনা। দুই, রাজনৈতিক। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের মূল লক্ষ্য হলো

পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করা। অপরদিকে প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারী কর্মচারীদের যথোপযুক্ত ক্ষমতা দেয়া, যাতে করে বিভিন্ন বিষয়ে হঠাৎ করে উদ্ভুত সমস্যা ত্বরিৎগতিতে সমাধান করা যায়। তবে একথা সত্য যে বাস্তবে রাজনৈতিক লক্ষ্যের সাথে প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যের ব্যবধান অত্যন্ত সুক্ষ। বিকেন্দ্রীকরণের ভাবাদর্শ মূলতঃ আত্মনির্ভরতা, গণতান্ত্রিক পন্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যাপকভাবে জনগণের অংশগ্রহণ এবং সাধারণ নাগরিকদের নিকট সরকারী কর্মচারীদের জবাবদিহির ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। উন্নয়নশীল দেশসমূহে ক্ষমতা হস্তান্তর, বিকেন্দ্রীকরণের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে না। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং এর বাস্তবায়ন দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ারই প্রতিফলন মাত্র।

(৫) বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার ইতিহাস প্রায় একশত বছরের পুরানো। এ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন। ১৯৮২ সালে সামরিক সরকার ক্ষমতা দখলের পর যে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি গঠন করেন তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে সারা দেশের উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এর পাঁচটি বিশেষ দিক প্রণিধানযোগ্য। এক, প্রায় একশত বছরের পুরানো প্রশাসনিক স্তর যথা মহকুমা পদ্ধতির বিলুপ্তি। দুই, থানাসমূহকে উন্নীকরণের মাধ্যমে ঐ পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়নমূলক প্রশাসনের প্রবর্তন। তিন, নতুন কোন জেলা পরিষদ সৃষ্টি না করেই পুরাতন মহকুমাগুলোকে জেলায় রূপান্তর চার, পুরানো থানা পরিষদের মৌলিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস-না করে উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যানের নিকট ন্যস্ত করা। পাঁচ, উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণ সরাসরি উপজেলা চেয়ারম্যানের নিকট ন্যস্ত করা।

(৬) এই বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা নিয়োগ। বিচারের সাথে সম্পর্কিত কর্মকর্তা এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে উপজেলা চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত রাখা।

(৭) রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যায় যে উপজেলা সৃষ্টির ফলে জেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের মাঝে নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব জন্ম নেয়। এই রাজনৈতিক নেতাগণ মূলতঃ কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সংযুক্ত। অপরদিকে সরাসরি নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান এবং গণভোটে নির্বাচিত জাতীয় সংসদের সদস্যদের মধ্যে কিছুটা সংঘাত সৃষ্টি হয়। এই সংঘাত এড়ানোর জন্য এরশাদ সরকার পরবর্তী পর্যায়ে জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণভার নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের উপর ন্যস্ত করেন।

(৮) প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপজেলা পদ্ধতির প্রবর্তন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সহজতর করলেও সরকারী কর্মকর্তা এবং উপজেলা চেয়ারম্যানের মধ্যে মতবিরোধিতা এবং অন্তর্নিহিত সংঘাত এড়ানো সম্ভব হয় নাই। বিকেন্দ্রীভূত বিচার ব্যবস্থা অনেকের মতে ফলপ্রসু হয়নি, কেননা এক, ত্বরিৎগতিতে সকল উপজেলা বিচারক নিয়োগ করার ফলে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ এবং অভিজ্ঞ বিচারক নিয়োগ করা সম্ভব হয় নাই। দুই, ফৌজদারী বিচার কার্যের উপর উপজেলা চেয়ারম্যানের সরাসরি নিয়ন্ত্রণের লিখিত বিধান না থাকলেও বাস্তবে এই নিয়ন্ত্রণ বলবৎ ছিল তার কিছু কিছু ম্যাজিষ্ট্রেট (সহকারী কমিশনার) একই সাথে উপজেলার অর্থ ও পরিকল্পনার দায়িত্ব পালন করতেন। উপজেলা পর্যায়ে বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনেকেই সোচ্চার। এ ছাড়াও এই ব্যবস্থার ফলে উপজেলা পর্যায়ের মামলা রুজু করার প্রবণতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৯) উপজেলা পর্যায়ে নিয়োজিত সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ চেয়ারম্যানের হাতে দেওয়ার ফলে দ্বৈত শাসনের প্রবর্তন হয়েছে বলেও অনেকে মনে করেন। এই দ্বৈত শাসন বর্তমান পর্যায়ে এড়ানো মুশকিল। সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় সরকার চাকুরী কাঠামো প্রবর্তনের মার্ধমে এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব তবে এটা অত্যন্ত ব্যবহুল যা' উপজেলার নিজস্ব সম্পদ থেকে এ পর্যায়ে যোগান দেয়া সম্ভব নয়। এছাড়া শুধুমাত্র উপজেলা পর্যায়ের চাকুরী কাঠামোতে পদোন্নতির সম্ভাবনা সীমিত বা সাধারণভাবে আকর্ষণীয় নয়।

(১০) উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের পূর্ণ ক্ষমতা উপজেলাকে দেয়া হয়েছে তবে এ সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন কিছু রূপরেখা জারী করেছেন। উন্নয়ন কর্মকান্ডের সম্পূর্ণ ক্ষমতা উপজেলাকে দেয়ার ফলে অনেকেই মনে করেন যে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এ ছাড়া এই পদ্ধতিতে প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ কতটা নিশ্চিত করা হয়েছে তা অনুসন্ধানের দাবী রাখে।

(১১) উপজেলা একটা স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান তবুও উপজেলা সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত নয়। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দু'ভাবে ভাগ করা যায়। এক, আইনগত নিয়ন্ত্রণ। দুই, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ। আইনগত নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে দূর করা সঙ্গত নয়, তবে এটা আরও বিকেন্দ্রীকরণ করা যেতে পারে। আইনগত নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি প্রধানতঃ জবাবদিহিত্বের সাথে সম্পৃর্কযুক্ত। প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ যতটা কম থাকে ততই মঙ্গল।

(১২) জবাবদিহিকরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য তিনটি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। এক, উপজেলার কর্মকান্ডের সকল বিষয়সমূহ জনগণের নিকট তুলে ধরা এবং উপজেলার হিসাব সম্পর্কিত তথ্যাদি দেখা এবং সে সম্পর্কে মন্তব্য রাখার অধিকার নিশ্চিত করা। দুই, একটি বিকেন্দ্রীভূত হিসাব নিরীক্ষণ পদ্ধতির প্রবর্তন করা। তিন, স্থানীয় সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ ত্বরিৎগতিতে নিষ্পত্তির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

(১৩) স্থানীয় সরকার সম্বন্ধে সুদূরপ্রসারী রূপরেখা থাকা বাঞ্ছনীয়। তা না হলে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে স্থানীয় সরকার ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নিজস্ব হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই রূপরেখা ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের ৫৯ থেকে ৬০ অনুচ্ছেদে বিধৃত আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সাংবিধানিক বিধানসমূহ ১৯৭৫ সালে প্রণীত ২ নং আইনের দ্বারা বিলুপ্ত করা হয়। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যত নির্বাচিত সরকার এবং গণ প্রতিনিধিরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

(১৪) সংবিধানের উপরোক্ত বিধান মতে অন্যান্য কাজের সাথে আইন শৃঙ্খলার কাজও স্থানীয় সরকারের উপর ন্যস্ত করার কথা। ইউনিয়ন পর্যায়ে চৌকিদারী পদ্ধতির মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা অপরাধ দমনের পদ্ধতি মৃত প্রায়। এই পদ্ধতিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। বর্তমানে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত গ্রামরক্ষী বাহিনী সম্পূর্ণভাবে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত করা যায়। এ ছাড়া ছোটখাট ফৌজদারী এবং দেওয়ানী মামলা নিষ্পত্তির জন্য গ্রাম পর্যায়ে গ্রামীণ আদালতের ব্যবস্থা করা আছে। এই আদালতগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

(১৫) স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং সম্পদ আহরণের বিষয়ে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কিছু সমীক্ষামূলক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছে। যে সমস্ত সুপারিশ এই পরিকল্পনা দলিলে করা হয়েছে সেগুলি বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট রূপরেখা দেয়া হয়নি। এই সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়নের জন্য অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারী উন্নয়ন তহবিল দিয়ে যে সমস্ত অবকাঠামো তৈরী করা হয়। সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। এ সম্বন্ধেও বিশেষভাবে নীতি প্রণয়ন আবশ্যক।

(১৬) উপজেলার প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধির দুটি দিক আছে। এক, স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি। দুই, স্থানীয় সরকারে কর্মরত কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। প্রথমতঃ দিকটি সম্পর্কে বলা যায় যে, যে সমস্ত সমীক্ষা অদ্যবধি করা হয়েছে তার সব ক'টিতেই স্থানীয় সম্পদ আহরণের করুণ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায়ও একই কথা বলা হয়েছে।

(১৭) জেলা পর্যায়ে সম্পদ আহরণের খাত মূলতঃ এগারটি। এর মধ্যে হাট বাজার ইজারা খাতটি সবচেয়ে বেশী সম্পদ আহরণ করতে সক্ষম। সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হাট বাজার অথবা জলমহাল থেকে যে সম্পদ আহরিত হয়ে থাকে তা সম্ভাব্য আহরণযোগ্য সম্পদের তুলনায় অনেক কম। আহরণযোগ্য সম্পদ সম্পূর্ণভাবে আহরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তি ও পদ্ধতিগত পরিবর্তনের প্রয়োজন। এ ছাড়া কিছু নতুন খাতের কথা চিন্তা করা যেতে পারে যথাঃ ভূমি কর এবং অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর।

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

(১৮) এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, উপজেলা চেয়ারম্যান এবং জাতীয় সংসদের সদস্যদের মধ্যে সংঘাতের প্রেক্ষিতে ১৯৮৮ সালের জুন মাসে এরশাদ সরকার একটি জেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন করেন। এই আইনের বলে সরকার যে কোন ব্যক্তিকে পরিষদের চেয়াম্যান হিসাবে নিযুক্ত করতে পারেন। পরিষদে প্রতিনিধিত্বমূলক সদস্য, মনোনীত সদস্য, মহিলা সদস্য এবং সরকারী সদস্য থাকবে। পরিষদের বাধ্যতামূলক কার্যাবলীর মধ্যে মূলতঃ তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক, জেলা পর্যায়ে সমস্ত উন্নয়নমূলক কার্যাবলী পর্যালোচনা। দুই, উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন সকল উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা যার মধ্যে হিসাব পর্যালোচনাও অন্তর্ভুক্ত। তিন, যে সব রাস্তা সরকার বা অন্য স্থানীয় পরিষদের অন্তর্ভুক্ত নয় তা নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা। ঐচ্ছিক কার্যাবলীর মধ্যে প্রায় সমস্ত কার্যই অন্তর্ভুক্ত আছে।

(১৯) জেলা পরিষদের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনার জন্য চারটি মূল প্রশ্ন করা যায়। এক, ৬৪টি জেলা পরিষদের প্রয়োজন আছে কিনা? দুই, এই পরিষদগুলো কি অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভর হবে? তিন, সংসদ সদস্যরা কি সরাসরি জেলা পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত হবে? চার, জেলা পরিষদগুলি কি উপজেলা পরিষদের হিসাব এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ড পর্যালোচনা করবে? উল্লেখ্য যে এই প্রণীত হওয়ার সময় সারাদেশে বৃহত্তর জেলায় ২২টি জেলা পরিষদ ছিল। এর মধ্যে তিনটি জেলা পরিষদ যা পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত তার অবস্থা ভিন্নতর।

(২০) জেলা পরিষদের আয়–ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সাধারণভাবে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী এবং আয়ের শতকরা ৩৬ ভাগ সরকারী অনুদান থেকে আসে। ২২টি জেলা পরিষদের স্থলে ৬৪টি জেলা পরিষদ করলে জেলা পরিষদ প্রতি সম্পদের পরিমাণ আরও কমবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা পরিষদ ব্যতীত ১৯টি জেলা পরিষদকে আঞ্চলিক পরিকল্পনা অথরিটি হিসাবে রূপান্তর করা যায় এবং এই অথরিটির কার্যাবলী শুধুমাত্র পরিকল্পনা, মনিটরিং এবং মূল্যায়নের মধ্যে সীমিত থাকবে। অথরিটির কার্যাবলী প্রধানতঃ তিনটি হতে পারে। এক, আন্তঃ উপজেলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ। দুই, জাতীয় পর্যায়ে প্রণীত প্রকল্প সমূহের পরিকল্পনা, মনিটরিং এবং মূল্যায়নজনিত যাবতীয় তথ্য ও অন্যান্য সাহায্যদান। তিন, উপজেলাকে পরিকল্পনা প্রণয়নেসোহায্যদান।

(২১) উপরোক্ত প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন এবং আঞ্চলিক পরিকল্পনা অথরিটির পারস্পরিক সমন্বয়ের কথা এসে যায়। টাস্কফোর্স মনে করে এই সম্পর্কের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা দেওয়ার সময় এখনও আসেনি। প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিকল্পনা অথরিটি স্থানীয় পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ এবং এটা সঠিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করলে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন সম্ভব। এই প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত মন্ত্রণালয় এবং বিধিবদ্ধ সংস্থা থেকে কর্মচারী, কর্মকর্তাদের স্থানান্তর করা যেতে পারে।

(২২) সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারা দেশে ৪৪০৩ টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে। প্রতিটি ইউনিয়নে একজন চেয়ারম্যন ও নয় জন সদস্য সরাসরি গণভোটে নির্বাচিত হন এবং তিনজন মহিলা সদস্য মনোনীত হয়ে থাকেন। সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের মোট ৩৮টি কার্যাবলী নির্দিষ্ট করা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য পুলিশের ক্ষমতা এবং কার্যাবলীও সংশ্লিষ্ট আইনে দেয়া আছে। ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব সম্পদ আহরণের মোট পাঁচটি খাত আছে। এক, ইউনিয়ন রেইট বা বসতবাড়ীর বার্ষিক মূল্যের উপর আরোপিত কর। দুই, চৌকিদারী কর। তিন, জন্ম, বিবাহ এবং আপ্যায়নের উপর নির্ধারিত কর। চার, জনহিতকর কার্য সম্পাদনের জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক ইউনিয়নবাসীর উপর আরোপিত কর। পাঁচ, জনসাধারণকে বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের জন্যে আরোপিত কর।

(২৩) বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এক এবং দুই বাদে অন্যান্য খাতের কর আদায়তো দুরের কথা কর নির্ধারিতও হয় না। এমনকি এক এবং দুই ক্রমিকের কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পালিত না হওয়ার মূল কারণ রাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তির অভাব।

(২৪) ইউনিয়ন পরিষদ নির্ধারিত করের শতকরা ২৫ ভাগ আদায় করতে না পারলে প্রতিষ্ঠিত বিধান অনুযায়ী সরকারী অনুদান থেকে বঞ্চিত হতো। কিন্তু এ বিধান কখনও সম্ভবত রাজনৈতিক দলের সরকার প্রয়োগ করেনি। এ সম্বন্ধে আশু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

(২৫) অন্যান্য নতুন খাত সম্বন্ধে তিনটি খাতের কথা বিবেচনা করা যায়। এক, জাতীয়তা সনদপত্র প্রদান দুই, উত্তরাধিকার সনদ প্রদান। তিন, পরিষদের নির্বাচনের আমানতের টাকা বৃদ্ধি। প্রথম দুইটি কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে যার জন্য সনদ প্রতি ৩০ থেকে ৫০ টাকা আদায় করা হয় যা কখনই ইউনিয়ন পরিষদ ফান্ডে জমা দেয়া হয়না। তিন নম্বরের খাতটি বৃদ্ধি করা যায় এবং বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের টাকা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হতে পারে।

(২৬) গ্রাম সরকার/পল্লী পরিষদ একটি বহুল বিতর্কিত বিষয়। উনিশত আশি দশকের প্রথম দিকে আইনের মাধ্যমে গ্রাম সরকারের সৃষ্ঠি হয়। এই সরকার গঠনের পর এই পদ্ধতি তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। সমালোচনার মূল ভিত্তি ছিল দুটি। এক, গ্রাম সরকার রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।দুই, এই পদ্ধতির সাথে নির্ধারিত এবং প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদের সংঘাত শুরু হয়। ১৯৮৯ সালের জুন মাসে পল্লী পরিষদ আইন করা হয়। এই আইনের মধ্যেমে প্রতিটি গ্রামে একজন প্রধান এবং আটজন সদস্য নিয়ে পল্লী পরিষদ গঠন করার উদ্যোগ নেয়া হয়। টাস্কফোর্সের মতে সংশ্লিষ্ট আইনে পরিষদ গঠনের এবং কার্যাবলীর যে রূপরেখা দেয়া হয় তা বাস্তব সম্মত নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে পরিষদের তহবিলের সুত্র হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদ, কোন ব্যক্তি বা কোন সমবায় সমিতি, অন্য কোন প্রতিষ্ঠান অথবা কোন উৎপাদনমুখী প্রকল্পের আয় থেকে সম্পদ আহরণ করতে পারে।

(২৭) এ সমস্ত সুত্র থেকে আয় আসার কোন সম্ভাবনা নেই যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া নিস্প্রয়োজন। ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক অবস্থা করুন।সমবার সমিতিগুলোরও একই অবস্থা। গ্রাম পর্যায়ে অন্য কোন সংস্থা যে অর্থ প্রদান করতে পারবে তা চিন্তা করা বাস্তবমুখী নয়। কোন ব্যক্তি বিশেষ যে অর্থ দেবে তা দিয়ে খুব বড় একটা কিছু করা যাবে বলে মনে হয়না। যে কোন ধরনের উৎপাদনমুখী প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান ছাড়া এই ধরণের কোন প্রকল্প বাস্তাবায়ণ সম্ভব হবে না।

(২৮) তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে গ্রাম পর্যায়ে সংগঠনের প্রয়োজন আছে। টাস্কফোর্সের মতে গ্রাম পর্যায়ে সংগঠনটি ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সমন্বিত। দুই, সংগঠনটি নিজে থেকেই সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

(২৯) শুরুতেই বলা হয়েছে যে স্থানীয় সরকার ছাড়াও আরও অনেক ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া চালু করা যেতে পারে। স্থানীয় সারকারের ক্ষেত্রে টাস্কফোর্সের আলোচনা এবং বিশ্লেষণ মূলতঃ গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের মধ্যে সীমিত। পৌর সভা বা পৌর কর্পোরেশন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়নি। পৌর কর্পোরেশন অথবা পৌরসভা সম্বন্ধে আলাদাভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে এবং এ অনুসন্ধান বিকেন্দ্রীকরণ নীতিমালার আলোকে করতে হবে।

(৩০) প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ সম্বন্ধেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া দরকার কারণ গত নয় বছরে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া দারুণভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল। এই সম্বন্ধে বিগত আমলের সম্পর্কে দুটি কমিটি গঠন করেছিলেন। একটি ১৯৮৬ সালে এবং অপরটি ১৯৮৭ সালে। এ ছাড়া লোকবাস উন্নতির জন্যে মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায় দেশী/বিদেশী বিশেষজ্ঞ সমন্বিত একটি দলের মাধ্যমে উক্ত সমীক্ষা চূড়ান্ত করা হয়। এই সমস্ত প্রতিবেদন এবং সমীক্ষার উপাদান নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে মচূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

(৩১) বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া এবং সমবায়ও বিকেন্দীকরণ প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ দিক। বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে তবে এ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে সে দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে।

(৩২) বিকেন্দ্রীকরণের অন্যান্য মাধ্যমের মধ্যে সব সরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাইন্ডেশন অন্যতম।

(৩৩) বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে টাস্কফোর্সের সুচিন্তিত সুপারিশসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

(ক) স্থানীয় সরকারঃ

উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে দুই স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করা যেতে পারে। বর্তমানে বৃহত্তর জেলায় অবস্থিত ১৯টি জেলা পরিষদগুলোকে আঞ্চলিক পরিরল্পনা অথরিটি হিসাবে রূপান্তর করা যেতে পারে। এ অথরিটির কাজ হবে উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করা এবং সময়মত প্রকল্প বাসবায়নের অগ্রগতি মনিটারিং ও মূল্যায়ন করা। গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গ্রাম ভিত্তিক করা যেতে পারে তবে এটা এমনভাবে করতে হবে যাতে করে প্রতিটি ওয়ার্ড গ্রাম ভিত্তিক হয়। এটা করলে ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান সদস্য সংখ্যা বাড়বে এবং তাতে উন্নয়ন কাজে জনসাধারণের অংশগ্রহণ বাড়বে। এ সম্বন্ধে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর চিত্র সংশোধনীতে দেখনো হলো। উপরোক্ত সুপারিশ নীতিগতভাবে গ্রহণযোগ্য হলে প্রতিটি স্তরের কাঠামো এবং কার্যাবলী পরবর্তী পর্যায়ে নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

(খ) উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধিঃ

প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধির দুটি দিক আছে। এক, স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি। দুই, স্থানীয় সরকারে কর্মরত কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের কৌশল সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। উপজেলা পর্যায়ে সম্পদ আহরণের মূল ১১টি খাতের মধ্যে হাট বাজার বা জলমহাল থেকে যে সম্পদ আহরিত হয় তা' সম্ভাব্য আহরণযোগ্য সম্পদের তুলনায় অনেক কম। এটা নিশ্চিত করতে হলে রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি ও পদ্ধতিগত পরিবর্তনের প্রয়োজন। এ ছাড়া কিছু নতুন খাতের কথা চিন্তা করা যেতে পারে, যেমন ভূমি কর এবং অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর।

(গ) ন্যুনতম কর আদায়ের পদ্ধতিঃ

এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে পূর্বে কোন ইউনিয়ন পরিষদ আরোপিত করের শতকরা ২৫ ভাগ আদায় করতে না পারলে সরকারী অনুদান থেকে বঞ্চিত হতো। সরকারী অনুদান পাওযার যোগ্যতার এ পূর্বশর্ত কখনই সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের জন্য এখন থেকে এটা কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং ধাপে ধাপে এ ন্যুনতম মাত্রার হার বাড়াতে হবে।

(ঘ) পরিকল্পনা ও উন্নয়নঃ

স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা এবং উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্যে স্থানীয় সরকারের প্রতিটি পর্যায়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করার বিধি পুনরায় চালু করতে হবে। স্থানীয় সরকারের প্রতিটি পর্যায়ের সম্পদের তালিকার ভিত্তিতে এ পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করতে হবে। এ সম্বন্ধে আঞ্চলিক পরিকল্পনা অথরিটি উদ্যোগ নেবে এবং এ তালিকায় সর্বশেষ তথ্য সন্নিবেশ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) স্থানীয় সরকারের চাকুরীর কাঠামোঃ

এ ধরনের চাকুরী কাঠামো জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রবর্তন করা আছে তবে এগুলো প্রতিটি স্তরের জন্য আলাদা বিধায় এই চাকুরী কাঠামোতে পদন্নতির সুযোগ অত্যন্ত সীমিত যা অনাকর্ষনীয়। এ কাঠামোগুলোকে পুনর্বিন্যাস করে আকর্ষনীয় করতে হবে।

(চ) ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থাঃ

বর্তমানে প্রচলিত বাজেট প্রণয়ন ও দাখিলের পদ্ধতি অপরিবর্তিত রেখে উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে সরকারের নিকট বাজেট দাখিল না করে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট দাখিল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

বর্তমানে জনগণের কাছ থেকে বার্ষিক হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে আপত্তি উত্থাপনের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা যথেষ্ট নয় বিধায় নিয়মিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রচারের মাধ্যমে এ সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করতে হবে। এ ধরণের প্রচার হিসাব দাখিল করার একমাস আগে বিশেষভাবে জোরদার করতে হবে। মূল অনুবেদনের ২·৪৬ এবং ২·৪৭ অনুচ্ছেদ দুটি সাময়িকভাবে বলবৎ করা যেতে পাবে। বর্তমানে অনাস্থা প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হবার বিধানটি তুলে নেয়া যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের নির্বাহী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বহুলাংশে কমিয়ে আনতে হবে।

(ছ) **জবাবদিহিকরণ প্রক্রিয়াঃ**

জবাবদিহিকরণ নিশ্চিত করার জন্যে তিন ধরণের পদক্ষেপ প্রয়োজন মাফিক, স্থানীয় সরকার পর্যায়ে প্রশাসনিক এবং উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে হবে এবং এই স্বচ্ছতা আনতে হলে জনসারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। দুই, একটি বিকেন্দ্রীভুত নিরীক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। তিন, স্থানীয় সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এ সম্বন্ধে মূল অনুবেদনের অনুচ্ছেদ ২·৫২ এবং ২·৫৫ এর বিশ্লেষণের আলোকে ২·৫৬ অনুচ্ছেদে যে সুপারিশ রাখা হয়েছে তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

(জ) **পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণঃ**

টাস্কফোর্স মনে করে যে, স্থানীয় সরকার পর্যায়ে পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মধ্যেমে জনগণের অংশগ্রহণ অনেকাংশে নিশ্চিত করা যেতে পারে কারণ যে সম্পদ তালিকার উপর ভিত্তি করে এই পরিকল্পনা প্রণায়ন করা হবে সে তালিকা জনগণের কাছ থেকেই নিতে হবে। দুই, আঞ্চলিক পরিকল্পনা অথরিটি পর্যায়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি নির্বাচিত সংসদ সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা যেতে পারে। প্রয়োজনবোধে এই কমিটি সংশ্লিষ্ট গ্রামের অধিবাসীদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগযোগ স্থাপন করতে পারে। তিন, গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠিত হলে এই কমিটি পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করতে পারে।

(ঝ) **স্থানীয় সরকারের সাথে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সম্পর্কঃ**

সকল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সংসদ সদস্যদের সরাসরি প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। সংসদ সদস্যদের কাজ হবে বাইরে থেকে অনানুষ্ঠানিকভাবে পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে আঞ্চলিক পর্যায়ে উপদেষ্টা কমিটির মধ্যে থেকে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করা।

(ঞ) **উপজেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে উপজেলা পরিষদের সম্পর্কঃ**

প্রাথমিক পর্যায়ে এই সম্পর্ক সন্তোষজনক না হলেও এই সম্পর্ক বর্তমান পর্যায়ে অনেকটা স্থিতিশীল। তবে উপজেলা পর্যায়ে বিচার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করার জন্য অনেকেই সোচ্চার। উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আদালতগুলো নতুন জেলায় স্থানান্তর করা যেতে পারে। যে সমস্ত অবকাঠামো উপজেলা পর্যায়ে সম্পন্ন করা হয়েছে সেগুলোর বিকল্প ব্যবহারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৩৪) **প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণঃ**

যে সমস্ত সরকারী কমিটির অনুবেদন এবং অন্যান্য সমীক্ষা ইতিমধ্যেই প্রণীত হয়েছে সে সমস্ত সমীক্ষা এবং অনুবেদনের আলোকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি চালু করতে হবে। বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে সাবধানবানী উচ্চারণ করা হয়েছে তার আলোকে বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া জোরদার করা যেতে পারে।

(৩৫) **পৌরসভা/পৌর কর্পোরেশনঃ**

পৌরসভা এবং পৌর কর্পোরেশন সম্বন্ধে আলাদাভাবে অনুসন্ধান করে তার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

Co-ordinated Programme of Action Linking Village, Union & Upazila

1. Organizational Structure:

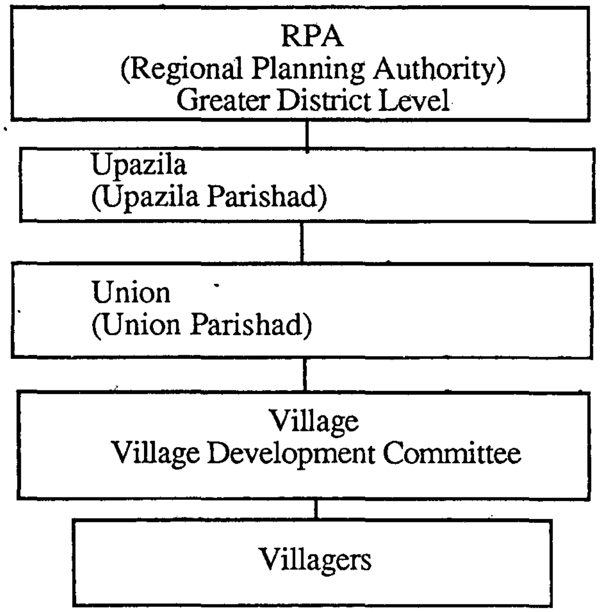

2. Village Development Committee:

Chairman and 11 Members:

Representatives of Farmers	..	3
Representatives of Youth	..	2
Representatives of Women	..	2
Representatives of Agriculture Labour	..	2
Representatives of other Professional Groups	..	2
	Total :	11

3. Sector:

1. Public Health
2. Tree Plantation
3. Agriculture/Irrigation
4. Sports/Culture
5. Education
6. Family Planning
7. Cottage Industries
8. Birth Control
9. Pisciculture
10. Livestock
11. Cooperatives/Loan
12. Growth Centres
13. Electrification
14. Feeder Roads

4. Coordination:

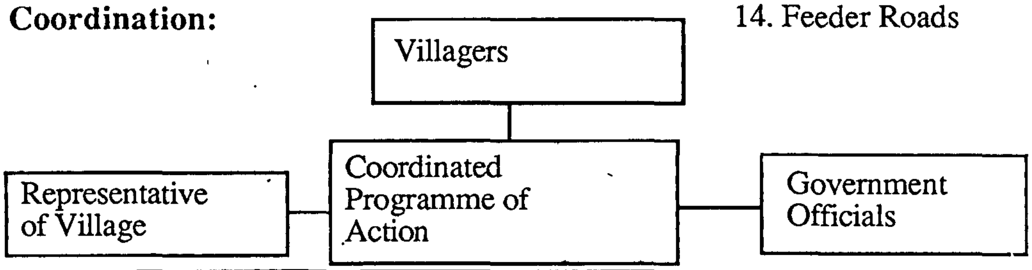

SOURCE : Badiur Rahman, Asian Affairs, Vol XI, No. 11April-June, 1989, with some addition made by the Task Force

টাস্ক ফোর্স ঃ শক্তি সেক্টর উন্নয়ন

ক্রমিক নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	ডঃ নজরুল ইসলাম	প্রাক্তন সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন	আহবায়ক
২।	অধ্যাপক এম, নুরুল ইসলাম	ইনষ্টিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩।	জনাব শামসুল ইসলাম	চেয়ারম্যান, পর্যটন কর্পোরেশন	ঐ
৪।	জনাব কামরুল আলম	সদস্য, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড,	ঐ
৫।	জনাব মনজুর আহমেদ	জেনারেল ম্যানেজার, পদ্মা তৈল কোং লিঃ	
৬।	জনাব মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ	বিভাগীয় প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন	ঐ
৭।	ডঃ মোঃ আহসান	সি· এস· ও· ডাইরেক্টর, ট্রেনিং ডিভিশন, বি· এ·ই·সি·	ঐ
৮।	ব্রিগেডিয়ার এম· গোলাম মাওলা	চেয়ারম্যান, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	ঐ
৯।	ডঃ এ·কে·এম মাসুদ	যুগ্ম–প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন	ঐ
১০।	ডঃ মাহবুবুল হক	বিভাগীয় প্রকৌশলী, টি· এন্ড· টি· বোর্ড	ঐ
১১।	জনাব এল মতিন	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা	ঐ
১২।	জনাব এম ফজলুল হক	চেয়ারম্যান, পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	ঐ

শক্তি সেক্টর উন্নয়ন

১.০ সূচনাঃ

১.১ উদ্দেশ্যঃ–দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উত্তরণের ক্রান্তি লগ্নে যত শীঘ্র সম্ভব সরকার কি উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করতে পারে তা চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন আছে বলে অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভিতরে ও বাইরে যে সকল বিশেষজ্ঞ উন্নয়ন সমস্যা নিয়ে গবেষণা বা চিন্তা–ভাবনা করেছেন তাঁদের সকলের মেধা ও অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন তৈরী করে আগামী নির্বাচিত সরকার এবং জন প্রতিনিধিদের বিবেচনার জন্য পেশ করার লক্ষ্যে ডিসেম্বর ১৯৯০ 'এ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর ২৯ টি টাস্ক ফোর্স গঠন করে। সরকার কর্তৃক গঠিত ২৯টি টাস্ক ফোর্সের মধ্যে এনার্জি টাস্ক ফোর্স অন্যতম।

১.২ টাস্ক ফোর্সের টার্মস অব রেফারেন্স (TOR)ঃ–নিম্নলিখিত নীতিমালা ও নির্দেশাবলীর আলোকে ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এনার্জি টাস্কের উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্য্যালোচনা করতে বলা হয়ঃ

–সেবাপ্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন।

–ক্রমাগত অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে, স্বাবলম্বী হওয়া।

–অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হার ধারাবাহিকভাবে ৭–৮ শতাংশ অর্জনের চেষ্টা।

–মহিলাদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।

উপরোক্ত নির্দেশাবলী অনুযায়ী এনার্জি টাস্ক ফোর্স নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেঃ

(ক) দরিদ্রদের সেবা প্রদান–জীবনধারণের উদ্দেশ্যে (রান্না ও আলোর জন্য ব্যবহৃত) জ্বালানী সরবরাহ এবং উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে (যথা–কৃষি, শিল্প প্রভৃতিতে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা) জ্বালানী নিশ্চয়তা;

(খ) অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়া–উৎপাদন, বহুমুখীকরণ, প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং অর্থায়নসহ জ্বালানী খাতে স্বাবলম্বী হওয়া যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে জ্বালানী আমদানী যথাসম্ভব হ্রাস করা;

(গ) এনার্জি খাতের উন্নয়ন কর্মসূচী দেশে এমন অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবে যাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৭–৮ শতাংশ অর্জন করা সম্ভব হয়।

(ঘ) মহিলাদের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সম্পৃক্ত করা–প্রত্যেক উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের উপর যে সকল অনুকূল ও বিরূপ প্রভাব পড়ছে তা পরীক্ষা করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের মেধা ও শ্রম যথাসম্ভব ব্যবহার করা।

১.৩ পদ্ধতি/প্রণালী (Methodology)ঃ–পাঁচ সপ্তাহের সময়সীমায় এই প্রতিবেদন প্রণয়নে এনার্জি টাস্ক ফোর্স নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করেঃ–

–খসড়া চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্য্যালোচনা।

–এনার্জি সেক্টরের বিভিন্ন সংস্থা প্রদত্ত প্রতিবেদনের পর্য্যালোচনা।

–বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের উপর টাস্ক ফোর্স সদস্যদের মুক্ত আলোচনা।

–রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা মহোদয়দের সংগে আলোচনা।

–অন্যান্য টাস্ক ফোর্স সদস্যদের সাথে আলোচনা।

২.০ বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোঃ–বাণিজ্যিক জ্বালানী পরিকল্পনার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বায়োমাস জ্বালানী পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নে সন্নিবেশিত হলোঃ

২.১ বাণিজ্যিক জ্বালানী পরিকল্পনাঃ–পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (শিল্প ও শক্তি), বাণিজ্যিক জ্বালানী সম্পদের এবং গ্রামীণ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানীর পরিকল্পনা ও উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের এনার্জি সেক্টরের অধীনে ৪ (চার) টি উইং রয়েছে। উইংগুলো হলো–(১) বিদ্যুৎ (২) তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ (৩) গ্রামীণ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী এবং (৪) এনার্জি মডেলিং এন্ড ইকনমিকস উইং। প্রত্যেক উইং– এর দায়িত্বে একজন যুগ্ম–প্রধান নিয়োজিত আছেন। শিল্প ও শক্তি বিভাগের পরিকল্পনা প্রণয়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন একজন প্রধান।

২.২ বায়োমাস জ্বালানী পরিকল্পনাঃ–পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি ও গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান বিভাগ বায়োমাস এনার্জির পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত।

২.৩ জ্বালানী উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনাঃ–জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এনার্জি খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পিট কয়লা ইত্যাদি জ্বালানী সম্পদ উন্নয়নে এর ব্যবস্থাপনা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত মানব সম্পদ উন্নয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যে সকল সংস্থা নিয়োজিত আছে, সেগুলো হলোঃ বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনষ্টিটিউট ও এনার্জি মনিটরিং ইউনিট। উপরোল্লেখিত মন্ত্রণালয়–এর আওতাধীন সে সকল সংস্থা বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের কাজে নিয়োজিত আছে সেগুলো হলো বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বি পি ডি বি), পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আর ই বি), ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ অথরিটি (ডেসা) এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (পারমাণুবিক বিদ্যুৎ কার্য্যক্রম)। বায়োমাস জ্বালানী যে সকল কৃষি সম্পদ থেকে সংগ্রহ করা হয় সে সকল কৃষি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব কৃষি মন্ত্রণালয়ের। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বন বিভাগ সরকারী মালিকানাধীন সকল প্রকার বন ও বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে; এবং মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়–এর আওতাধীন পশু সম্পদ পরিদপ্তর দেশের সকল প্রকার পশু সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত।

৩.০ জ্বালানী সম্পদ ঃ

৩.১ ধারণা এবং সংজ্ঞাঃ–জ্বালানী সম্পদ সম্পৃক্ত বিভিন্ন উপাত্ত সঠিক পরিসংখ্যানগত ধারণা ও সংজ্ঞা যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এ ব্যাপারে মূল প্রতিবেদনে বিভিন্ন জ্বালানী সম্পদের মজুদ 'এর সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তারই আলোকে দেশীয় জ্বালানী সম্পদের একটি তুলনামূলক চিত্র পেশ করা হয়েছে।

৩.২ কয়লা সম্পদঃ–বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের তিনটি স্থানে কয়লা সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে জামালগঞ্জের কয়লা সম্পদের পরিমাণ প্রায় একশত কোটি মেট্রিক টন যা প্রায় এক হাজার মিটার গভীরে অবস্থিত। এর ফলে জামালগঞ্জের কয়লা উত্তোলন করা বর্তমানে প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ লাভজনক নয়। বড়পুকুরিয়া এবং পীরগঞ্জের কয়লা (১৬০ মিটার গভীরে) সম্পদের পরিমাণ যথাক্রমে ২৫ কোটি ও ৪০ কোটি মেট্রিক টন। বর্তমানে এ দুই স্থানে কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষার লক্ষ্যে কারিগরী ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা চালানো হচ্ছে।

৩.৩ পিট কয়লাঃ–সারা বাংলাদেশ পিট কয়লা সম্পদ প্রায় ৬০ কোটি মেট্রিক টন তার মধ্যে ফরিদপুর এবং খুলনা অঞ্চলে এর মজুদ প্রায় ১৩·৩ কোটি মেট্রিক টন। পিট কয়লার নিশ্চিত মজুদ নির্ণয়ের ব্যাপারে পর্যাপ্ত কারিগরী ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা চালানো হয়নি।

৩.৪ তৈলঃ–বাংলাদেশের হরিপুরে এক মাত্র তৈল ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মজুদ এখনো নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। ধারণা করা হচ্ছে যে, এক্ষেত্রে তৈল সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৪ কোটি ব্যারেল যার মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ উত্তোলন করা সম্ভব হতে পারে।

৩.৫ প্রাকৃতিক গ্যাসঃ–পরিকল্পনা দলিল অনুসারে বাংলাদেশের মোট ১৫টি গ্যাস ক্ষেত্রের মজুদের পরিমাণ ১৩ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট, যার মধ্যে ১৯৯০ সালের জুন পর্যন্ত ১·৩৫ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট ব্যবহৃত হয়েছে। পেট্রোবাংলার প্রাথমিক (প্রভিশনাল) হিসেব মতে বাংলাদেশ বর্তমানে ১৭টি গ্যাস ফিল্ডে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ প্রায় ৩৭ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট যার মধ্যে প্রায় ২৬ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট প্রোভেন প্লাস পেসিবল মজুদ। প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে উত্তোলিত তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এন জি এল) এর মজুদ প্রায় দশ কোটি ব্যারেল।

৩.৬ জল বিদ্যুৎঃ–বাংলাদেশে জল বিদ্যুতের মোট সম্ভাবনার (কাপ্তাই, সান্দু, মাতামহুরী) পরিমাণ বছরে ১৫০০ গেগাওয়াট ঘন্টা। বর্তমানে স্থাপিত কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ ইউনিটসমূহের মাধ্যমে ১০০০ গেগাওয়াট ঘন্টা উৎপাদনে সম্ভব। তবে স্বল্প বৃষ্টির কারণে বর্তমানে বছরে এর পরিমাণ ৭৫০ গেগাওয়াট ঘন্টার বেশী হওয়া সম্ভব নয়।

৩.৭ বায়োমাস জ্বালানী সম্পদঃ–বাংলাদেশের বায়োমাস জ্বালানী সম্পদের ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় ৩·৮ কোটি মেঃ টন যার মধ্যে কৃষি ও বন সম্পদের রেসিডুয়াল হিসেবে প্রাপ্ত জ্বালানীর পরিমাণ প্রায় ২·৯ কোটি টন এবং বাকী ০·৬৭ কোটি টন জ্বালানী গোবর হতে এবং ০·২৩ কোটি টন জ্বালানী পুনঃব্যবহৃত বায়োমাস হতে আহরিত হয়।

৪.০ চাহিদা ও সরবরাহের ভারসাম্যঃ–জ্বালানী চাহিদা প্রধানতঃ আবাসিক, শিল্প, বাণিজ্যিক পরিবহন ও কৃষি খাতের ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। দেশের ভবিষ্যতে জ্বালানী চাহিদার প্রকৃত অভিক্ষেপ নির্ণয়, জ্বালানী পরিকল্পনার একটি অতি প্রয়োজনীয় অংগ। সাধারণতঃ প্রত্যেকটি খাতের ব্যবহারকারীর অতীতের জ্বালানী চাহিদার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ চাহিদার অভিক্ষেপ করা হয়। এর সাথে বিবেচনা করা হয় সরকারের নীতি ও কলা–কৌশল এবং অর্থনৈতিক খাতের অবকাঠামোগত পরিবর্তন চিত্র। বায়োমাস জ্বালানীর চাহিদা নিরূপনের বেলায় একটু ভিন্নতর পন্থা ব্যবহার করা হয়। এর বেলায় মোট চাহিদা থেকে যেটুকু প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য ও বিদ্যুৎ থেকে প্রাপ্ত জ্বালানী হতে চাহিদা মেটানো সম্ভব তা নির্ণয়ের পর যে পরিমাণ চাহিদা অবশিষ্ট থাকে তা মিটানোর জন্য এনার্জি ব্যালেন্স বায়োমাস জ্বালানী হিসেবে ধরা হয়।

৫.০ জ্বালানী খাতের সমস্যা এবং এর সমাধানের পন্থাসমূহঃ–

৫.১ বাণিজ্যিক এবং বায়োমাস জ্বালানীঃ–বর্তমানে বাংলাদেশে মাথাপিছু জ্বালানী ব্যবহার কম। ক্রমাগত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে মাথাপিছু জ্বালানীর ব্যবহার বাড়বে বায়োমাস জ্বালানীর সীমিত সরবরাহের কারণে বর্ধিত চাহিদা বাণিজ্যিক জ্বালানী থেকে মিটাতে হবে এবং একই সাথে বায়োমাস জ্বালানীর নিশ্চিত (সাসটেইনেবল) সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.২ দেশীয় এবং আমদানীকৃত জ্বালানীঃ–বাংলাদেশের জ্বালানী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশীয় জ্বালানী সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে আমদানীকৃত জ্বালানীর ব্যবহার হ্রাস করা। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে আমদানীকৃত জ্বালানী, মোট প্রাথমিক জ্বালানীর ১২·৭ শতাংশ চাহিদা পূরণ করে। পরিকল্পনা কমিশনের অভিক্ষেপ অনুসারে দেখা যায় যে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত মোট প্রাথমিক জ্বালানীতে আমদানীকৃত জ্বালানীর অনুপাতের কোন পরিবর্তন হবে না। কিন্তু আমদানীকৃত জ্বালানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আন্তর্জাতিক সমস্যার কারণে তৈল আমদানী ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। এই প্রেক্ষিতে আমদানীকৃত জ্বালানীর উপর নির্ভরতা কমাবার লক্ষ্যে যে সকল পন্থা বিবেচনা করা যেতে পারে তা নিম্নরূপঃ

(ক) দেশীয় কয়লা সম্পদ উত্তোলন।

(খ) কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন। ~~ইউনিট স্থাপন।~~

(গ) আণবিক শক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট স্থাপন।

(ঘ) জ্বালানী ক্ষেত্রে বিভিন্ন জ্বালানী সংরক্ষণ নীতি ও প্রকল্প গ্রহণ।

(ঙ) বিভিন্ন জ্বালানী পণ্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত মূল্য নির্ধারণ।

(চ) বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে এনার্জি ব্যবহারের তারতম্য দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.৩ আঞ্চলিক জ্বালানী সরবরাহের ব্যবস্থাকরণঃ-বাংলাদেশের আবিষ্কৃত মোট জ্বালানী সম্পদের যেমন জল বিদ্যুৎ প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি, সম্পূর্ণটাই পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে)। পশ্চিমাঞ্চলে (খুলনা ও রাজশাহী বিভাগ) কয়লা ও পিট সম্পদ আবিষ্কৃত হলেও তার নির্দিষ্ট মজুদ নিরূপণ করে উত্তোলন এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। দেশের বনাঞ্চলের মোট আয়তনের মধ্যে ৬৭ শতাংশ পূর্বাঞ্চলে এবং বাকী ৩৩ শতাংশ পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত, যার মধ্যে খুলনা বিভাগে ৩২ শতাংশ এবং মাত্র ১ শতাংশ রাজশাহী বিভাগ। এর থেকে ধারণা করা যায় যে, তুলনামূলকভাবে পূর্বাঞ্চলে জ্বালানী সরবরাহের ক্ষেত্রে অনুকূল অবস্থায় আছে এবং পশ্চিমাঞ্চলের অবস্থা অসুবিধাজনক। সাম্প্রতিক দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়, পশ্চিমাঞ্চলের জ্বালানী চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে যে সকল বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হলোঃ

(ক) পশ্চিমাঞ্চলের আমদানীকৃত জ্বালানী ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় বলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় পূর্বাঞ্চলের চেয়ে অনেকে বেশী। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে একই বিদ্যুৎ হার ধার্য্য করা হয়েছে।

(খ) পূর্ব-পশ্চিম বিদ্যুৎ আন্তঃসংযোগ লাইন স্থাপনের মাধ্যমে পূর্বাঞ্চল হতে গ্যাসভিত্তিক উৎপাদিত বিদ্যুৎ পশ্চিমাঞ্চলে স্থানান্তর করা হচ্ছে।

(গ) সরকার অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে ফার্নেস অয়েল ব্যবহারের জন্য ভুর্তুকী প্রদান করা হচ্ছে।

(ঘ) বন বিভাগ উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ৭টি জেলায় কমিউনিটি ফরেষ্ট্রি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। উপরোল্লেখিত পদক্ষেপগুলো পশ্চিমাঞ্চলের জ্বালানী চাহিদা মেটাতে কিছুটা সহায়ক হলেই জ্বালানীর ক্রমাগত চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে নিম্নে প্রদত্ত পন্থাগুলো বিবেচনা করা প্রয়োজনঃ

বিদ্যুৎ ঃ

(ক) কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন (প্রথমদিকে আমদানীকৃত কয়লা ব্যবহার করা যেতে পারে)।

(খ) আণবিক বিদ্যুৎ ও উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন।

(গ) কুতুবদিয়া-গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন এবং পাইপ লাইন স্থাপন করে পশ্চিম অঞ্চলে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন।

(ঘ) দ্বিতীয় আন্তঃ সংযোগ বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন।

অন্যান্য ঃ

(ক) বায়োমাস জ্বালানী বিকল্প হিসাবে কয়লা ব্যবহার।

(খ) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে আশুগঞ্জ হতে এলেংগা পর্য্যন্ত এলপিজি পাইপ লাইন স্থাপন।

(গ) আবাসিক ও শিল্প খাতে বিভিন্ন জ্বালানী সাশ্রয় কর্মসূচীর বাস্তবায়ন।

(ঘ) বড়পুকুরিয়া কয়লা ক্ষেত্র উন্নয়ন।

(ঙ) ফরিদপুর ও খুলনা অঞ্চলে পিট উত্তোলনের জন্য পাইলট প্রকল্প স্থাপন।

(চ) পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন।

৫.৪ শহর–পল্লী অঞ্চলে জ্বালানী সরবরাহ পরিস্থিতিঃ–গ্রাম ও শহরে জ্বালানী সরবরাহে বেশ অসামঞ্জস্য পরিকল্পিত হয়। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক শহরের তুলনায় খুবই নগণ্য এবং গ্যাস নেটওয়ার্ক নেই বলেই চলে। গ্রাম ও শহর অঞ্চলে জ্বালানী সরবরাহ (চাহিদাভিত্তিক) ৫ টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন– আবাসিক, শিল্প, বাণিজ্যিক, পরিবহন ও কৃষি।

আবাসিকঃ

গ্যাস ও বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক বেশীর ভাগই শহর–কেন্দ্রিক। শহরের দরিদ্র শ্রেণীর জনগণ তাদের জ্বালানীর প্রয়োজন মেটানোর জন্য এই সকল বাণিজ্যিক জ্বালানীর ব্যবহার করতে পায় না। তাদের রান্নার জন্য বায়োমাস জ্বালানী এবং আলো জ্বালাবার জন্য সামান্য কেরোসিন এর উপর নির্ভর করতে হয়। গ্রামাঞ্চলে প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ পরিবারই রান্নার জন্য বায়োমাস জ্বালানী ব্যবহার করে থাকে এবং আলোর জন্য খুবই অল্প পরিমাণ বাণিজ্যিক জ্বালানী (কেরোসিন) তারা ব্যবহার করে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে দেশের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ (যা মোট শহর কেন্দ্রিক পরিবারের ২৩·৫% এবং গ্রামে অবস্থিত মোট পরিবারের ৬·৬%) পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া সম্ভব হয়েছে। মোট শহর কেন্দ্রিক পরিবারের মাত্র ১২% (যা দেশের মোট পরিবারের মাত্র ২·২%) প্রাকৃতিক গ্যাস লাইনের সংযোগ আছে।

শিল্পঃ

সস্তায় জ্বালানীর সুবিধা ভোগের জন্য বড় বড় শিল্প কারখানাগুলো গ্যাস নেটওয়ার্কের কাছে স্থাপন করা হয়েছে। দেশের কম উন্নত এবং অনুন্নত অঞ্চলে শিল্প কারখানা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর সুবিধা প্রদান করা হলেও জ্বালানীর দামের তারতম্যের কারণে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ সুবিধা ভোগ করে ঐ সকল অঞ্চলে শিল্প কারখানা গড়ে উঠেনি। তুলনামূলকভাবে শহরাঞ্চলের শিল্প কারখানাগুলো গ্রামাঞ্চলের চেয়ে সহজে বিদ্যুৎ সংযোগ পায়। অন্যদিকে পশ্চাদপদ গ্রামাঞ্চলে পল্লী বিদ্যুৎ কর্মসূচীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌছাবার ব্যবস্থা করা হলেও বিভিন্ন কারণে তারা তা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করতে পারে না।

বাণিজ্যিকঃ

বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহ যেমন হোটেল, রেস্তোঁরা ইত্যাদি শহরকেন্দ্রিক হওয়ায় তারা সকল প্রকার বাণিজ্যিক জ্বালানী ব্যবহার করতে সক্ষম। তাদের জ্বালানী চাহিদার পরিমাণ সাধারণতঃ বিভিন্ন জ্বালানী দ্রব্যের মূল্যের উপর নির্ভর করে থাকে।

পরিবহনঃ

শহরকেন্দ্রিক পরিবহন ব্যবস্থা সাধারণতঃ বাণিজ্যিক জ্বালানী ব্যবহার করে থাকে যদিও গরুর গাড়ী, রিকসা ও ঠেলাগাড়ীতে কায়িক শ্রমও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শহর এবং পল্লী অঞ্চলের মধ্যে সংযোগকারী পরিবহনগুলোর বেশীর ভাগই অযান্ত্রিক। যান্ত্রিক পরিবহন চালনার জন্য বাণিজ্যিক জ্বালানীর চাহিদা নগণ্য। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে সাম্প্রতিককালে কিছু দেশীয় নৌকা যান্ত্রিকীকরণের ফলে ডিজেলের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষিঃ

কৃষিতে যে জ্বালানী ব্যবহৃত হয় তার সম্পূর্ণটাই পল্লী অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। সাম্প্রতিককালে পর্যাপ্ত ডিজেল সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণের মাধ্যমে সেচ যন্ত্র ব্যবহার দ্বারা কৃষি উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে যান্ত্রিক চাষাবাদ ও সেচ ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত হলে ডিজেল ও বিদ্যুতের ব্যবহার আরো দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

৫.৫ আর্থ–সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক জ্বালানী উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নঃ–দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের জীবন ধারণ ও মান উন্নয়নের জন্য জ্বালানী একটি অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। জ্বালানী উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের সময় বিভিন্ন আর্থ–সামাজিক শ্রেণীর জ্বালানী চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে জ্বালানী উন্নয়ন কর্মসূচীতে সাধারণতঃ বাণিজ্যিক জ্বালানী উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়। বাণিজ্যিক জ্বালানীর ব্যবহার চাহিদা বা ক্রয় ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং সীমিত ক্রয়ক্ষমতার কারণে দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের প্রয়োজন অনুসারে বাণিজ্যিক জ্বালানীর সুবিধা ভোগ করতে পারে না। যে কারণে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ মারাত্মকভাবে জ্বালানী সমস্যার সম্মুখীন। দরিদ্র জনসাধারণের জ্বালানী সমস্যা কিছুটা লাঘবের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করা হয়ঃ

(ক) উন্নত চুলা ব্যবহার সম্প্রসারণ,

(খ) উন্নত কুপি ব্যবহার সম্প্রসারণ,

(গ) কুপন সিষ্টেম প্রচলনের মাধ্যমে এবং/অথবা রেশন কার্ডের মাধ্যমে দরিদ্র শ্রেণীর জন্য কেরোসিন বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা।

(ঘ) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে তাদেরকে জ্বালানী সরবরাহ অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করা,

(ঙ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনধারণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে, যে সকল এলাকায় গ্যাস নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হয়েছে সে সকল এলাকায় গোষ্ঠীভিত্তিক আবাসিক রান্না ও অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য মিটার সম্বলিত গ্যাস সংযোগ দেয়া প্রয়োজন।

৫.৬ জ্বালানী উন্নয়নের সময়কালঃ–পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর্মসূচী প্রণয়নের একটি ক্রমাগত প্রক্রিয়া। বিভিন্ন ধরণের নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তাবায়নকাল ভিন্ন। সে কারণে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে সময়ের ক্রমানুসারে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। জ্বালানী উন্নয়ন কার্য্যক্রম বাস্তবায়নের সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত তিনটি পর্যায়ে সময় ক্রমানুসারিতা বিবেচনা করা প্রয়োজনঃ

(ক) ম্যাক্রো পর্যায়ে জ্বালানী খাতের উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে অন্যান্য খাতের উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়নের সমন্বয় সাধন করা।

(খ) এনার্জি সেক্টরের এক উপখাতের উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে অন্য উপখাতের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সমন্বয় সাধন করা।

(গ) এনার্জি সেক্টরের উপখাত পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়নের সময় ক্রমানুসারিতা বজায় রেখে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ফলাফল লাভের সময়কালের বিবেচনায় জ্বালানী উন্নয়ন কার্যক্রমকে চারটি ভাগে ভাগে করা যায়ঃ

(ক) **তাৎক্ষণিকভাবে বিবেচ্য কার্যক্রমঃ** মধ্যপ্রাচ্যে সংকটের প্রেক্ষাপটে জ্বালানী সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সরকার নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে–প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা হতে এবং প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানী সামগ্রীর বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বেসকারী কাজে ডিজেল চালিত সরকারী যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা, সন্ধ্যা ৭ টার পর থেকে দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা।

(খ) স্বল্প মেয়াদী (১—৩ বৎসর) কার্যক্রম ঃ

(১) বিভিন্ন জ্বালানী সামগ্রীর মূল্য যুক্তিসংগতভাবে নির্ধারণকরণ,

(২) জ্বালানী সাশ্রয়ের লক্ষ্যে উন্নত কুপি ও চুল্লির ব্যবহার সম্প্রসারণ,

(৩) বায়োমাস জ্বালানী সমস্যা লাঘবের উদ্দেশ্যে রান্নার কাজে বায়োমাস জ্বালানীর প্রতিকল্প হিসেবে কয়লা বিপণনের ব্যবস্থাকরণ,

(৪) জ্বালানী সংরক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন,

(৫) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বিদ্যুৎ সিষ্টেম লস হ্রাসের লক্ষ্যে প্রণীত প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়ন,

(৬) প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্র হতে ন্যাচারাল গ্যাস লিকুইড (এন জি এল) উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং হরিপুর তৈল ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন, ও

(৭) নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং এর ব্যবস্থাকরণ।

(গ) মধ্য মেয়াদী (পাঁচ বৎসর) কার্যক্রম ঃ

(১) পশ্চিমাঞ্চলে তৈল ও গ্যাস আবিষ্কারের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনুসন্ধান, কূপ খনন;

(২) পশ্চিমাঞ্চলে বড়পুকুরিয়া কয়লা ক্ষেত্র উন্নয়ন;

(৩) পশ্চিমাঞ্চলে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন;

(৪) পশ্চিমাঞ্চলে আনবিক শক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন;

(৫) কুতুবদিয়া গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও পশ্চিমাঞ্চলের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সাথে সংযোগ স্থাপন;

(৬) চালনায় ও পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের ডিপো/সাব ডিপো স্থাপন;

(৭) পশ্চিমাঞ্চলে পিট কয়লা ক্ষেত্রের উন্নয়ন;

(৮) পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন চলতি গ্যাস সঞ্চালন প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্নকরণ;

(৯) এল পি জি প্লান্ট স্থাপন এবং এলেংগা পর্যন্ত পাইপ লাইন দ্বারা পশ্চিমাঞ্চলে এল পি জি বিতরণ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১০) বর্তমানে যে সকল গ্যাস পাইপ লাইন তার ক্ষমতার নিম্নে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলোর ব্যবহার ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই পাইপ লাইনের সাথে সংযুক্ত করে প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন;

(১১) পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচী দ্রুত সম্প্রসারণ;

(১২) জ্বালানী কাঠ সরবরাহের পরিস্থিতি উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে বন বিভাগ–কর্তৃক বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী জোরদারকরণ।

(ঘ) দীর্ঘ মেয়াদী (পাঁচ থেকে দশ বৎসর) কার্যক্রম ঃ

(১) পশ্চিমাঞ্চলে আনবিক শক্তিচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন ও চালুকরণ;

(২) পশ্চিমাঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাস লাইন সম্প্রসারণ;

(৩) পীরগঞ্জ কয়লা ক্ষেত্র উন্নয়ন;

(৪) পশ্চিমাঞ্চলে বেশ কিছু সংখ্যক কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন;

(৫) সাংগু এবং মাতামুহুরী নদীতে জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন।

৫.৭ সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগঃ–সাধারণতঃ এনার্জি খাতের প্রকল্পগুলো সরকারী খাতের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। বর্তমান সময় সরকারী খাতের বিনিয়োগ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এনার্জি খাতে বেসরকারী বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারের বেশ কিছু উৎসাহব্যঞ্জক নীতি গ্রহণ করছে। কিন্তু একটি বেসরকারী কোম্পানীর সাথে হরিপুরে অবস্থিত দেশের একমাত্র আবিষ্কৃত তৈল ক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য চুক্তি করার ফলে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। জনমনের এই বিভ্রান্তি দুর করার লক্ষ্যে টাস্ক ফোর্স এই চুক্তিটি পর্য্যালোচনার সুপারিশ করে। টাস্ক ফোর্স আরও সুপারিশ করে যে, ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত যে কোন তৈল/গ্যাস/কয়লা ইত্যাদির ক্ষেত্র/খনি উন্নয়নের জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে উৎপাদন ভাগাভাগি চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে বিভিন্ন ফোরামে প্রকাশ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং নীতিগতভাবে চুক্তির পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে উৎপাদন ভাগাভাগির শর্ত নিরূপন করা প্রয়োজন। এনার্জি খাতে বর্তমানে যে সকল ক্ষেত্রে বেসরকারী বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হচ্ছে সেগুলো হলো (Build operate and transfer তৈরীকরণ, পরিচালিত ও হস্তান্তর পদ্ধতি) ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন, গ্যাস ভিত্তিক স্বল্প আকারে বিদ্যুৎ জেনারেটর স্থাপন, পরিবহন ক্ষেত্র ব্যবহারের জন্য সি এন জি প্লান্ট এবং রিফিউলিং ষ্টেশন স্থাপন, এল পি জি বিতরণ ও বিপণন, নব ও নবায়নযোগ্য প্রযুক্তি বিপণন, উন্নতর চুলা ও কুপি বিপণন এবং টার্ন কি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন ইত্যাদি।

৫.৮ এনার্জি সংরক্ষণ ও জ্বালানী সম্পদের দক্ষ ব্যবহারঃ–জ্বালানী সংরক্ষণ, জ্বালানী সম্পদের দক্ষ ব্যবহার এবং জ্বালানী প্রযুক্তিসমূহের ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হলে জ্বালানী সরবরাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রমে বিনিয়েগের পরিমাণ কিছুটা কমানো সম্ভব। জ্বালানী সংরক্ষণ কার্যক্রম বিশ্বে আজ অতিরিক্ত জ্বালানী সম্পদ হিসাবে স্বীকৃত। জ্বালানী সংরক্ষণ দ্বারা যে সকল সুফল লাভ করা সম্ভব সেগুলো হলোঃ

(ক) বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যুৎ সংরক্ষণ দ্বারা ভবিষ্যতে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা যেতে পারে।

(খ) জ্বালানী সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্রেতা সাধারণের জ্বালানী খাতের ব্যয় হ্রাস পেতে পারে।

(গ) দেশের আমদানী ব্যয় হ্রাস পেতে পারে;

(ঘ) পরিবেশ দূষণ হ্রাস পেতে পারে, ইত্যাদি।

৫.৯ জ্বালানী সরবরাহ ব্যবস্থাপনাঃ–সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্বালানী সরবরাহের কলা–কৌশল প্রণয়ন, দক্ষ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চয়তার মূল চাবিকাঠি। বিগত কয়েক বৎসর হতে পেট্রোবাংলা বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন করে আসছে। এতে করে গ্যাস গ্রিড সিষ্টেম পর্যাপ্ত ফেক্সিবিলিটি ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন চলতি বৎসর প্রায় ১৯·৪৫ লক্ষ টন পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দেশের পেট্রোলজাত দ্রব্যের সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও তার বিভিন্ন সাবসিডিয়ারী সার্বক্ষণিকভাবে তেলের বাজার অনুবীক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা

গ্রহণ করেছে। সুষ্ঠু বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সরবরাহের নির্ভরশীলতা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের পরিচালনার ক্ষেত্রে ফেক্সিবিলিটি বিশেষ প্রয়োজন। দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২১৭৯ মেগাওয়াট এর মধ্যে পূর্বাঞ্চলের বিদ্যমান ক্ষমতা ১৮১৪ মেগাওয়াট ও পশ্চিমাঞ্চলের ৩৬৫ মেগাওয়াট। ১৯৯০ অর্থ বৎসরে এ সকল উৎপাদন কেন্দ্র হতে প্রায় ৭৭৩২ গেগাওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ এনার্জি উৎপাদিত হয়েছে-যার মধ্যে জলবিদ্যুৎ হতে ৮৮৪ গেগাওয়াট ঘন্টা (১১·৫%) গ্যাস হতে ৬৫১৫ গেগাওয়াট ঘন্টা (৮৪·৩%) এবং পেট্রোলজাত দ্রব্য হতে ৩৩৩ গেগাওয়াট ঘন্টা (৪·৩%)। পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৫৪৪৬ গেগাওয়াট ঘন্টা (৭০·৪%) বিদ্যুৎ এনার্জি ব্যবহৃত হয়েছে অপরদিকে পশ্চিমাঞ্চলে এর ব্যবহার ছিল মাত্র ২২৮৮ গেগাওয়াট ঘন্টা (২৯·৬%)।

৫.১০ জ্বালানী চাহিদা ব্যবস্থাপনাঃ-জ্বালানী চাহিদা ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিদ্যুৎ চাহিদা ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যুৎ চাহিদা ব্যবস্থাপনায়, বিভিন্ন নীতি ও কলা-কৌশল প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎতের পিক ডিমান্ড উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব। এতে করে ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব শুধুমাত্র তা নয়, এছাড়াও বিদ্যুতের পিক ডিমান্ডের ফলে অতিরিক্ত গ্যাস চাহিদা মেটানোর জন্য পেট্রোবাংলা গ্যাস কূপ ও পাইপ লাইনের যে অতিরিক্ত ক্ষমতা সংরক্ষণ করতে হয় তার বিনিয়োগ ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাবে এবং পশ্চিমাঞ্চলে আমদানিকৃত পেট্রোলজাত দ্রব্যের দ্বারা পিক আওয়ারের উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরবরাহও হ্রাস পাবে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পিক ডিমান্ড এর জন্য ব্যবহৃত একটি ১৫০ মেঃ ওঃ গ্যাস টারবাইন যদি চালনা না করা হয় তবে দৈনিক ২৯·২৫ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হওয়া সম্ভব।

৫.১১ সিষ্টেম লসঃ-সিষ্টেম লস যে কোন একটি সিষ্টেম এর অদক্ষ ব্যবস্থাপনারই ইংগিত। জ্বালানী খাতের প্রত্যেকটি উপ-খাতেই সিষ্টেম লস পরিলক্ষিত হয়। তবে বর্তমানকালে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সিষ্টেম লস বহুলভাবে প্রচার লাভ করেছে। এনার্জি খাতের সার্বিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার লক্ষ্যে জ্বালানী খাতের সকল উপ-খাতের সিষ্টেম লস এ কারণ ও তার প্রতিকার নির্ণয় করা অতি প্রয়োজন। সিষ্টেম লস দুই প্রকার, প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) ও অপ্রযুক্তিগত (নন-টেকনিক্যাল)। প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধনের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সিষ্টেম লস কমানো সম্ভব। কিন্তু সে জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। অপ্রযুক্তিগত সিষ্টেম লস সাধারণত কোনরূপ মাপযন্ত্র না থাকায় ভুল মাপযন্ত্র ব্যবহার, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, জ্বালানী সামগ্রী চুরি এবং জ্বালানীর অদক্ষ ব্যবহার ইত্যাদি কারণে হয়ে থাকে। এগুলি প্রতিকারের জন্যও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। কয়লা উপ-খাতে প্রযুক্তিগত এবং অপ্রযুক্তিগত উভয় প্রকার লসই বিদ্যমান খনিজ তৈল উপ-খাতে প্রক্রিয়াকরণ ও অপ্রযুক্তিগত লস বিদ্যমান প্রাকৃতিক গ্যাস উপ-খাতে ভুল মিটার রিডিং, গ্যাস সরবরাহ লাইনের বিরাজমান লিক, গ্যাস ব্যবহারের অপচয় ও অননুমোদিত গ্যাস সংযোগ এর কারণে সিষ্টেম লস হচ্ছে। উল্লেখিত সিষ্টেম লসের অবস্থান যথাযথভাবে চিহ্নিত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সিষ্টেম লস দুই প্রকার-প্রযুক্তিগত এবং অপ্রযুক্তিগত। প্রযুক্তিগত সিষ্টেম লসের মধ্যে পড়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিজস্ব ব্যবহার, সঞ্চালন লাইনের লস, বিতরণ লাইনের লস, ইত্যাদি বাংলাদেশে প্রযুক্তিগত সিষ্টেম লসের আনুমানিক হার শতকরা ১৯-২৫ ভাগ। অপ্রযুক্তিগত সিষ্টেম লসের আওতায় পরে ভুল মিটার রিডিং, বিল না করা, বিদ্যুৎ চুরি করা ইত্যাদি। অপ্রযুক্তিগত সিষ্টেম লসের আনুমানিক হার শতকরা ১৫·১৫ ভাগ। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সিষ্টেম লস দুই প্রকার যথা প্রযুক্তিগত (শুধুমাত্র বিতরণ) ও অপ্রযুক্তিগত (চুরি, কম বিল করা ইত্যাদি)। ১৯৮৯-৯০ সালে সিষ্টেম লসের পরিমাণ বিল ১৬·৯%। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অধীনে সিষ্টেম লসের কারণে এনার্জি লস হলেও রাজস্ব আয়ে কোন লোকসান হয় না। বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে লসের টাকা আদায় করা হয়ে থাকে। সিষ্টেম লস কমানোর লক্ষ্যে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ ও সুপারিশ করা হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হলোঃ

(ক) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ বোর্ডের উন্নয়ন বোর্ডের চলতি সিষ্টেম লস রিডাকশন স্কীমটি সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন ব্যবস্থাকে বিতরণ প্রক্রিয়া থেকে পৃথক করা হলে সিষ্টেম লস কমানো সম্ভব হবে।

(খ) প্রাকৃতিক গ্যাস সিষ্টেম লস কমানো লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা হাতে নেয়া প্রয়োজন।

(গ) কয়লা উপখাতের সিষ্টেম লসের কারণ এবং এর প্রতিকার নির্ণয় করার লক্ষ্যে সমীক্ষা হাতে নেয়া প্রয়োজন।

(ঘ) খনিজ তৈল উপখাতে সিষ্টেম লসের কারণ ও এর প্রতিকার নির্ণয় করার লক্ষ্যে সমীক্ষা হাতে নেয়া প্রয়োজন।

(ঙ) সিষ্টেম লস কমানোর লক্ষ্যে যুক্তি সংগত আইন–কানুন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন।

(চ) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে রান্নার জন্য জ্বালানী গ্যাসের ব্যবস্থা করা হলে বিদ্যুতের সিষ্টেম লস কমাতে কিছুটা সহায়তা করবে।

৫.১২ জ্বালানী ও পরিবেশঃ–জ্বালানী উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবেশ দূষণ হ্রাস করা একটি অপরিহার্য অংগ হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মত জনবহুল উন্নয়নশীল দেশের জন্য এ বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। জ্বালানী সম্পদ যেমন কয়লা, পিট, খনিজ তেল এ সবগুলোই ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষিত হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে পরিবেশ দূষণ নেই বল্লেই চলে। বিভিন্ন গ্যাস ভিত্তিই বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইউরিয়া সার কারখানা হতে নির্গমিত গ্যাস ও গরম পানি, বায়ু ও নদীর পানি দূষিত করে। জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের ফলে স্থানীয় পরিবেশের প্রচুর পরিবর্তন হয়, যার ফলে স্থানীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনকালে এ দিক লক্ষ্য রাখা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

বায়োমাস জ্বালানী বিশেষ করে জ্বালানী কাঠের সরবরাহের অপ্রতুলতার কারণে বনাঞ্চলের আয়তন সাম্প্রতিককালে অবিশ্বাস্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে কৃষি উৎপাদনের অবশিষ্টাংশ (খড়, তুষ ইত্যাদি) জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের ফলে মাটির উর্বরা শক্তিও দ্রুত কমে আসছে। এর প্রতিকারের বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া একান্ত প্রয়োজন।

৫.১৩ গবেষণা ও মানব সম্পদ উন্নয়নঃ–এনার্জি খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নির্ভর করে গবেষণা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর।

এনার্জি খাতে, যে সকল বিষয়ের উপর গবেষণায় অগ্রাধিকার দেয়া উচিত সেগুলো হলোঃ

(ক) বিভিন্ন নীতির বিশ্লেষণ;

(খ) সম্পদ মূল্যায়ন;

(গ) প্রযুক্তি মূল্যায়ন;

(ঘ) মান নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন নির্ণায়ক সনাক্তকরণ;

(ঙ) প্রযুক্তি আত্মীকরণ;

(চ) নতুন প্রযুক্তি প্রদর্শন, ও

(ছ) বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচীর প্রভাব মূল্যায়ন।

চাহিদাভিত্তিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচীর যে সকল উপাদান অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় সেগুলো হলোঃ

(ক) জ্বালানী পরিকল্পনার উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়ন।

(খ) প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়ন।

(গ) কারিগরী দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়ন; ও

(ঘ) জ্বালানী খাতের সম্পৃক্ত বেসরকারী বিনিয়োগকারী এবং ক্রেতাগণের কর্মসূচী।

৫.১৪ প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো ও জ্বালানী খাতের ব্যবস্থাপনাঃ–জ্বালানী খাতের বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় এবং তাদের অধীস্থ বিভিন্ন সংস্থা নিয়োজিত। এ কারণে এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তার আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে একটি ব্যাপকভিত্তিক ফোরাম গঠন করা প্রয়োজন যাতে উপরোল্লিখিত মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিগণ ছাড়াও বিভিন্ন এনার্জি বিশেষজ্ঞগণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, গবেষকগণ অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। এ ফোরামটির নাম হবে জাতীয় জ্বালানী কমিটি এবং এর প্রধান হবেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালেয় দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী।

বর্তমানে তৈল, গ্যাস এবং প্রাকৃতিক অনুসন্ধান, সঞ্চালন ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ সাবসিডিয়ারীগুলো পাবলিক হোলডিং কোম্পানী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে এবং এদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কোন ত্রুটি–বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়নি।

একইরূপে, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও তার অধীনস্থ সাবসিডিয়ালীগুলো, হোলডিং কোম্পানী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে এবং তাদের ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের ভিতর কোন বিচ্যুতি লক্ষ করা যায় নি। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং তারা বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং অংশিক বিতরণের কাজে নিয়োজিত আছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অধীনে দক্ষতা ও লাভজনকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা কাজ সম্ভব হয়ে উঠছে না। একারণে ইদানিংকালে দক্ষতার সাথে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তনের আলোচনা চলছে। এ প্রসংগে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রাথমিক পর্যায়ে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অর্থরিটি (ডেসা) বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার কাজে নিয়োজিত থাকবে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং ডেসা ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বহির্ভূত এলাকায় বিদ্যুৎ সঞ্চালনে নিয়োজিত থাকবে। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি দ্বারা বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার দায়িত্বে নিয়োজিত কাঠামোর কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি লক্ষ করা যায় নি। পল্লী বিদ্যুতায়নের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে যে ভবিষ্যতে বিভিন্ন শহরাঞ্চলে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাগুলো পল্লী বিদ্যুতায়ন সমিতির ন্যায় ক্রেতা সমবায় ভিত্তিক গঠন করা যেতে পারে। তবে সার্বিকভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা উন্নতির জন্য পেট্রোবাংলার মত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও বিবেচনা করা যেতে পারে।

৫.১৫ জ্বালানী মূল্য নীতিঃ–বাংলাদেশের জ্বালানী মূল্য নীতি স্বীকৃত অর্থনৈতিক নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত নয়। তবে, মূল্য নির্ধারণকালে সমাজ কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হলেও এর কোন অর্থনৈতিক যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে, জ্বালানী মূল্য নীতিতে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যথাঃ

(ক) জ্বালানী সম্পর্কিত সংস্থানগুলো যেন আর্থিক স্বচ্ছলতার সাথে পরিচালিত হতে পারে।

(খ) জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি রেখে জ্বালানী দ্রব্যের মূল্য সম্ভবত নিম্ন স্তরে নির্ধারণ করা।

(গ) পুরো জনগোষ্ঠীর চাহিদা বিবেচনা করে জ্বালানী সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ।

টাস্ক ফোর্স সদস্যগণ প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য এবং বিদ্যুতের অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এবং জ্বালানী নির্ধারণে বিদ্যমান অসামঞ্জস্যতা অসংগতির দ্রুত নিষ্পত্তির সুপারিশ করে। সুষমভাবে জ্বালানী নীতি নির্ধারণে ক্রমাগতভাবে সহায়তা প্রদানের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে একটি জ্বালানী মূল্য নীতি ইউনিট স্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

৬.০ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলে বর্ণিত জ্বালানী উন্নয়ন কর্মসূচীর উপর টাস্ক ফোর্সের মন্তব্যঃ

৬.১ সাধারণ মন্তব্যঃ–পরিকল্পনা দলিলে জ্বালানী উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়নের উপর যে সকল ধ্যান ধারণার উল্লেখ আছে তার বেশ কিছু চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এনার্জি চাহিদা নিরূপনকালে যে সকল অনুমিত উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সকলের বোঝার সুবিধার্থে সেগুলো পরিকল্পনা দলিলের সাথে সংযোগ করা বাঞ্ছনীয়।

৬.২ তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদঃ–পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নির্ভরতার সাথে এই উপখাতের আওতাধীন বিভিন্ন সম্পদের মওজুদ সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপন করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা দলিলে উল্লেখিত প্রাকৃতিক গ্যাসের মওজুদ ও পেট্রোবাংলা কর্তৃক টাস্ক ফোর্সের লিষ্ট সরবরাহকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের মওজুদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় সর্বশেষ গ্যাস মওজুদের ভিত্তিতে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। টাস্ক ফোর্স–এ উপখাতের বিভিন্ন নীতি, কলা–কৌশল ও বিনিয়োগ কর্মসূচীর পর্যালোচনা করে বেশ কিছু নতুন ধ্যান ধারণা, নীতি, কলা–কৌশল ও বিনিয়োগ কর্মসূচী গ্রহণের সুপারিশ করে যার বিস্তারিত এই নির্বাহী সার–সংক্ষেপ ও মূল প্রতিবেদনে রয়েছে।

৬.৩ গ্রামীণ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানীঃ–চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দলিলে বর্ণিত এ উপখাতের বিভিন্ন নীতি, কলা–কৌশল ও বিনিয়োগ কর্মসূচী বিস্তারিত পর্যালোচনা করে টাস্ক ফোর্স বেশ কিছু নতুন ধ্যান ধারণা ও বিনিয়োগ কর্মসূচীর সুপারিশ করে যার বিস্তারিত এই সার–সংক্ষেপে ও মূল প্রতিবেদনে রয়েছে।

৬.৪ বিদ্যুৎঃ–জ্বালানী খাতের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ উপখাত হলো বিদ্যুৎ উপখাত। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলে বর্ণিত বিভিন্ন নীতি, কলা কৌশল ও বিনিয়োগ কর্মসূচী পর্যালোচনা করে টাস্ক ফোর্স বেশ কিছু নয়া নীতি, কলা–কৌশল ও বিনিয়োগ কর্মসূচীর সুপারিশ করে যার বিস্তারিত এই সার সংক্ষেপে ও মূল প্রতিবেদনে রয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা ও বিরাজমান অদক্ষ ব্যবস্থাপনা বিবেচনা করে টাস্ক ফোর্স পুরা বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি "পাওয়ার কমিশন" গঠন করার সুপারিশ করে।

৬.৫ এনার্জি সেক্টরে প্রযুক্তিগত দক্ষতাঃ–টাস্ক ফোর্স এনার্জি সেক্টরের বিভিন্ন উপখাতের প্রযুক্তিগত দক্ষতার মূল্যায়ন করে সুপারিশ করে যে এনার্জি কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময় জাতীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতার সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

৭.০ পরামর্শ এবং সুপারিশ ঃ

এনার্জি টাস্ক ফোর্সের পরামর্শ এবং সুপারিশমালা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ–

জ্বালানী সম্পদ নিরূপণঃ–জ্বালানী উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণের জন্য জ্বালানী সম্পদের সঠিক পরিমাণ নিরুপণ করা প্রয়োজন। কাজেই দেশের খনিজ সম্পদের বিশেষভাবে পশ্চিমাঞ্চলের খনিজ সম্পদ নিরূপণের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে সুষম পদ্ধতি জরিপ চালানো প্রয়োজন।

তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধানে বেসরকারী খাতের অংশ গ্রহণঃ–একটি বেসরকারী কোম্পানীর সাথে হরিপুরে অবস্থিত দেশের একমাত্র আবিস্কৃত তেল ক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য চুক্তি করার ফলে জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি

হয়েছে। জনমনের এই বিভ্রান্তি দূর করণের জন্য টাস্ক ফোর্স উক্ত চুক্তিটি পর্য্যালোচনার সুপারিশ করে। টাস্ক ফোর্স আরও সুপারিশ করে যে ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত যে কোন তেল/গ্যাস/কয়লা ইত্যাদি ক্ষেত্রে খনি উন্নয়নের জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে উৎপাদন ভাগাভাগি চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে বিভিন্ন ফোরামে প্রকাশ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং নীতিগতভাবে চুক্তির পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে ভাগাভাগির শর্ত নিরুপণ করা প্রয়োজন।

বাণিজ্যিক জ্বালানী উৎস এবং বায়োমাস জ্বালানী সুষম উন্নয়নঃ–দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে জ্বালানীর চাহিদা মিটানোর জন্য বাণিজ্যিক জ্বালানী সম্পদের উন্নয়ন অবশ্যই প্রয়োজন। বর্তমান পরিবৃত্তিকালে দরিদ্র জনসাধারণের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী চাহিদা মিটাবার লক্ষ্যে বায়োমাস জ্বালানীর পর্য্যাপ্ত সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের জন্য জ্বালানী খাতের পরিকল্পনাবিদদের সাথে কৃষি এবং বন খাতের পরিকল্পনাবিদদের নিবিড় সহযোগিতা প্রয়োজন।

আমদানীকৃত জ্বালানীর উপর নির্ভরশীলতাঃ–আমদানীকৃত পেট্রোলিয়াম জ্বালানীর পরিবর্তে দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের প্রচলন করার ব্যাপারে সরকারের দৃঢ় নীতির ফলে আমদানীকৃত পেট্রোলিয়াম ব্যবহার আনুপাতিকভাবে কমলেও পেট্রোলিয়াম জ্বালানী ব্যবহার সার্বিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। কাজেই আমদানীকৃত তেলের ব্যবহার কমাবার জন্য জ্বালানী সংরক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন।

জ্বালানী সম্পদের আঞ্চলিক বিভাজনঃ–কয়লা ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার আবিষ্কৃত বাণিজ্যিক জ্বালানী সম্পদ দেশের পূর্ব অঞ্চলেই অবস্থিত। কাজেই পশ্চিমাঞ্চলে জ্বালানী সম্পদ উন্নয়নের অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। নিম্নলিখিতভাবে এই উন্নয়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারেঃ–

১। পর্যাপ্ত পেট্রোলিয়াম জ্বালানী সরবরাহ নিশ্চিত রাখার জন্য পেট্রোল ডিপো বা সাব–ডিপো স্থাপন করা।

২। পশ্চিমাঞ্চলে এলপিসি সরবরাহ করার জন্য এলাংগা পর্যন্ত এলজিসি পাইপ লাইন নির্মাণ করা।

৩। শিল্প এবং আবাসিক খাতে জ্বালানী সংরক্ষণ কর্মসূচী হাতে নেয়া।

৪। পশ্চিমাঞ্চলে তেল এবং গ্যাসের প্রাপ্যতা সম্পর্কে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জরিপ গ্রহণ করা।

৫। বড় পুকুরিয়া কয়লা খনির উন্নয়ন করা।

৬। পীরগঞ্জ কয়লা খনির উন্নয়ন।

৭। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা।

৮। পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কুতুবদিয়া গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন করা।

৯। রূপপুরে আণবিক শক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা।

১০। দ্বিতীয় পূর্ব–পশ্চিম বৈদ্যুতিক সংযোগ লাইন স্থাপন করা।

১১। উত্তর–পশ্চিম অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের পাইপ লাইন সম্প্রসারণ করা।

গ্রামীণ জ্বালানী পরিকল্পনা ঃ

পল্লী বিদ্যুতায়ান বোর্ডই পল্লী এলাকায়, পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচী ছাড়াও জ্বালানী খাতের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। পল্লী এলাকার জ্বালানী সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (রুরাল এনার্জি বোর্ড) এর তত্বাবধানে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অনুরূপ বিকেন্দ্রিভূত জ্বালানী পরিকল্পনা ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ঃ

নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য কর মওকুফসহ উপযুক্ত নীতি এবং কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রযুক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা যথাসম্ভব বাড়ানোর জন্য চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচী সম্প্রসারণ এবং সংশোধন করা প্রয়োজন।

দারিদ্র্য দুরীকরণ ঃ

দরিদ্র গোষ্ঠীর বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজন ও কর্মসংস্থানের জন্য প্রত্যেক উপ-খাতে বিশেষ প্রকল্প হাতে নেয়াপ্রয়োজন।

জ্বালানী সংরক্ষণ এবং জ্বালানীর সুষ্ঠু ব্যবহার ঃ

জ্বালানীর সাশ্রয়ের বিষয়ে বিবেচনা করে জ্বালানী ব্যবহারকারী সকল সেক্টর এবং সকল প্রকার জ্বালানী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও দক্ষ কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন।

জ্বালানী উন্নয়ন কর্মসূচীতে বর্ধিত বিনিয়োগ ঃ

জ্বালানী সম্পদ উন্নয়ন একটি ব্যয় বহুল কর্মকান্ড। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করার জন্য জ্বালানীর নির্ভরযোগ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই সমস্ত কারণে জ্বালানী খাতের উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বেসরকারী খাতে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে জ্বালানী খাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন।

সিষ্টেম লস হ্রাসকরণ ঃ

জ্বালানী খাতের সকল উপখাতে বিশেষ করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সিষ্টেম লস হ্রাস করা প্রয়োজন। প্রত্যেক উপখাতে সিষ্টেম লসের কারণ নির্ণয় করার জন্য সমীক্ষা নেয়া প্রয়োজন এবং এইগুলি গ্রহণীয় পর্য্যায়ে হ্রাস করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

জ্বালানী দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ নীতি ঃ

সকল প্রকার জ্বালানী দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি সমন্বিত সুষম নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। একটি যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণ নীতি গড়ে তোলার জন্য সুষ্ঠু ও নিয়মিত সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। এই কাজের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে জ্বালানী দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণী ইউনিট স্থাপন করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

কর্ণফুলি ফার্টিলাইজার কোম্পানী (কাফকো) এর সাথে গ্যাস বিক্রয় চুক্তি সম্পর্কিত ঃ

বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা কর্তৃক কাফকোর কাজে বিক্রয়ের জন্য গ্যাসের যে মূল্য নির্ধারিত হয়েছে তা সমমানের আমদানীকৃত জ্বালানীর আন্তর্জাতিক মূল্যের অনেক নীচে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পেট্রোবাংলা দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান, আবাসিক ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য গ্যাস বিক্রয়ের যে মূল্য ধার্য করেছে তা কাফকোর সাথে চুক্তিকৃত গ্যাস বিক্রয়ের মূল্যের চেয়ে বেশী। দেশের স্বার্থে কাফকো-এর সংগে গ্যাস বিক্রয় মূল্যের যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করা আশু প্রয়োজন।

এনার্জি সম্পর্কিত সংস্থাগুলোর আর্থিক উন্নতি ঃ

এনার্জি সম্পর্কিত সংস্থাগুলোর আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য বর্তমান ঋণদান শর্তসমূহ এবং সরকারী কর ব্যবস্থা নীতি পর্য্যালোচনা করে একটি সুষ্ঠু নীতি প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক।

মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী ঃ

দক্ষ মানব শক্তি উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু ও নিয়মিত কর্মসূচী থাকা প্রয়োজন। স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।

গবেষণা কর্মসূচী ঃ

এনার্জি সেক্টরের প্রত্যেক সংস্থার নিজস্ব গবেষণা ইউনিটে সম্পদের নিরূপণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার উপর নিয়মাবদ্ধ নিয়মিত গবেষণা কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উক্ত গবেষণায় সহযোগিতা প্রদান করতে পারে।

৭.১ নীতি বিষয়ক ঃ

(ক) দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা ঃ

দরিদ্র গোষ্ঠীর অবস্থার উন্নতি করা পরিকল্পনার আদর্শ থাকলেও এই আদর্শ কার্যকর হয়নি। জ্বালানী উপখাতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জ্বালানীর প্রয়োজন মিটানোর জন্য সরাসরি ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত থাকা প্রয়োজন।

(খ) আত্ম নির্ভরশীলতা ঃ

আগামী বহু বছর পর্যন্ত আমদানীকৃত পেট্রোলিয়ামের উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে এ কারণে পেট্রোলিয়াম ব্যবহার কমানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিম কর্পোরেশনকে বিভিন্ন সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে। আগামী বহু বছর পর্যন্ত জ্বালানী উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য বিদেশী প্রযুক্তি এবং বিদেশী মূলধনের উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে। তবে যে সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ক্ষমতা আছে তার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং গবেষণা কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন, বিদেশী পরামর্শকের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে এবং আমদানীকৃত প্রযুক্তি ও সম্পদের ফলপ্রদ ব্যবহারের সহায়তা করবে। জ্বালানী ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশীয় জ্বালানী অনুসন্ধান, উৎপাদন এবং ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করাপ্রয়োজন।

(গ) দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিবৃত্তিকাল অতিক্রম করছে, যার ফলে জ্বালানী চাহিদার প্রবৃদ্ধির হার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে প্রায় দেড় থেকে দু'গুণ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাবে। তবে জ্বালানী সংরক্ষণ নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জ্বালানী চাহিদার প্রবৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ ঃ

যে সকল প্রকল্প (উন্নয়ন চুল্লি, উন্নত কুপি উত্যাদি) শহর ও পল্লী অঞ্চলের আবাসিক জ্বালানীর সাশ্রয় ও সংরক্ষণের জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে তার প্রায় সবগুলোই মহিলাদের উপকারিতায় আসবে। যে সকল শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে মহিলাকর্মীদের কর্মসংস্থানের প্রাধান্য দেবে, জ্বালানী বিতরণ ব্যবস্থায় নিয়োজিত সংস্থাগুলো তাদের লাইন সংযোগের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেবে।

৭.২ প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় ঃ

জ্বালানী খাতের জন্য ফলপ্রসূ পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং নীতি নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের যে পরামর্শ দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

(১) জাতীয় জ্বালানী কমিটি নামক একটি কমিটি জ্বালানী খাতের সার্বিক কর্মকান্ডের প্রতি নজর রাখবে এবং সরকারকে জ্বালানী সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ, জ্বালানী সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পরামর্শ দান করবে। উক্ত কমিটিতে জ্বালানী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তাদের আওতাধীন সংস্থার প্রতিনিধিগণ, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ ও গবেষকগণ ও এনার্জি বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

(২) জ্বালানী দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়ে নিয়মাবদ্ধ এবং নিয়মিত সমীক্ষা চালানোর জন্য পরিকল্পনা কমিশনে একটি জ্বালানী দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ইউনিট স্থাপন করা প্রয়োজন এবং এই ইউনিট যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জ্বালানী দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের একটি সমন্বিত নীতি গড়ে তোলার কাজে পরামর্শ প্রদান করবে।

(৩) দীর্ঘ মেয়াদী আওতায় পরিকল্পনা কমিশনের সমন্বিত জ্বালানী পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিবেচনা করা প্রয়োজন। কাজের গুরুত্ব এবং কর্মবিধির সম্প্রসারণের পেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশনে এনার্জি খাতের জন্য একটি পৃথক বিভাগ গঠন করা প্রয়োজন।

(৪) বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন সমস্যা নিরূপণের জন্য এবং তার সমাধানের উপায় বের করার জন্য একটি বিদ্যুৎ কমিশন গঠন করা প্রয়োজন।

(৫) উপ জেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত জ্বালানী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পল্লী এলাকার জ্বালানী প্রয়োজন মিটানোর জন্য গ্রামীণ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উপখাতের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়ার প্রেক্ষিতে আর ইবি'কে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নাম পরিবর্তন করে পল্লী এনার্জি বোর্ড হিসাবে নামকরণ করা প্রয়োজন।

(৬) জ্বালানী উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর সাথে জড়িত সংস্থাসমূহের প্রত্যেকটিতে নিজস্ব রিসার্চ প্রডাকটিভিটি ইউনিট স্থাপন করা প্রয়োজন।

৭.৩ টাস্ক ফোর্স পরামর্শ ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ ঃ

টাস্ক ফোর্স কর্তৃক উপরোল্লিখিত বিভিন্ন পরামর্শ ও সুপারিশমালা নিম্নোক্ত মন্ত্রণালয়/সংস্থা বাস্তবায়ন করবে।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/পরিকল্পনা কমিশন ঃ

(ক) জাতীয় জ্বালানী কমিটি গঠন।

(খ) একটি আলাদা শক্তি বিভাগ গঠন।

(গ) জ্বালানী দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ইউনিট গঠন।

(ঘ) সমন্বিত এনার্জি পরিকল্পনা প্রণয়ন।

(ঙ) জ্বালানী উন্নয়ন কর্মসূচীতে বর্ধিত বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ।

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ঃ

(ক) দেশের খনিজ সম্পদের বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলে খনিজ সম্পদ নিরূপণের জন্য সুষম পদ্ধতিতে জরিপ চালানো।

(খ) আবিষ্কৃত জ্বালানী সম্পদের মজুদ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) একটি বেসরকারী কোম্পানীর সাথে হরিপুরে অবস্থিত দেশের একমাত্র আবিষ্কৃত তেল ক্ষেত্র উন্নয়নের জন্যে সম্পাদিত চুক্তির পর্যালোচনা।

(ঘ) বাণিজ্যিক জ্বালানী সম্পদের সুষম উন্নয়ন।

(ঙ) আমদানীকৃত জ্বালানীর উপর নির্ভরশীলতা কমানো।

(চ) জ্বালানী সম্পদের সুষম আঞ্চলিক বিভাজন নিশ্চিতকরণ।

(ছ) গ্রামীণ জ্বালানী পরিকল্পনা প্রণয়ন।

(জ) নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রযুক্তির সম্প্রসারণ।

(ঝ) দরিদ্র গোষ্ঠীর জন্য জ্বালানী সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প/ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঞ) জ্বালানী সংরক্ষণ ও জ্বালানীর সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ট) জ্বালানী উন্নয়ন কর্মসূচীতে বর্ধিত বিনিয়োগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঠ) বিদ্যুৎ খাতসহ সকল জ্বালানী উপ-খাতে সিষ্টেম লস হ্রাসকরণ।

(ড) জ্বালানী দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ নীতি প্রণয়নে সহায়তা প্রদান।

(ঢ) 'কাফকো'-এর সংগে 'বি সি আই সি'-এর গ্যাস বিক্রয় মূল্যের চুক্তির পর্য্যালোচনা।

(ণ) এনার্জী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের সময় পরিবেশগত বিষয় বিবেচনাকরণ।

(ত) এনার্জী সম্পর্কিত সংস্থাগুলোকে আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ।

(থ) মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ।

(দ) গবেষণা কর্মসূচী গ্রহণ।

(ধ) জাতীয় বিদ্যুৎ কমিশন গঠন।

(ন) জ্বালানী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ঃ

(ক) কৃষি মন্ত্রণালয়ঃ
কৃষি রেসিডিউ ও গোবর ইত্যাদি জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার এর ফলে মাটির উর্বরতা এবং উৎপাদনশীলতার উপর এর বিরূপ প্রভাব মূল্যায়ন।

(খ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ঃ
বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচীর মাধ্যমে জ্বালানী কাঠের সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ।

(গ) মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ঃ
সুষ্ঠু চাষাবাদের জন্য পশু শক্তির সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

(ঘ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ
এনার্জি সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদ উনয়ন এবং গবেষণা কর্মসূচীতে সহায়তা প্রদান।

(ঙ) অর্থ মন্ত্রণালয়ঃ
এনার্জি সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থাকে আর্থিকভাবে সচ্ছল রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন ঋণ দান শর্ত ও কর ব্যবস্থা নীতি পর্যালোচনা, নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রযুক্তি আমদানীর ক্ষেত্রে কর মওকুফ, ইত্যাদি।

টাস্ক ফোর্স ঃ পরিবহন সেক্টর

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	জনাব ওমর হাদী	বিভাগীয় প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন	আহ্বায়ক
২।	অধ্যাপক এ, টি, এম, জহুরুল হক	অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩।	জনাব এনামূল হক	পরিচালক (অর্থ) বি· আর· টি· সি·	ঐ
৪।	জনাব আতিকুল হোসাইন খান	প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, রেলওয়ে পরিকল্পনা পরিদপ্তর	ঐ
৫।	জনাব আতাউর রহমান	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	ঐ
৬।	জনাব সালেহ উদ্দিন	সদস্য(প্রকৌশল) বিআইডব্লিউটিএ	ঐ
৭।	জনাব কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী	প্রকৌশল উপদেষ্টা, এল· জি· ই· বি·	ঐ
৮।	জনাব এইচ· এ চৌধুরী	যুগ্ম–প্রধান (চঃদাঃ) পরিকল্পনা কমিশন	ঐ
৯।	জনাব আনোয়ার হোসেন	যুগ্ম–প্রধান, নৌ–পরিবহন মন্ত্রণালয়	ঐ
১০।	জনাব হারুন উর রশিদ	উর্ধতনঅর্থনীতিবিদ সড়ক ও জনপথ বিভাগ	ঐ
১১।	জনাব শাহাবুদ্দিন আহমেদ	উপ প্রধান (পরিকল্পনা) বেসামরিক বিমান, পরিবহণ ও পর্যটন	ঐ
১২।	জনাব এস, কে· চৌধুরী	সড়ক ও সড়ক পরিবহণ বিভাগ	ঐ
১৩।	জনাব এ· এফ· এম· ফজলে করিম	উপ পরিচালক, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	ঐ
১৪।	জনাব এ, জি, মাহমুদ	সভাপতি কার্গো ভেসেল মালিক সমিতি	ঐ
১৫।	জনাব আবদুল আউয়াল মিন্টু	সভাপতি, সমুদ্রগামী জাহাজ মালিক সমিতি	ঐ
১৬।	জনাব কে এম মাহমুদুর রহমান	লঞ্চ মালিক সমিতি	ঐ

পরিবহণ

১। উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ ঃ

বাংলাদেশের পরিবহণ খাত চারটি পরিবহণ ব্যবস্থার সমন্বয়ে গঠিত। তন্মধ্যে রেল, সড়ক এবং অভ্যন্তরীণ জলপথই সাধারণতঃ অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই প্রেক্ষিতে উক্ত তিনটি পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ এই প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা হইয়াছে। বিমান পরিবহণ সম্পর্কিত বিসয়সমূহ সংক্ষিপ্তভাবে বিবেচিতহইয়াছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ রেলপথ দ্বারা দেশের সবগুলি বিভাগীয় সদর ও প্রায় সবগুলি জেলা সদর সংযুক্ত আছে। মোট ২,৮৯২ কিলোমিটার রেলপথের ৬৬ শতাংশ মিটার গেজ। রেল পথের ৩৪ শতাংশ ব্রডগেজ যাহা দেশের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। দেশের সড়ক পথ জাতীয় মহা-সড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক, সংযোগ সড়ক ও স্থানীয় সড়ক সমন্বয়ে গঠিত। এই দুই শ্রেণীর পরিবহন ব্যবস্থা ছাড়াও সমগ্র দেশ ব্যাপী জালের মত ছড়াইয়া রহিয়াছে অভ্যন্তরীণ জলপথ। বর্তমানে নৌ-চলাচলযোগ্য জলপথের দৈর্ঘ্য ৬,০০০ কিলোমিটার যাহা শুষ্ক মৌসুমে ৫,৬০০ কিলোমিটার এ হ্রাস পায়। বিমান পরিবহণ মাত্র ৭টি জেলা সদরের মধ্যে সীমিত।

অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) পরিবহণ খাতের অবদান ১১ শতাংশের অধিক। এই খাত দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪ শতাংশ এবং পৌর এলাকায় শ্রমশক্তির ৪ শতাংশের কর্মসংস্থান প্রদান করে। মূল্য সংযোজন (Value Added) এর মানদন্ডে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবহণ খাতের অবদান বর্তমানে সর্বাধিক।

পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় বেশ কিছু নীতিমালা প্রণীত হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বাস্তবে এইসব নীতিমালার অধিকাংশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই।

এই সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, বিগত কয়েক দশকে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণে কিছু পরিবর্তন সাধিত হইলেও প্রতিটি পরিবহণ ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন অসমভাবে সংঘটিত হইয়াছে। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে রেলপথ দেশের মোট যাত্রী ও মালামালের শতকরা সত্তর ভাগ বহন করিত। পরবর্তী সময়ে রেলপথের যাত্রী ও মালামালের একটি বড় অংশ সড়ক ও অভ্যন্তরীণ জলপথে স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছে। পরিবহণ মাধ্যমগুলির বর্তমান বিভাজন হইতে দেখা যায় যে, দেশের মোট যাত্রী সংখ্যার ৪০ শতাংশ এবং মালামাল পরিবহণের ৫৯ শতাংশ সড়ক পথে পরিবহণ করা হয়। যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের প্রবণতার অভিক্ষেপণ হইতে প্রতীয়মাণ হয় যে, সড়ক পরিবহণ মাধ্যম ভবিষ্যতে উদ্ভুত যাত্রী ও মালামালের বৃহদাংশই বহন করিবে। ষাটের দশকের শেষ দিক হইতে বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যমের অবকাঠামো, যান-বাহন ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় পরিবর্তন সাধিত হইলেও পরিচালন দক্ষতা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি অর্জিত হয় নাই। পরিবহণ অবকাঠামো ব্যবহারের ধারা হইতে পরিলক্ষিত হয় যে, বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যমের সবগুলি "করিডর" যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয় নাই। যানবাহনের ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য হইতে আরও দেখা যায় যে রাস্তায় চলমান যানবাহনের মধ্যে বহু সংখ্যক যানবাহন রাস্তায় চলাচলযোগ্য নয়। পরিবহণ ব্যবহারকারীদের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি লইয়া এইগুলি যাত্রী ও মালামাল বহন করে। যানবাহনের আপাতঃ স্বল্পতার কারণে মাত্রাতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল বহন করা একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ব্যক্তি মালিকানাধীন সড়ক ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

২। চিহ্নিত প্রধান সমস্যাবলী ঃ

বিভিন্ন পরিবহণ উপ-খাতের সমস্যা বিভিন্ন ও বহুমুখী। তন্মধ্যে কতগুলি সাধারণ সমস্যা সার্বিক পরিবহণ খাতের পরিচালন দক্ষতা ও আর্থিক সাফল্যকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। টাস্কফোর্স যে সব সমস্যাকে সর্বাধিক জটিল সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছে সেগুলি হইতেছে ঃ

(ক) পরিবহণ খাতের পরিকল্পনা রীতির অসামঞ্জস্যতা (খ) আর্থিক বরাদ্দের অসামঞ্জস্যতা (গ) অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও নীতিকাঠামোর অনুপস্থিতি (ঘ) বহুমুখী ও খন্ডিত দায়িত্বভার এবং প্রচলিত আইন প্রয়োগের অভাব (ঙ) অকার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের অভাব এবং তাহাদের নিষ্ক্রিয়তা (চ) যথাযথ মূল্যনীতির অভাব (ছ) বিশৃংখল কর্মপরিবেশ (জ) প্রয়োজনীয় উপাত্ত ও পরিসংখ্যানের অভাব এবং (ঝ) অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে সম্পদ আহরণের যথাযথ প্রচেষ্টার অভাব।

৩। প্রধান সুপারিশসমূহ ঃ

টাস্ক ফোর্সের সুপারিশসমূহকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা সাধারণ সুপারিশমালা ও উপ-খাত সম্পর্কিত সুপারিশমালা। সাধারণ সুপারিশসমূহে পরিবহণ নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশ রাখা হইয়াছে। এই প্রেক্ষিতে বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনার পরিবর্তে একটি সমন্বিত পরিবহণ পরিকল্পনার সুপারিশ করা হইয়াছে। আরোও সুপারিশ করা হয় যে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলা বজায় রাখার নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। পরিবহণ খাতে উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণে রাজনৈতিক বিবেচনার পরিবর্তে অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিবেচনার উপর টাস্কফোর্স বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

এক খাত হইতে অন্য খাতে অর্থনৈতিকভাবে অযৌক্তিক সম্পদ স্থানান্তর প্রবণতা হ্রাস করার লক্ষ্যে, টাস্ক ফোর্স আন্তঃপরিবহণ মাধ্যমগুলির কার্যকারিতা যথাযথভাবে বিবেচনা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যমের পরিমিত মিশ্রণ ও প্রত্যেক উপ-খাতে আর্থিক সম্পদের ব্যবহার নির্ধারণ করার জন্য উপখাতগুলির পারস্পরিক ভূমিকা ও কার্যকারিতা বিবেচনা করিতে হইবে এবং পরিবহণ খাতে সম্পদ বরাদ্দের পদ্ধতি পরিবর্তন করিতে হইবে যাহাতে পরিবহণ অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধাদির ভারসাম্যহীন বিকাশ এড়ানো সম্ভব হয়। সম্ভাব্য উৎস হইতে, বিশেষতঃ স্থানীয় পর্যায়ের উৎস হইতে সম্পদ আহরণের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে সংগৃহীত সম্পদ স্থানীয় পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় করার সুপারিশ করা হয়। টাস্ক ফোর্স এমন একটি মূল্যনীতির সুপারিশ করে যাহাতে পরিবহণ সেবা প্রদানের ব্যয় মেটানো যায় এবং পরিবহণ খাতে লোকসান এড়ানোর প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ ন্যূণতম রাখা যায়।

টাস্ক ফোর্স মনে করে যে, পরিবহণ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও যানবাহন বিষয়ক আইন-কানুনসমূহ গুরুত্ব সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত এবং প্রয়োজনবোধে বিদ্যমান ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ সংশোধনপূর্বক নতুন আইন-কানুন প্রণয়ন করা যাইতে পারে। পরিবহণ ব্যবস্থার যথাযথ পরিচালনা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনা নীতি পর্যালোচনা ও সক্রিয় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ করা যাইতেছে। জ্বালানী সংকট, বায়ু-দুষণ এবং স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি এড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর টাস্কফোর্স গুরুত্ব আরোপ করে। এই লক্ষ্যসমূহ ছাড়াও টাস্কফোর্স পরিবহণের প্রতিটি উপ-খাতের জন্য কতিপয় সুপারিশ রাখিয়াছে।

৪। সুপারিশকৃত কর্মপরিকল্পনা ঃ

টাস্কফোর্স স্বল্প/মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কয়েকটি কর্মপরিকল্পনা সুপারিশ করিয়াছে। স্বল্প/মধ্যম মেয়াদী কর্মপরিকল্পনায় টাস্কফোর্স নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে ঃ

(ক) বিদ্যমান পরিবহণ সুবিধাদির সর্বাধিক ব্যবহার (খ) বিভিন্ন নির্বাহী সংস্থার মধ্যে ঘনিষ্ট সমন্বয় সাধন (গ) ব্যয় উপযোগ এবং পরিবহণ মাধ্যমগুলির আন্তঃখাত গুরুত্বের নিরিখে আর্থিক বরাদ্দ প্রদান (ঘ) রাজনৈতিক বিবেচনার ভিত্তিতে আর্থিক বরাদ্দ প্রদান বন্ধ করা (ঙ) সংস্কারকৃত ও অতি পুরাতন যানবাহণের ব্যবহার যথাসম্ভব বর্জন (চ) ব্যয় উদ্ধারের লক্ষ্যে যথাযথ পরিবহণ মূল্যনীতির প্রবর্তন (ছ) তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) এবং ঘণীভূত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) এর ব্যবহার (জ) পরিবেশের উপর প্রভাবের মূল্যায়ন (ঝ) পলি-জমাট ও নৌ-চলাচল সমস্যাদি দূরীকরণার্থে পদক্ষেপ গ্রহণ (ঞ) পরীক্ষামূলকভাবে স্বল্প ব্যয়ে নদী খনন কৌশলের প্রবর্তন।

দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনায় টাস্কফোর্স নিম্নোক্ত সুপারিশ রাখে ঃ

(ক) সড়কের লে-আউট ও নক্সা প্রণয়নে বিচক্ষণতার সহিত ও সতর্কভাবে জমির ব্যবহার (খ) পৌর এলাকায় যেসকল স্থানে সম্ভব ধীরগতি সম্পন্ন যানবাহনের জন্য পৃথক লেন নির্মাণ (গ) জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক নেটওয়ার্কে যেসব স্থানে সংযোগ নাই ইহাদের কার্যকারীতা ও সম্ভাব্য ব্যয় বিবেচনাপূর্বক ঐসব সংযোগ স্থাপন (ঘ) সম্ভাবনাময় পল্লী এলাকায় সংযোগকারী সড়ক নির্মাণ (ঙ) নদী খনন ছাড়াও সমনদী অববাহিকার দেশগুলি যথাঃ ভারত, নেপাল, ভূটান ও বার্মা এর মধ্যে নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা ও যৌথ গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা।

টাস্ক ফোর্স ঃ পরিবেশ

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	ডঃ ফসিউদ্দিন মাহতাব	প্রাক্তন মন্ত্রী	আহব্বায়ক
২।	ডঃ এম· কে· মুজেরী	পরামর্শক, পরিকল্পনা কমিশন	সমন্বয়কারী
৩।	ডঃ এম· আসাদুজ্জামান	বি·আই·ডি·এস·	সদস্য
৪।	ডঃ সেলিমুল হক	বি·সি·এ·এস·	ঐ
৫।	জনাব এম· এ·করিম	চীফ ইঞ্জিনিয়ার, পাবলিক হেলথ	ঐ
৬।	ডঃ জেড· করিম	কৃষি গবেষণা পরিষদ	ঐ
৭।	এস·এইচ·এম· আবুল বাসার	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	ঐ
৮।	ডঃ এম· ইউসুফ আলী	বি·সি·এ·এস·	ঐ
৯।	জনাব নূরুল আলম কাতেবী	প্রধান বন সংরক্ষক	ঐ
১০।	ডঃ খালিক রহমান	রসায়ন প্রকৌশল বিভাগ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	ঐ
১১।	ডঃ হারুনুর রশিদ	উপদেষ্টা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	ঐ
১২।	অধ্যাপক সামসুদ্দিন আহমেদ	অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়।	ঐ

পরিবেশ

উপক্রমনিকা

১,৪৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১১ কোটি ৫০ লক্ষ। পৃথিবীর অন্যতম প্রধান তিনটি নদী পদ্মা (গংগা), যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) এবং মেঘনার সম্মিলিত জল বিধৌত পলিতে গঠিত এই দেশ। জলবায়ু, পানি এবং মাটি কৃষি উৎপাদনের জন্য বিশেষ সহায়ক। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণে বাংলাদেশের প্রকৃতি প্রায় অপারগ এবং সে চেষ্টা পরিবেশের ওপর অনভিপ্রেত চাপ প্রয়োগ করে চলেছে। পরিবেশের ওপর চাপ প্রয়োগের অর্থ এক সর্বনাশা ধ্বংসের দিকে দেশকে নিয়ে যাওয়া। সেই ''শেষ'' সর্বনাশের দ্বারপ্রান্তে পৌছাবার আগে পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থে জীবন ও পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে নীতি নির্ধারণ করা খুবই জরুরী।

জনগোষ্ঠী ও অর্থনীতি ঃ

অর্থনীতি ঃ বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০০ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ এবং ২০৩০ সালে তা বেড়ে দাঁড়াবে ২৩ কোটি ২০ লক্ষে (২০২৫ সালে এন আর আর=১ ধরে)। বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলির একটি। (মাথা পিছু বর্তমান আয় ১৭০ মার্কিন ডলারের সম পরিমাণ) ১৯৯০ সালের বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট অনুযায়ী কৃষি এবং শিল্প খাতে (উৎপাদন খাত) প্রবৃদ্ধি ছিল অত্যন্ত সীমিত বর্তমানে কৃষি মোট জাতীয় আয়ের ৫০% এবং ৬০% কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। প্রবৃদ্ধির বর্তমান হার (৪%) বজায় থাকলে জাতীয় আয় দ্বিগুণ হতে সময় নেবে ৩৫–৪০ বৎসর। এ কারণে শতাব্দীর শেষ নাগাদ প্রবৃদ্ধির হার অন্ততঃ ৬–৮% এ উন্নীত করতে হবে। পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া নুন্যতম পর্যায়ে রেখে প্রাপ্ত সম্পদের সর্বাধিক সদ্ব্যবহার করতে হবে। উন্নয়নের এই দর্শণের কেন্দ্রবিন্দু হবে মানব–সম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির সংস্কৃতি সৃষ্টি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি ও প্রবণতা ঃ

১৯৫১, ১৯৬১, ১৯৭৪ এবং ১৯৮১ সালের আদশশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট লোক সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪·২১, ৫·৩৪, ৭·৬৪ এবং ৮·৯৯ কোটি। পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির হার হচ্ছে ২·৪১%, ২·৭৯% এবং ২·৩৫%। পরিকল্পনা কমিশনের উপাত্ত বিশ্লেষণে ১৯৯০, ২০০০, ২০১০ সালের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ১১·৪২, ১৩·৭৩ এবং ১৫·৪৫ কোটি (২০০৫ সাল নাগাদ এন আর আর=১ অর্জিত হবে ধরে)।

বিগত উচ্চ জন্মহারের কারণেই মোট জনসংখ্যা ৪৬% এর বয়স ১৫ বছরের কম এবং সন্তান উৎপাদন ক্ষম নারী মোট মহিলা জনসংখ্যার ৪৮·৪%। ১৯৯০তে কর্মক্ষম মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ৭·৩৩৭ কোটি ২০০০ সালে যা হবে ৯·৭২২ কোটি।

অনিয়ন্ত্রিত, অপরিকল্পিত নগরায়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধির এক ভয়াবহ দিক। ১৯৫১ সালের মোট সংখ্যার ৪·৩৩% মানুষ যেখানে নগরবাসী ছিল ১৯৮১ সালে তা এসে দাঁড়ায় মোট জনসংখ্যার ১৫·১৪%। স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষের ভীড়ে নগরবাসীর সংখ্যা আগামী শতাব্দীর প্রথম দিকে দাঁড়াবে ৪ কোটি যা মোট জনসংখ্যার ৩০% এবং ২০১০ সাল নাগাদ ৫·৫ থেকে ৬ কোটি।

বর্তমানে মোট শ্রমিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৩·৭১ কোটি। আগামী ২০ বছরে যা দাঁড়াবে ৬·৭৮ কোটিতে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগাতে হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই তড়িৎ গতি পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকরবে।

দারিদ্র্য ও আয় বন্টন ঃ উন্নয়নের পূর্বশর্ত দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। যেহেতু কৃষিতে খুব বেশী নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না সেহেতু সেবা ও শিল্প খাতকে জোরদার করে গড়ে তুলতে হবে। ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে উচ্চ স্তরের ১০% মানুষের আয় বৃদ্ধি হয়েছে সব চেয়েবেশী।

কর্মসংস্থান ও মানব সম্পদে উন্নয়ন ঃ খন্ডকালীন কর্মে সবাই ব্যাপৃত সে অর্থে পুরাপুরি বেকারের সংখ্যা তেমন ব্যাপক নয় কিন্তু প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব ব্যাপক (শ্রমজীবি মানুষের ৩৫·৪০%)। ১৯৯০ তে মোট শ্রমজীবি মানুষের সংখ্যা ছিল ৩·৭১৩ কোটি প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব পুরোপুরি বেকারত্বে পরিবর্তন করলে যার সংখ্যা দাঁড়ায় ১·৪০৬ কোটি। সাপ্তাহিক গড় রোজগার পুরুষের ক্ষেত্রে ২২৪·৯৬ এবং মহিলার ক্ষেত্রে ১২৪·৮৯ টাকা। একজন শ্রমজীবি মানুষ গড়ে ৩ জনের ভরণ পোষণ করেন।

পুঁজির অভাব প্রকট বলে জনশক্তিকে উৎপাদিকা শক্তিতে রূপান্তরের জন্য উপযুক্ত বিনিয়োগই আগামীতে উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য হবে। মানব-সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা এবং ট্রেনিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এখাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বরাবরই অত্যন্ত কম (১৯৮৬-৮৭) সালে ছিল জাতীয় রাজস্বের ১·৪২% অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে যা অন্ততঃ ৪·৪%) কিন্তু আগামীতে তা বাড়ান প্রয়োজন হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ ঃ

ভূমি সম্পদ ও কৃষি পরিবেশ বিভাগ ঃ প্রাকৃতিক সম্পদ হতে পারে প্রাণহীন যা প্রাণপূর্ণ ব্যবহার করে মানুষ তার খাদ্য, কাঁচামাল এবং শক্তি যোগান নিশ্চিত করে। অর্থনৈতিক অর্থে প্রাকৃতিক সম্পদকে ভাগ করা চলে দু'ভাগে যা নতুন করা চলে এবং যা ব্যবহারে নিঃশেষিত হয়ে আসে।

বাংলাদেশে জমি ব্যবহার এবং কৃষি উন্নয়নে যে সব প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশেষভাবে সম্পৃক্ত হচ্ছে ঃ

(১) ভূমি প্রকরণ (২) মৃত্তিকা গঠন (৩) জলমগ্নাবস্থা এবং (৪) জলবায়ু।

বাংলাদেশের প্রধানতঃ ভূগঠন প্রক্রিয়ার চতুর্থ যুগের স্তরসমূহের পর পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদী বাহিত পলির আস্তরণে গঠিত। ভূ-গঠনের বাহ্যিক ও অন্তর্গঠনের দিক থেকে বাংলাদেশকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। (১) বন্যা বিধৌত সমতল (২) স্তর বিশিষ্ট চত্বর অঞ্চল (৩) পাহাড়ী এলাকা। নদী বিধৌত সমতল মোট জমির ৭৯%। স্তর বিশিষ্ট চত্বর অঞ্চল ৮·৩% এবং পাহাড়ী এলাকা ১২·৭%।

বাংলাদেশে ভূমি বিচলন ও ভূমির অধোগমন এক সাধারণ ঘটনা। অধোঃগমন প্রক্রিয়া সৃষ্ট অঞ্চলসমূহ সুরমা অববাহিকা, ফরিদপুর নিম্নাঞ্চল, চলনবিল, ঢাকা ও খুলনা-সুন্দরবন নিম্নাঞ্চল। অধোঃগমনের হার বাৎসরিক ০·৬ মিঃমিঃ থেকে ৫·৫ মিঃমিঃ সুরমা অববাহিকার মধ্যভাগে ২০ মিঃ মিঃ।

বন্যার প্রভাব ও জমির উচ্চতার উপর নির্ভর করে সমতল ভূমির ফসলের ধরন নির্ধারিত হয়। জলমগ্নতার শুরু ও শেষ, সর্বোচ্চ বন্যার সময় জলের গভীরতা এবং অপ্রত্যাশিত সূচনা ও উপসংহার ও উচ্চতম বন্যার ঝুঁকি হিসেব করে কৃষক তার ফসলের ধরন ধারণা নির্ধারণ করেন। চাষী স্তরে কয়েক সেন্টিমিটার উচ্চতার তারতম্য ফসলের ধরন ও ব্যবস্থাপনা প্রভাবিত করতে পারে।

বাংলাদেশ হিমালয়ের দক্ষিণাঞ্চলে বিষুবীয় মৌসুমী অঞ্চলে অবস্থিত। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, পরিমাণ ১২৫০-৩৭০০ মিঃমিঃ (জুন-সেপ্টেম্বর)। বর্ষাপূর্ব (মার্চ-মে) বৃষ্টিপাত ২০০-৯০০ মিঃমিঃ ও বর্ষাপরবর্তী (অক্টোবর-নভেম্বর) পরিমাণ ১০০-৩০০ মিঃমিঃ। শীতকালে (ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী) বৃষ্টিপাত ৯০ মিঃমিঃ এরও কম।

বৃষ্টিপাতের মত তাপমাত্রাতেও ঋতুভিত্তিক বিভিন্নতা দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে সাধারণভাবে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০·৫-৩৬·৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস বেড়ে যা ৩৭·৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত যেতে পারে (এপ্রিল, মে) এবং কদাচ তা ২১·৭° সেঃ নীচে নামে। শীতকালে তাপমাত্রা সাধারণভাবে ১০ সেঃ এর নীচে আসতে দেখা যায় না তবে পার্বত্য চট্টগ্রামে, সিলেটে এবং উত্তর বংগে তাপমাত্রা ১০° সেঃ এর নীচে নেমে আসে।

বাংলাদেশে তাপমাত্রা সারাবছর ফসল উৎপাদনের উপযোগী। এ কারণে জমির আর্দ্রতা ফসল উৎপাদনের সীমারেখা স্থির করে। ফসল উৎপাদনের বৃষ্টি নির্ভর কাল তিনটি। বর্ষাপূর্ব বর্ষা এবং শীতের ফসল। কৃষি ক্ষেত্রে দুই

ধরণের তাপ বিভাগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান বিভাগসমূহ শীতল সময়ের বিস্তার ও উপবিভাগসমূহ অতি তীব্র গ্রীষ্মের সময় বিভাজন নির্দেশ করে। মোট ৫টি ভাগে শীতল সময়ে (১০° সেঃ নীচে) স্থায়িত্ব নির্দেশ করা যায়। বৎসরে গড়ে কতদিন তাপমাত্রা ৪০° সেঃ ছেড়ে যায় তা উপ-বিভাগ হিসাবে চিহ্নিত।

নদী ব্যবস্থা ও পলি প্রবাহঃ বিশ্বের তিনটি প্রধান নদী পদ্মা (গংগা), যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) ও মেঘনার মিলিত স্রোত বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে নিম্ন মেঘনা নাম ধারণ করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হচ্ছে। এ ছাড়াও রয়েছে ৭০০ ছোট বড় নদী। এ সব নদ নদীর মোট দৈর্ঘ্য ২২,১৫৫ কিঃমিঃ। প্রধান নদী ৩টির অববাহিকার মোট আয়তন ১,৭৫৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার যার ৬২% ভারতে, ১৮% চীনে, ৮% নেপালে এবং ৪% ভুটানে। বাকী ৮% মাত্র বাংলাদেশের ভিতরে।

গংগা নদীর ২০ বৎসরের সর্বোচ্চ নির্গমণ হার্ডিন্স সেতুর কাছে প্রতি সেকেন্ডে ৭১,৪০০ মিটার কিউব। বাহাদুরাবাদে ব্রহ্মপুত্রের ২০ বৎসরের সর্বোচ্চ নির্গমণ প্রতি সেকেন্ডে ৮০,৮০০ মিটার কিউব এবং ভৈরব বাজারে মেঘনা নদীর ২০ বৎসরের সর্বোচ্চ ১৯,১০০ মিটার কিউব।

বর্তমানে গংগা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মিলিত জলস্রোত বিশাল পরিমাণ পলি বহন করে নিম্নাঞ্চলে নিয়ে আসে (বৎসরে প্রায় ১০ থেকে ১৪·৮ কোটি টন) যা পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ গঠনে এখনও সক্রিয়। প্রতি বৎসর বন্যা প্লাবিত অঞ্চলে পলির একটি অংশ তলানি হিসাবে সৃষ্টি করে। মনে করা হয় এই প্রক্রিয়ায় এক সুক্ষ্ম ভারসাম্যের ভিতর দিয়ে কাদাস্তরের জমাট বাঁধন ও ভূ-কম্পন সৃষ্টি অধো গমনের বিরুদ্ধে ভূমিতলের উচ্চতা বৃদ্ধি করে যা সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির সংগে (বর্তমানে প্রতি শতাব্দীতে ১০ সেঃমিঃ) সংগতিপূর্ণ।

পানি সম্পদ ঃ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ, মৎস্যচাষ, নৌ-চলাচল, লবণাক্ততা প্রতিরোধ, মানুষ, জীব ও উদ্ভিদ জগতের জন্য পানির প্রয়োজন। পানি সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে নদী প্রবাহ। বাংলাদেশের নদীসমূহ গড়ে প্রতিদিন ২৯৮ কোটি ঘন মিটার পানি বঙ্গোপসাগরে নিয়ে যায়। ১৯৯০ সালের উপাত্ত অনুযায়ী এই প্রবাহ সেকেন্ডে অগাষ্টে ৮৯,০০০ ও ফেব্রুয়ারীতে ৫৭১৪ ঘন মিটার। ভারত থেকে আগত পানিই বাংলাদেশের নদীসমূহের ৯০% যোগান দেয়। শুকনা মওসুমে গংগা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মিলিত প্রবাহ দেশের মোট জল প্রবাহের ৮৫% ভূ-পৃষ্ঠের পানির অন্যান্য উৎস হচ্ছে নদী-নালা, খালবিল, হাওর-বাওর ও বিলসমূহ এবং মনুষ্য সৃষ্টি পুকুর, দীঘি ও কাপ্তাই হ্রদ। এই পানির মোট পরিমাণ ১১১·৫ কোটি ঘনমিটার।

ভূ-গর্ভস্থ পানি অন্যতম প্রধান উৎস। মহাপরিকল্পনা সংস্থার হিসেব অনুযায়ী ২০১০ সাল নাগাদ গৃহস্থালী ও শিল্পের প্রয়োজনে এই উৎস মোট ৩২৪·৮ কোটি ঘন মিটার পানির যোগান দেবে। ভবিষ্যত প্রয়োজনে তখনও মওজুতের পরিমাণ হবে ১১২২·৫ কোটি ঘন মিটার।

২০১০ সাল নাগাদ (পানি উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য) সেচ উপযোগী পানির সেচ সুবিধার ৬০% এবং অর্থনৈতিকভাবে সম্ভব বন্যা নিয়ন্ত্রণের ৬৭% কাজ সম্পন্ন হবে।

শক্তি সম্পদ ও তার ব্যবহার ঃ শক্তি ব্যবহারের দিক থেকেও পৃথিবীর ৪০টি দরিদ্রতম দেশের ভেতর (চীন ও ভারত বাদে) বাংলাদেশের স্থান নীচে। বাণিজ্যিক জ্বালানী শক্তি ব্যবহারের ২৬·৯% ও প্রচলিত গাছ-গাছড়া বাকী ৭৩·১% জ্বালানীর যোগান দেয় (১৯৯০)।

দেশে ব্যবহৃত শক্তির ৬৪·৭৭% গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত হয় এবং তার ৮১% আসে গাছ গাছড়া ও কৃষি বর্জ্য থেকে। শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত শক্তির ৬৯·৬% আসে গাছ গাছড়া থেকে। আমদানীকৃত বাণিজ্যিক শক্তির ৮৫% পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ এবং বাকী কয়লা।

প্রাকৃতিক গ্যাস দেশে প্রাপ্ত প্রধান বাণিজ্যিক জ্বালানী। কয়লা, পিট ও তেল আবিস্কৃত হয়েছে। গ্যাসের আনুমানিক সম্পদ ১৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ইতিমধ্যে ১·৩৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্ধার সম্ভব ৩০ মিলিয়ন ব্যারেল তরলীকৃত গ্যাসের ২·৫ মিলিয়ন ইতিমধ্যে ব্যবহার হয়েছে। ১০টি গ্যাস ক্ষেত্র থেকে দৈনিক গ্যাস উত্তোলনের পরিমাণ ১০৭০ মিলিয়াতন মিলিয়ান ঘনফুট। উত্তোলিত মোট গ্যাসের ৪৪·৭% ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ

উৎপাদন, ৩৬·৭% সার কারখানায়, ১০·২% অন্যান্য শিল্প কারখানা, ২·১% বাণিজ্যিক ও ৬·৩% গৃহস্থালী প্রয়োজনে। বর্তমান হারে ব্যবহৃত হলে আগামী ২০১০ সাল নাগাদ মোট মওজুদ প্রায় শেষ হয়ে যাবে তবে নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। দেশে অবস্থিত তেল শোধনাগারের ক্ষমতা বাৎসরিক ১০ লক্ষ টন। ২০০০ সাল নাগাদ প্রয়োজন বেড়ে দাঁড়াবে ২৭ লক্ষ টনে।

গাছ–গাছড়া থেকে প্রাপ্ত শক্তির প্রধান উৎস হচ্ছে ফসলের উদ্বৃত্ত, জ্বালানী ও কুটির শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খাদ্য ও জ্বালানীর প্রয়োজনে পরিবেশের ওপর চাপ পড়ছে তাতে বনাঞ্চল উজাড় হবার মত ঘটনা ঘটতে চলেছে। শিকড়সহ গাছ উপড়ে ফেলা এবং গোবর জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের ফলে জমিতে জৈব সারের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে।

১৯৯০ সালের শিল্প পরিকল্পনা প্রকল্প থেকে দেখা যায় যে জৈব জ্বালানীর ৬০·৫%ফসল উদ্বৃত্ত, ২২·৫% জ্বালানী কাঠ এবং ১৪% গোবর। জৈব জ্বালানীর ১৮·৫% ব্যবহৃত হয় শিল্পে। ১৯৯০ সালে ২·৮৮১ কোটি টন কৃষি বর্জ্য জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সরকারী এবং বসতি বনাঞ্চলের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৪ লক্ষঃ ৭·৪ লক্ষ একর যা জ্বালানী কাঠের ১২ এবং ৭৮ শতাংশ সরবরাহ করে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ—সাইক্লোন, বন্যা, খরা ও কালবৈশাখী ঝড় ঃ

তথ্য উপাত্ত থেকে দেখা যায় পৃথিবীর ভয়াবহতম সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস বঙ্গোপসাগরেই সৃষ্ট হয়। বাংলাদেশের ৪৮০ কিঃমিঃ উপকূল প্রতি বছরই ছোট বড় সাইক্লোনের শিকার। ১৯৭০ সালে প্রলয়ংকরী সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস ৩ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ ছিল। ৭৫% সাইক্লোন ১৫ই এপ্রিল থেকে ১৫ই জুন এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে ঘটে থাকে। ১৮৯১ সাল থেকে সাইক্লোন উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এর তীব্রতা ও পৌনঃপুনিকতা মোটামুটিভাবে ক্রমবর্ধমান।

বন্যা বাংলাদেশ ঋতুর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। চার ধরণের বন্যা নির্দেশ করা যায়। যথাঃ অতর্কিত, বৃষ্টিজনিত, জলোচ্ছ্বাসজনিত এবং মৌসুমী বন্যা। প্রধান নদীসমূহের দুইকূল প্রভাবিত করে বিস্তীর্ণ সমতল জলমগ্ন করে। ১৯৮৮ সালের বন্যা উপমহাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অস্বাভাবিক বৃষ্টি এবং দুই প্রধান নদীর সর্বোচ্চ অঞ্চলে একই সময়ে সংগঠিত হবার ফলে দেশের ৯০·০০০ বর্গকিলোমিটার জায়গায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ফলে ১১ কোটি মানুষ কম বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৬ টন ফসলের ক্ষতি হয়। স্কুল, ঘরবাড়ী, গরু, ছাগল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সড়ক ও জনপথ, রেলপথ ও সেতু ধ্বংস প্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

খরার প্রতিক্রিয়া নিঃশব্দ কিন্তু দীর্ঘ। ১৯৭৫ সালের খরায় ৪৭% জায়গা ও ৫৩% মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছোট বড় খরা– কবলিত সনসমূহ হচ্ছে ১৯৫১, ৫৭, ৫৮, ৬১, ৬৬, ৭৯, ৮১, ৮২ এবং ৮৯। ১৯৮০ সালের রাজশাহী, যশোর, কুমিল্লা এবং সিলেটে উচ্চ ফলনশীল পুন পুনরোপিত আমনের ফলনের ওপর খরার প্রভাব পরীক্ষা করে দেখা গেছে খরাজনিত কারণে শস্যহানির পরিমাণ যথাক্রমে ৫২·৪%,৪৯·২%,১৩·২% ও ৮·২%।

কালবৈশাখী ঝড় বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলে ব্যাপক এবং ৭৬% ক্ষেত্রে তা বর্ষার আগে সংঘটিত হয়। ১৯৬৯ সালের ১০ই এপ্রিল ও ১৯৮৯ সালের ২৬শে এপ্রিলের যথাক্রমে ঢাকা ও মানিকগঞ্জের ভয়াবহ টর্নেডো বহুলোকের প্রাণহানী ও সম্পদের ধ্বংসের জন্য দায়ী।

বর্তমান অবস্থা ঃ

কৃষি ফসল ঃ ১৯৮৯–৯০ সালে মোট বিগত সালগুলিতে হতাশাব্যঞ্জক জাতীয় উৎপাদনের ৪০% এবং শ্রম শক্তির ৫৫% নিয়োজিত ছিল কৃষিতে। প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যসমূহ যেমন আয় ও কর্মের সুবিধা, দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন এক ব্যাপক বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।

আবাদযোগ্য ৯০·৩৩ লক্ষ হেক্টর জমি ব্যবহারে বিগত বহু বছরে (২০ বছর) বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। প্রায় ১০০ ধরনের ফসল উৎপাদিত হয় যার ৩২টি ৯৬% জায়গা জুড়ে থাকে। বর্ষা রবি মৌসুমে ধান, পাট, ইক্ষু,

তেল বীজ, আলু, ডাল, শাক–সবজী ও ফলমূল উৎপাদিত হয়। বর্ষা মৌসুমে আবাদী জমির পরিমাণ ০·৯০৫ কোটি হেক্টর এবং রবি মৌসুমে ৩৫ লক্ষ ৪ হাজার হেক্টর। বিগত বহু বছরে (২০) বছর উৎপাদিত ফসলের প্রকারভেদে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। তিন ধরনের ধানের ভেতর পরিমাণ ও মূল্যবিচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফসল হচ্ছে আমন এবং তারপর বরো।

ধান উৎপাদন কৃষিখাতকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে আছে। বর্ষা মওসুমের বিশেষ আবহাওয়ার কারণে অন্ততঃ সেই সময়ে উৎপাদনে কোন পরিবর্তন হবার সম্ভাবনা নেই বলেই মনে হয়। ১৯৭২–৭৩ ও ১৯৮৬–৮৭ সালের ভেতর প্রধান শস্য ধান ও গমের উৎপাদন বৃদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সেচ এবং উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ ব্যবহার এর অন্যতম কারণ। ৭০ এর দশকে খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩%, ৮০–র দশকে যা কমে দাঁড়ায় ২·২%য়ে। কারণ হচ্ছে সেচ, সার ও উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজের ধীর সম্প্রসারণ। সেচ, সার ও বীজ প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তার খাদ্য উৎপাদনে বিরাট পরিবর্তন সাধন করতে পারে। ১৯৬১ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত সেচ জমির পরিমাণ আবাদযোগ্য জমির ২২%য়ে এসে পৌছেছে।

ভূ–গর্ভস্থ পানি থেকে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং ভূ–পৃষ্ঠস্থ পানি থেকে দক্ষিণ কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করার বিশাল সম্ভাবনা বিরাজমান। এলক্ষ্যে বেশ কয়েকটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। শস্য উৎপাদনে রাসায়নিক সার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ৬০য়ের দশক থেকে শুরু হয়ে ক্রমবর্ধমান হারে সারের বর্তমান ব্যবহারের পরিমাণ ১৭·৩ লক্ষ টন। প্রধান সারসমূহ হচ্ছে ইউরিয়া, ট্রিপল সুপার ফসফেট অব পটাশ এবং জিপসাম। প্রতি বছর ৪–১৪% ধান কীট আক্রমনে ধ্বংস হয়। এ কারণে কীট নাশকের ব্যবহার বাড়ছে। ১৯৮২–৮৩ সালের তুলনায় ৮৬–৮৭তে কীটনাশক ব্যবহারের পরিমাণ ছিল দ্বিগুণ। সার কীটনাশকের অযোগ্য ব্যবহার দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে (জমির উৎপাদিকা শক্তিতে)।

এফ, এ, ওর সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যায় জমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমক্ষীয়মান। কারণ হিসেবে নিবিড় চাষ, সারের অবিবেচক ব্যবহার, সেচ–পানির অতিরিক্ত প্রয়োগ ও জৈব সারের প্রায় সম্পূর্ণ অপসারণকে নির্দেশ করা হয়েছে। জমি ব্যবহারের অন্যান্য সমস্যাসমূহ হচ্ছে ভূমি ধ্বংস. জলবদ্ধতা, অদক্ষ জমি ও পানি ব্যবস্থাপনা, লবণাক্ততা। পিট, কয়লা ও হাওর অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা ক্ষীণ।

আবাদযোগ্য জমির ৩০% উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত। মোট ২৮·৫ লক্ষ হেক্টর উপকূলীয় জমির ৮·৩ লক্ষ একর আবাদযোগ্য জমি। লবণাক্ততার পরিমাণ ফসল উৎপাদন প্রভাবিত করে। লবণাক্ত জমিতে ধান, ইক্ষু, ডাল, তৈল বীজ, মশলা, সবজী, ফলমূল উৎপন্ন হয় তবে অঞ্চলভেদে উৎপাদনের পরিমাণ ভিন্ন হয়। এ ছাড়া ৮৭,৩০০ হেক্টর জমিতে লবণ পানির চিংড়ি চাষ হয়।

মৎস্য চাষ ঃ মৎস্য খাত জাতীয় উৎপাদনের ৩% মূল সংযুক্ত কৃষি পণ্যের ৮% প্রাণী প্রোটিনের ৭১% সরবরাহকারী, বৈদেশিক মুদ্রার ১১% আমদানীকারী ও ১১ লক্ষ মানুষের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থাকারী খাত। বর্তমান বাৎসরিক উৎপাদন ৮·৩ লক্ষ মেট্রিক টন।

মৎস্য আহরিত হয় ৪টি উৎস থেকে। লোনা পানি, বদ্ধ জলাশয়ে উৎপাদিত, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আহরিত ও জেলে আহরিত সামুদ্রিক মৎস্য। বিভিন্ন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের ফলে বন্যা বিধৌত সমতলের মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র কমে আসছে এবং প্রজনন প্রক্রিয়ায় উজান–ভাটায় গমনাগমনের ক্ষণ অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে উৎপাদন কমে আসছে (২% হারে)। অপরদিকে বদ্ধ জলাশয়ে উৎপাদিত মৎস্যের প্রবৃদ্ধি ১০·৭%। তেলাপিয়া, নাইলাটিকা, বিভিন্ন ধরনের কার্প, সরপুটি ইত্যাদির চাষ বেশ কিছুদিন হল সূচিত হয়েছে।

এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ও বহু বিচিত্র প্রজাতির জলজপ্রাণী। অর্থনৈতিক গুরুত্ব এর ৫৫ জাতি ও ২৬০ প্রজাতির চিংড়ি, ৫০ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ ও ২৫ প্রজাতির কাছিম ও কচ্ছপের উল্লেখ দেখা যায়। ৪৭৪ প্রজাতির পাখনাযুক্ত সামুদ্রিক মাছের অন্ততঃ ৬৫টি প্রজাতির মাছ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আহরিত হতে পারে। এ ছাড়াও ১০ প্রজাতির প্রসবিনী ঝিনুক, ৭ প্রজাতির খাবার ঝিনুক, ১১ প্রজাতির সামুদ্রিক ও ৪ প্রজাতির মিঠা পানির

কাঁকড়া পাওয়া যায়। এ ছাড়াও রয়েছে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ, কুমীর, ঘড়িয়াল, ডলফিন, পরপইস, হাংগর, হাংগরসহ জলজপ্রাণী সম্পদ।

বন্যা প্লাবিত সমতল ভূমির পরিমাণ ছিল ৪৩ লক্ষ হেক্টর (৮৭–৮৮) এর ভেতর ১৪·৫ লক্ষ হেক্টর এলাকায় সাংবাৎসরিক জলমগ্ন থাকে এবং বাকী ২৮·৩ লক্ষ হেক্টর বছরে ৪/৫ মাস পানি থাকে। অভ্যন্তরীণ শান্তিপূর্ণ এলাকার পরিমাণ নিম্নরূপ (৮৭–৮৮) নদী, নালা মোহনাঞ্চল (১,০৩১,৫৬৩ হেক্টর) বিল ১১,১৬১ হেক্টর, হাওর (৫,৪৮৮ হেক্টর), কাপ্তাই হ্রদ (৬৮,৮০০ হেক্টর) পুকুর ও দিঘী (১৪৬,৮৯০ হেক্টর)। চিংড়ী খামারের বর্তমান আয়তন ৯৪,০১০ হেক্টর।

পশু সম্পদ ঃ গৃহপালিত পশু সম্পদ যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, মুরগী, হাঁস, কৃষি ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। গবাদিপশু লাংগলে শক্তিযোগায়, গাড়ী টানে, তেল বীজ ও ইক্ষু মাড়াইতে শক্তি জোগায়। মানুষের খাদ্য হিসাবে মাংস ও দুধের যোগান দেয় এবং চামড়া, শিং ও হাড় শিল্পের কাঁচামাল ও রপ্তানীর জন্য ব্যবহৃত হয়।

১৯৮৩–৮৪ সালের পশু সম্পদ জরিপে দেখা যায় দেশে ২·১১৮ কোটি গরু, ৪·৬০ লক্ষ মহিষ, ৮৩·৩ লক্ষ ছাগল, ৪·৯০ লক্ষ ভেড়া, ৬,৬৩৭ কোটি মুরগী, ১·২০ কোটি হাঁস বর্তমান। গরু, মহিষের ৫০% লাংগল ও গাড়ী টানার কাজে নিয়োজিত। কৃষি কাজের নিবিড় সময়ে লাংগল টানার পশুর অভাব প্রকট। ১৯৮৫ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায় অভাবের এই পরিমাণ কুষ্টিয়ায় সর্বোচ্চ ৭১·৫% এবং খুলনায় ৫৬·৮%। কলের লাংগল প্রবর্তনই এই সমস্যা সমাধানের পথ। বিভিন্ন সমীক্ষকের বিভিন্ন জরিপ থেকে দেখা যায় দেশে পশু খাদ্যের অভাব প্রকট (খড় ও ভূষি)। মাথা প্রতি খড়ের প্রাপ্তি কমে গেছে খড়ের অন্যান্য ব্যবহারের কারণে (জনসংখ্যা বৃদ্ধি)। দেশে উৎপাদিত তেল বীজ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ খৈল বা ভূষি পাওয়া যায় না উপরন্তু যে পরিমাণ ভোজ্য তেল আমদানী করা হয় সে পরিমাণ খৈল থেকেও পশু সম্পদ বঞ্চিত হয়।

মাংস, দুধ, ডিম, ইত্যাদিতে সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

বন সম্পদ ঃ বন বিভাগের অধীনে ১১·৫ লক্ষ একর পাহাড় বনাঞ্চল, ১৪·৫ লক্ষ সুন্দর বনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, ২·৫ লক্ষ একর উপকূলীয় নব–সৃষ্ট ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল এবং ৩ লক্ষ একর সমতলের শাল বন। ৩০·৫০ শতাংশ জায়গায় কোন বৃক্ষাচ্ছাদন নেই। ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন রয়েছে আরও ৩২·৫ লক্ষ একর বনভূমি।

১৯৬০ ও ১৯৮০ সালের দু'টি সমীক্ষা থেকে জানা যায় সুন্দর বনে গাছের পরিমাণ অর্ধেকে নেমে এসেছে। লোকালয় বনাঞ্চল বৃক্ষ সম্পদের সবচেয়ে বড় উৎস। মোট বৃক্ষাচ্ছাদিত জায়গার পরিমাণ ৭·৪২ লক্ষ একর। গ্রামাঞ্চল বনভূমির এই উৎস বাৎসরিক ৭·৭৭ কোটি ঘনফুট জ্বালানী কাঠ ও ১·৯০ কোটি ঘনফুট আসবাবপত্র তৈরীর কাঠ সরবরাহ করে। পক্ষান্তরে সরকারী বনাঞ্চলের সরবরাহের পরিমাণ (৮৭–৮৮) ২·৬১ বাঁশ, ৭·৯০ লক্ষ টন গোলপাতা, ৪·৯২ লক্ষ পাউন্ড মধু, ১·৬৪ লক্ষ পাউন্ড মোম।

কৃষি বর্জ্য ও গোবর জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত না হলে জ্বালানী কাঠের প্রয়োজন আরও বাড়ত। ৮৪–৮৫ সালের সমীক্ষা থেকে দেখা যায় ২·০৩ কোটি টন কৃষি বর্জ্য জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (এর ভিতর ১·৩৯ কোটি টন ধানের খড় রয়েছে যা ১·৪৮ কোটি গরুর এক বছরের খড়ের প্রয়োজনের সমান)। একই ভাবে ৭৫ লক্ষ টন গোবর জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত না হলে তা জমির জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারত।

প্রাণ বৈচিত্র্য ঃ প্রাণ প্রজনন বৈচিত্র্য, প্রজাতি বৈচিত্র্য ও পরিমন্ডল ব্যবস্থা বৈচিত্র্য বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিকট ভবিষ্যতের প্রয়োজনে প্রজাতি এবং পরিমন্ডল বৈচিত্র্য এবং দূর ভবিষ্যতের প্রয়োজনে প্রাণ প্রজনন বৈচিত্র্য কেবল এ দেশের জন্য নয় বরং মানব জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন প্রজাতির গাছ–পালা, জীবজন্তু আমাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হয়। ঔষধ প্রস্তুতে প্রয়োজন জীবাণুর। বন ও বনপরিবেশ পরিমন্ডল বৈচিত্র্যের উদাহরণ। প্রজাতির বিলুপ্তি প্রাণ প্রজনন গুণেরও বিলুপ্তি ঘটতে পারে যা আগামীতে কোন দিনই পূরণ করা সম্ভব নয়। প্রজাতি বিলুপ্তির কারণে আমরা এমন গাছ–গাছড়া হারিয়ে

ফেলতে পারি যা ভবিষ্যতে চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারত। প্রাণ বৈচিত্রের দিক থেকে নিম্নলিখিত অঞ্চল ও ক্ষেত্র আমাদের বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল (সুন্দর বন ও চকোরিয়া বন), অন্যান্য উষ্ণ মন্ডলীয় বনাঞ্চল (পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, মধুপুর জংগল), জলাভূমি (বিশেষতঃ হাওর অঞ্চল), কোরাল দ্বীপসহ উপকূলীয় অঞ্চল এবং কৃষি উদ্ভিদ।

যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ বাংলাদেশ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান খাতসমূহ হচ্ছে জলপথ, রেলপথ, সড়কপথ, অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক বন্দর, আভ্যন্তরীণ ও অন্তর্জাতিক বিমান পথ।

বাংলাদেশে ১৪,০০০ কিঃমিঃ পাকা রাস্তাসহ মোট রাস্তা ১·৫৫ লক্ষ কিঃমিঃ, ২৭৪৬ কিঃমিঃ রেলপথ, সব ঋতুতেই নাব্য এমন জলপথ ৫২০০ কিঃমিঃ ও বর্ষা মওসুমে নাব্য জলপথ ৮৩৭২ কিঃমিঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কিত। জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির সংগে কৃষি ও অন্যান্য পণ্যের চলাচল ও যাত্রী চলাচলের সংখ্যা বাড়তে পারে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন এ সব বিবেচনার ওপর নির্ভর করা দরকার।

মাল ও যাত্রী পরিবহনে জল ও রেলপথে খরচা কম হলে এ দু'টি খাতের উন্নয়ন অপরিহার্য। তাহলে ২০০০ সাল নাগাদ সড়ক পথের মাল বহন ৬৩% থেকে নামিয়ে ৫০% এবং জলপথ ও রেল পরিবহনের ক্ষমতা বর্তমানের যথাক্রমে ২৫% ও ১২% থেকে ৩৫% ও ১৫% উন্নীত করা সম্ভব।

মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে দেশী নৌকার গুরুত্ব এখনও অপরিসীম। এখনও ধান, চাল, পাট, লবণ, বালু, সিমেন্ট, ইট, পাথরের মত গৃহ নির্মাণ সামগ্রী, ঘরদোর, আসবাবপত্রের কাঠ ও জ্বালানী কাঠ দেশব্যাপী চলাচল করে। সাম্প্রতিককালে শ্যালো ইঞ্জিন সংযোজনের ফলে ছোট ছোট দেশী নৌকায় এক বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে পানি সরবরাহ, ময়লা পানি নিষ্কাশন ও আবর্জনা দূরীকরণ ঃ ১৯৯০ সালের হিসেব অনুযায়ী ৭৮% মানুষ গ্রামে বাস করে। রোগ–ব্যাধি প্রতিরোধে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ বহুকাল যাবত গ্রামাঞ্চলের নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে আসছে। অর্থনৈতিক ও কারিগরী কারণে অগভীর নলকূপ দীর্ঘদিন ধরে গ্রাম বাংলার নিরাপদ পানীয় জলের উপর উৎস।

১৯৯০ সালের শেষ নাগাদ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ ৪২৫টি উপজেলায় ৭,১৮,২০১টি নলকূপ স্থাপন করেছে। এ সমস্ত উপজেলার ৮·৯৫ কোটি মানুষের ভেতর ৬ কোটি মানুষ এ সুবিধার ফল ভোগ করেছে। কৃষির পানি সরবরাহের কারণে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। ১৯৯০ সালের শুক্না মওসুমে পানির স্তর নেমে যাবার ফলে ১,০০,০০০ নলকূপ অকেজো হয়ে পড়ে। এ সমস্যা মোকাবেলায় গভীরে প্রোথিত হস্তচালিত পাম্প এর ব্যবহার শুরু হয়েছে।

উপকূলীয় নোনা পানির অঞ্চলে পানি সরবরাহের জন্য ৬নং পাম্প সম্বলিত গভীর নলকূপ (৮৪টি উপজেলার ১ কোটি মানুষ এর ওপর নির্ভরশীল), ভূপৃষ্ঠস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিঠাপানির ভান্ডারে অগভীর নলকূপ, নিশ্চিত মিঠা পানি পানির পকেট বালু ছাঁকুনী প্রযুক্তি বহুল ব্যবহৃত। দ্রবীভূত লৌহ দূরীকরণে অল্পকারণ প্রক্রিয়ার স্বল্প ব্যয় লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।

এখনও গ্রাম বাংলায় ব্যবহৃত ময়লা পানি বাড়ীর উঠান বা উঠান সংলগ্ন খোলা জয়গায় ফেলে দেয়া হয়। ময়লা পানি পরিবহনের কোন নালা পদ্ধতি গড়ে ওঠেনি। মল নিষ্কাশনের জন্য স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ ও স্যানিটারী ল্যাট্রিনের ব্যবহার খুবই কম যদিও তা ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে।

নগরায়ন ও নগর পরিবর্তনঃ দারিদ্র্য ও কর্মসংস্থানের অভাব গ্রাম থেকে মানুষকে শহরাঞ্চলে ভিড় জমাতে উৎসাহিত করছে। ২০০০ সালের শেষ নাগাদ মোট ১৩·৫ কোটি মানুষের ৩০% শহরাঞ্চলে বাস করবে যার প্রায় অর্ধেক বাস করবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনার মত বড় শহরে। শহরের বস্তিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঝুপড়িতে বাস করে যেখানে পানীয় জল, মল, মূত্র, ময়লা ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই। সাম্প্রতিককালে শহরের ফুটপাতে পরিবার বসবাস করতে দেখা যাচ্ছে।

৬৩টি জেলা ও ৭টি উপজেলা শহরে নল বাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা আছে। গৃহস্থালীর কাজে দৈনিক মোট সরবরাহের পরিমাণ ১০৪,৪৩০ ঘন মিটার (১৯৮৫)। উৎপাদিত পানির অপচয় ৪০-৭৮% পর্যন্ত। প্রতিটি গৃহসংযোগে ১৩ জন, রাস্তার কাজে ১০০ ও ২৭% মানুষ শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত ১৪,০০০ হস্তচালিত নলকূপের পানি ব্যবহার করে। পানি সরবরাহের দায়িত্ব জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের। অন্যদিকে মল, নোংরা পানি নিষ্কাশন ও গৃহস্থালীর বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ ও নিরাপদ অপসারণ পৌরসভার দায়িত্ব। জেলা শহরে ১৯% লোক মল নিষ্কাশনে সেপটিক ট্যাংক, ২৬% লোক টানা পায়খানা ব্যবহার করে। পিট পায়খানা ব্যবহার ধীরে ধীরে বাড়ছে। বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ দৈনিক ৩১৫০ টন যার ১৮% অপসারণে ব্যবহৃত হয় বড় শহরে ট্রাক ও ছোট শহরে গরুর ও ঠেলাগাড়ী। রান্না, গোসল ও বৃষ্টির পানি পরিবহনের জন্য পানি পার্শ্বস্থ নর্দমা নলছিটি ছাড়া সব শহরেই বর্তমান যদিও সংস্কারের অভাবে জীর্ণদশা প্রাপ্ত।

ঢাকা চট্টগ্রামের পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন (ওয়াসা) দুটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ওপর ন্যস্ত। প্রধান পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার দায়িত্ব সম্প্রতি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের হাত থেকে ওয়াসার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এলাকাভিত্তিক পানি নিষ্কাশন ও নিরাপদ পরিবহন পৌর কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।

ঢাকার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গভীর নলকূপ, পাইনেট ওর্য়াক, ভূ-পৃষ্ঠপোরি জলাধার ব্যবস্থায় পরিচালিত। পয়ঃনিষ্কাশনের পয়ঃপ্রণালী, পাম্প হাউস ও পাগলায় শোধনাগার দ্বাড়াও পরিচালিত। ১৯৮৬ সালের তৃতীয় প্রকল্পে ২৫টি নলকূপ, ১২৫ কিঃমিঃ পাইপ লাইন ৩৭ কিঃমিঃ পয়ের লাইনের কাজ চলছে। ১৯৮৯ সালের ক্রাশ প্রোগ্রামে ৬০টি নলকূপ, ১০০ কিঃমিঃ পানির লাইন নির্মিত হচ্ছে। বর্তমানে পানি উৎপাদনের পরিমান প্রতিদিন ১৭ কোটি গ্যালন, বর্তমান প্রয়োজনের ৭০% এর সমান। উৎপাদিত পানির অপচয়ের পরিমাণ প্রায় ৪০%।

চট্টগামের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ১৪টি নলকূপ, কালুর ঘাট ১৭টি নলকূপের লৌহ অপসারণ ব্যবস্থা, মোহনায় হালদা নদীর পানি পরিশোধনাগার, কালুর ঘাটে ও শহরের পাম্প ব্যবস্থা, বাটালি ও এভিসি পাহাড়ে স্থাপিত ২টি বৃহৎ জলাধার, ২টি বুষ্টার স্টেশন ও ৩০০ কিঃমিঃ পাইপ লাইনের সমন্বয়ে গঠিত। মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৪ কোটি গ্যালন হলেও উৎপাদনের পরিমাণ ২.৯ কোটি গ্যালন। বিতরণ ব্যবস্থায় অপচয় ৪৬%।

চট্টগ্রাম শহরের জন্য পয়ঃপ্রণালী ও শোধনাগারের পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। বর্তমানে ৪,২৬,০০০ লোক সেপটিক ট্যাংক, ২৮,০০০ লোক পট পায়খানা ও ২১,০০০ লোক টানা পায়খানা ব্যবহার করে।

গৃহস্থালীর নোংরা ও বৃষ্টির পানি পরিবহনের জন্য নর্দমা ব্যবস্থা বিদ্যমান। ২২৫ কিঃমিঃ পাকা নর্দমার অস্তিত্ব রয়েছে। শেখ মুজিব কালভার্টের পুরাতন মুখের সংস্কার, নাসিম খালের উন্নয়ন ও নদী পর্যন্ত খালের সংস্কার পানি নিষ্কাশনের জন্য অপরিহার্য।

দৈনিক বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ ১৫০-১৭০ টন। হালিশহর ও আয়ের কূপ নগরে ট্রাক করে এসব বর্জ্য পদার্থ অপসারিত হয়।

শিল্প ও শিল্প দূষণ ঃ বাংলাদেশে শিল্প শহর তিনটি-ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা। ঢাকা ও ঢাকার উপকণ্ঠে ইউরিয়া সার কারখানা, ডেমরায় পাটকলসমূহ, হাজারীবাগে চামড়ার কারখানাসমূহসহ মোট ৫টি এলাকার ৩২৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠান দৈনিক মোট ৪৯ টন বর্জ্য ও দূষণী সামগ্রী চারপাশের নদী নালায় নিক্ষেপ করে। চট্টগ্রামে সার কারখানা, কালুরঘাট ও নাসিরাবাদ শিল্প এলাকা, বারবকুন্ড শিল্প এলাকা, কর্ণফুলী কাগজ ও রেয়ন কারখানাসহ শত শত শিল্প কারখানা প্রচুর কঠিন ও তরল বর্জ্য নদী-নালায় নিক্ষেপ করে। খুলনা, সিলেটসহ আরও কিছু কিছু শহরে পাট, কাগজমন্ড, ম্যাচ, চিনি, তামাক লবণ ও অন্যান্য কৃষিভিত্তিক শিল্প ও প্রচুর বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন করে। অন্যান্য শিল্প কর্মকান্ড যথা খনিজ সম্পদ আহরণ ও (চুনা-পাথর, গ্রাভেল কাঁচের বালি, কাঁদামাটি, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, পিট, সাদামাটি) পরিবেশ দূষণে অংশ নিচ্ছে। এর সংগে যুক্ত হয়েছে গার্মেন্টস, ইলেক্ট্রনিক্স শিল্প ও হালকা ধাতু ও প্রকৌশল কারখানা।

বড় বড় শহরে গাড়ী নিঃসৃত ধোঁয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। শব্দ দূষণ প্রধান প্রধান শহরে ক্রমবর্ধমান।

গ্রীণ হাউস প্রতিক্রিয়ার প্রভাবঃ বিশেষজ্ঞদের আশংকা অনুযায়ী যদি পরিমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় তাহলে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে, নদী প্রবাহের উচ্চমাত্রা বৃদ্ধি, মোহনা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল ও নদীর পানিতলের বৃদ্ধি ঘটিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন করবে এবং লবণাক্ততা দেশাভ্যন্তরে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত হবে। আঞ্চলিক ও সময়ভিত্তিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণে পরিবর্তনের ফলে শিল্প, জনবসতি, কৃষি, চারণভূমি, মৎস্য, বনসম্পদের ওপর অশুভ প্রভাব ফেলবে। তীব্রতা বৃদ্ধির কারণে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫-২০% বাড়তে পারে যা বন্যার সম্ভাবনা বাড়াবে। বায়ুমন্ডলের উচ্চতা বৃদ্ধি মাটি ও তৃণপত্র পল্লবের পানির বাষ্পীভবন ত্বরান্বিত করে মরুময়তার সম্ভাবনা বাড়াবে। আর্দ্র, উষ্ণ বায়ুমন্ডলীয় অঞ্চলে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর বিশ্বের সবচেয়ে অস্থির জলরাশি বলে বাংলাদেশে গ্রীণ হাউস প্রভাবকে খাটো করে দেখাবার অবকাশ নেই।

আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি সমুদ্র পৃষ্ঠতল ১ মিটার বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় বণাঞ্চলের ৫৬˙৮ লক্ষ একর জমি (বাংলাদেশের মোট জমির ১৫˙৮%) পানির নিচে তলিয়ে যাবে। অর্থ্যাৎ ১৩˙৭৪% কৃষি জমি, ৪০১,৬০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ সুন্দর বন এবং এর বন্য প্রাণী, গাছপালা, কীট পতংগ ধ্বংস হবে। ২৯˙১৫ লক্ষ একর নীট কৃষি জমি তলিয়ে যাবার ফলে কৃষি পণ্যের ক্ষতির পরিমাণ ২০ লক্ষ টন চাল, ১৩ হাজার টন গম, ২˙১৪ লক্ষ টন ইক্ষু, ৪˙০৫ লক্ষ টন শাক-সব্জী, ১০ হাজার টন পাট ও ৯৭ হাজার টন ডাল। সম্পদ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে উৎপাদন ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ১০৭˙৮ কোটি ৯৮৫৫˙৩ কোটি টাকা। ১১˙৫ কোটি মানুষের ১০% (২˙৫ লক্ষ গৃহস্থালী) উদ্বাস্ত হিসাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীর মত বড় শহরে আশ্রয় নেবে। জলমগ্ন হবার ফলে ১৯ লক্ষ বাড়ীঘর, ৮৩০০ স্কুল গৃহ, ১৮০ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ১৪৭০ কিঃমিঃ রেল লাইন, ১০৩০০ টি সেতু ও কালভার্ট, ৭০০ কিঃমিঃ পাকা রাস্তা, ১৯৮০০ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৩৭৫টি খাদ্য, সার গুদাম ও ১৭৬০ টি বাজার-হাট নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১৩% ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ১৯৮৪-৮৫ সালের হিসাবে সম্পদ হানির পরিমাণ দাঁড়াবে ৪৫০০০ কোটি টাকা (১৪০০ কোটি মার্কিন ডলার)।

উন্নয়নের পথে অন্তরায় এবং অবিরাম অনুবৃত্ত উন্নয়নের সম্ভাবনাঃ

বাংলাদেশে অর্থনীতির বন্ধাবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি। অব্যাহত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে বাড়বে খাদ্যের চাহিদা বিশেষতঃ চাল ও গম। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা বাড়তি চাহিদা কতটা সফলভাবে মোকাবিলা করতে পারে তার ওপর নির্ভর করছে ভবিষ্যত উন্নয়নের গতি প্রকৃতি।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সংগে তাল রেখে খাদ্যের চাহিদা, প্রয়োজন এবং উৎপাদন কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা সম্ভব হবে তা এ মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা কষ্টকর। তবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য আগামী বছরগুলিতে যে হারে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হবে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্জন সহজসাধ্য হবে না। খাদ্যের চাহিদা খাদ্যের প্রয়োজনের সংগে সংগতিপূর্ণ হবে তেমন কথা নেই। খাদ্যের চাহিদা তার সহজলভ্যতা, বিশেষতঃ ব্যক্তির ক্রয় ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। সে কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সংগে খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যায়।

১৯৯০ সাল (অনেক ক্ষেত্রে চাহিদার চেয়েও কম) বিভিন্ন খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ছিল চাল ১˙৮৪৫ কোটি টন, ডাল, মাছ-মাংস এবং তেল যথাক্রমে ৫˙৪০ লক্ষ, ১১˙২৭ লক্ষ ও ১˙১৫ লক্ষ টন। বর্তমান প্রবৃদ্ধির হারে হিসেব করলে উপরোক্ত বিভিন্ন খাদ্যের ২০০০ এবং ২০১০ সালের প্রয়োজন দাঁড়াবে যথাক্রমে চাল ২˙২৪২৫ এবং ২˙৭২৯ কোটি টন, ডাল ২২˙৭৮ এবং ২৫˙৬৩ লক্ষ, মাছ, মাংস ২৭˙২৭ এবং ৩০˙৭৯ লক্ষ এবং তেল ৫˙৬৯ এবং ৬˙৪১ লক্ষ টন। প্রবৃদ্ধির হার ৬% ধরে ২০০০ সালে শস্য কেনার চাহিদা দাঁড়ায় ২˙৭৯১ ও ৩˙৫৭৭ কোটি মেট্রিক টন। মহাপরিকল্পনা সংস্থার চর্তুথ পথ অবলম্বন, বৃহত্তর নদীসমূহের পানি ব্যবহার, উন্নততর বীজ ও প্রযুক্তির সমাবেশ করে শস্য কেনার মোটামুটি চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে।

সুষম খাদ্যের অন্যতম প্রধান উপাদান আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রধান যোগান আসে মাছ, মাংস এবং দুধ থেকে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী বাংলাদেশ কৃষি ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। হাল চাষ, গাড়ী টানা, তেল বীজ ও ইক্ষু মাড়াই ইত্যাদি কাজে গরু ও মহিষ ব্যবহৃত হয়। বর্তমানেই নিবিড় চাষের সময় সময়

হালের গরুর অভাব প্রকট (৭৪%)। আগামী ২০ বছরে প্রায় দ্বিগুণ লাংগলের ব্যবহার ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নাই। সেক্ষেত্রে বিশাল গৃহপালিত পশু কমিয়ে পরিমিত উপযুক্ত খাদ্যে এবং স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল মাংস ও দুধের প্রয়োজনে প্রতিপালন সম্ভব হবে।

দেশে গো খাদ্যের তীব্র অভাব বিরাজমান। প্রধান খাদ্য খড় ও খৈল। জ্বালানী ও গৃহনির্মাণ সামগ্রী হিসাবে খড়ের ব্যবহারের ফলে খড়ের প্রাপ্যতা কমে যায় (জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জ্বালানী ও গৃহনির্মাণ সামগ্রীর চাহিদাও বেড়েছে)। তৈলবীজের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম, ফলে খৈল প্রাপ্তির পরিমাণও কম। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে চাহিদার চেয়েও কম তেল আমদানী করা হয়। তখনও খৈল গো-সম্পদ বঞ্চিত হয়। এজন্য উন্নততর গো খাদ্য, টিকা ও অন্যান্য ঔষধ পত্রের উদ্ভাবন প্রয়োজন এবং বলাবাহুল্য গবেষণা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প এক্ষেত্রে নেই।

উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার করে মুরগী এবং ডিমের উৎপাদন বাড়াবার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। সমন্বিত কৃষি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে হাঁসের চাষ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ফলাফল দিয়েছে এবং বাংলাদেশেও তা-না হবার কোন কারণ নেই। বর্তমানে বাংলাদেশে ২.২৫ কোটি গরু, মহিষ ১.০৫ কোটি, ছাগল ও ভেড়া ৯ কোটি, হাঁস মুরগী বৎসরে ২.৯ লক্ষ টন মাংস, ১০ লক্ষ টন দুধ, ৬০ কোটি ডিম ও ১ কোটি টুকরা চামড়া উৎপাদন করে।

বাংলাদেশের বন্যা বিধৌত সমতলে মাছের এক বিশাল ও বিচিত্র সম্পদ গড়ে উঠেছে। বর্ষায় নদী, নালা, খাল, বিল, হাওর, বাওরসহ বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি জলমগ্ন হয় এবং মৎস্যের প্রজনন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে (মোহনা অঞ্চল ও অভ্যন্তরীণ জলাভূমিতে যাতায়াতের ভেতর দিয়ে) বর্ষায় ৪৩ লক্ষ হেক্টর জলাভূমির ১৪.৫ লক্ষ হেক্টর সাংবাৎসরিক পানি থাকে। বিভিন্ন বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প নির্মাণের কারণে সমতলীয় জলাভূমি দ্রুত বিমোচিত হচ্ছে ফলে উম্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য প্রজাতির বিলুপ্তিসহ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে বদ্ধ জলাশয়ে মাছের চাষ, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্য খামারে মাছের উৎপাদন বাড়ছে। সামুদ্রিক মাছের আহরণ ও চিংড়ী চাষে ক্রমবর্ধমান। মৎস্য উৎপাদনের বিভিন্ন অংশের ভেতর যোগসূত্র। সামদ্রিক ও অনুবৃত্ত উন্নয়নে প্রতিটির প্রভাব নিরূপণ করে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের সকলের জন্য মংগলজনক একটি সমন্বিত কর্মপন্থা গ্রহণ প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে বারমাস জ্বালানীর অভাব প্রকট। প্রধানতঃ কৃষি বর্জ্য, জ্বালানী কাঠ ও গোবর বারোমাসের প্রধানতম উৎস। ৮১% বার মাস ব্যবহৃত হয় গৃহস্থালীর কাজে ৮০% গ্রামে এবং ২০% শহরে। গ্রাম অঞ্চলে ব্যবহৃত মোট শক্তির ৬৭.১% ব্যবহৃত নূন্যতম বাছার তাগিদে। ১৯৮০ সালে ২.৮৮১ কোটি টন কৃষি বর্জ্য জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। জমির জৈব উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য যার প্রয়োজন ছিল অপরিসীম। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে অজৈব সারের সংগে বৈব সারের ব্যবহার জমির ফলনশক্তি বৃদ্ধি করে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা "বাঁচার জন্য শক্তির" সরবরাহ করতেই হবে। কিন্তু জমির জন্য জৈব সার উজাড় বনাঞ্চল প্রক্রিয়া প্রতিরোধ ভবিষ্যতে ভয়াবহ বিপর্যয় ঠেকানোর জন্য অত্যন্ত জরুরী। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী জোরদার, গ্যাস ও অন্যান্য বাণিজ্যিক জ্বালানী ব্যবহার বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল কৃষি দিক থেকে এক বিশাল সম্ভাবনাময় অঞ্চল। মহাপরিকল্পনা সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ২০১০ সাল নাগাদ বর্তমানের গ্রায় দিগুণ শস্য উৎপন্ন হলেও মাত্র ১১% বাড়তি জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে এই খাত। আগামী ২০১০ সাল নাগাদ বাড়তি ৩ কোটি মানুষের ৮৯% এর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। শিল্প, মৎস্য, পশুপালন, বনের মত কৃষির অন্যান্য শাখায় এবং সেবা প্রদানকারী খাতে।

এসব লোকের উৎপাদিত পণ্য ও সেবার বাজার দেশাভ্যন্তরে পুরোপুরি হবার সম্ভাবনা নেই বলে বৈদেশিক বাজার খুঁজে বের করে যে সব শিল্পে আমাদের তুলনামূলক সুবিধা আছে তা স্থির করে উৎপাদন করতে হবে। বৈদেশিক বাজারে পণ্য সরবরাহের জন্য যে গুণগত উৎকর্ষের প্রয়োজন হবে তা সরবরাহ করতে হবে। বৈদেশিক বাজারে পণ্য সরবরাহের জন্য যে গুণগত উৎকর্ষের প্রয়োজন হবে তা সরবরাহ করতে পারে কেবল শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক। বিশাল শ্রমিক ও জনগোষ্ঠীর শিক্ষার জন্য সংগত কারণেই (ব্যবস্থাদির অপ্রতুলতার কারণ) অপ্রাতিষ্ঠানিক ও মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

২০১০ সাল নাগাদ দেশের $\frac{১}{৩}$ মানুষ শহরাঞ্চলে বাস করে। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর পৌর সুবিধাদি পানি সরবরাহ, মল ও দূষিত পানি নিষ্কাশন ও আবর্জনা পরিস্কারের ভিতর দিয়ে ন্যূনতম মানবিক বাসযোগ্য স্থান সৃষ্টি করতে হবে। গ্রামাঞ্চলেও নিরাপদ পানি ও মল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

শিল্প কারখানা বৃদ্ধির সংগে সংগে বর্জ্য সমস্যার সৃষ্টি করে। এ কারণে শিল্প বর্জ্যের নিরাপদ বর্জন নিশ্চিত করতে হবে। শিল্প কারখানার বর্জ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং তা বাস্তবায়িত ও নিয়ম মাফিক পরিচালনার জন্য আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

এমন এক ভবিষ্যত সমাজের স্বপ্ন নিয়ে আমাদের পরিকল্পনাবিদদের অগ্রসর হতে হবে যা বাস্তবায়িত হলে মানুষ তার বাঁচার মৌলিক উপাদান আহরণের পরও পরিবেশ অক্ষয়, অটুট থাকবে এবং টিকে থাকবে মানব সভ্যতা।

টাস্কফোর্স ঃ স্বনির্ভরতা অর্জন

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	অধ্যাপক এম, ইউনূস	গ্রামীণ ব্যাংক	আহবায়ক
২।	জনাব সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ	স্বনির্ভর	সদস্য
৩।	জনাব এল মতিন	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা	ঐ
৪।	অধ্যাপক আবদুল্লাহ্ আবু সাঈদ	ঢাকা কলেজ	ঐ
৫।	ডঃ এস, হাসমী	অর্থনীতি বিভাগ জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	ঐ
৬।	জনাব সফিউদ্দিন সরকার	সভাপতি, ইনষ্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইনজিনিয়ার্স	ঐ
৭।	ডঃ আতিউর রহমান	বি, আই, ডি, এস,	ঐ
৮।	ডঃ আনোয়ারুল্লাহ্ চৌধুরী	সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়।	ঐ

স্বনির্ভরতা অর্জন

স্বনির্ভরতা অর্জন কেন?

আমাদের মোট দেশজ উৎপাদনের (জি,ডি,পি) ৫২ শতাংশই হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্য। উন্নয়ন বাজেটের সমগ্র অর্থটাই আসে বৈদেশিক সাহায্য থেকে। বাণিজ্য ঘাটতির দুই-তৃতীয়াংশ বৈদেশিক সাহায্য দিয়ে পূরণ করা হয়।

বৈদেশিক সাহায্যের মাত্র এক-চতুর্থাংশ অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যয় করা হয়। এর ১২ শতাংশ পায় ইনডেনটররা। প্রায় সমান অংশ যায় প্রকৌশলী এবং আমলাদের পকেটে, ঘুষ এবং তাদের অন্যান্য আইনবহির্ভূত চাহিদা মেটানো উপলক্ষ্যে। এঁরাই হলেন দেশের এলিট শ্রেণীর উপরিভাগ। এঁরাই চান বৈদেশিক সাহায্য অব্যাহত থাকুক এবং দিনে দিনে তা বৃদ্ধি পাক।

আমাদের নিজেদের সমস্যা সমাধানে আমাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের উপর নিজেদের আস্থা এবং নিজেদের সম্বন্ধে জাতীয় মর্যাদাবোধ গত দুই দশকে দ্রুত হ্রাস পেয়েছে।

জাতির কাছে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিজস্ব কোন স্বপ্নও আর নাই। দাতাদেশ এবং সংস্থাগুলির স্বপ্নই এখন আমাদের স্বপ্ন। আমরা একটা ধার করা স্বপ্নের পেছনে ছুটছি। এর ফলে নিজেদের সৃজনশীল ক্ষমতার আর কোন ব্যবহার নাই, নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তিকে দেখে চেনার এবং প্রশংসা করার কোন ক্ষমতা আর নিজেদের মধ্যে অবশিষ্ট নাই।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য টাস্ক ফোর্স নিম্নলিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ চিহ্নিত করেছেঃ

১·০ বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা কমাতে হবে;

২·০ বৈদেশিক সাহায্য নেবার সময় তার পরিমাণের উপর নজর না দিয়ে গুণগতমানের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে;

৩·০ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে এই দশকের মধ্যেই দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে দরিদ্র জনগণের সংখ্যা বর্তমান অবস্থা থেকে কমিয়ে অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে;

৪·০ স্থানীয় স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

কৌশল ঃ

অর্থনৈতিক ঃ উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিত করা এবং তৈরী করার জন্য বাংলাদেশকে তার নিজস্ব যোগ্যতা এবং ক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। দাতাগোষ্ঠী অর্থের যোগান দিতে সম্মত আছে বলেই যেন আমরা যেই-সেই প্রকল্প অনুমোদন করে বসে না থাকি এব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। দেশীয় সম্পদ, দেশীয় বুদ্ধি, দেশীয় দক্ষতা এবং দেশীয় মেধার ব্যবহার যে প্রকল্পে করার সুযোগ বেশী থাকবে সে প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিদেশী পরামর্শক নেবার ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হবে।

টাস্কফোর্স নিম্নলিখিত বিষয়ে সুপারিশ করছে ঃ সামরিক ব্যয় কমাতে হবে, বিলাস সামগ্রীর আমদানী বন্ধ করতে হবে, রপ্তানী বাড়াতে হবে, আমদানীর পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে পণ্য উৎপাদনের পদক্ষেপ নিতে হবে, আমদানী শুল্ক আরোপ করে দেশীয় শিল্পকে সাহায্য করতে হবে, প্রকল্পের সুবিধা যারা ভোগ করবে তাদের কাছ থেকে বিনিময় মূল্যে সংগ্রহ করতে হবে। স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে, চাহিদা বিবেচনা করে যেখানে যেখানে সম্ভব শিল্প ইউনিটগুলিতে একাধিক শিফ্‌ট চালু করতে হবে, অলস ক্ষমতার পুর্ণাংগ ব্যবহার করতে হবে।

দারিদ্র্য বিমোচন ঃ

গত দুই দশকে আসা বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্যের সাথে সাথে পুনঃ পুনঃ দারিদ্র নিরসনের সদিচ্ছা ব্যক্ত করা হলেও দেশ থেকে ব্যাপক দারিদ্রের অভিশাপ মোটেই লাঘব হয়নি। দারিদ্র নিরসনই হওয়া উচিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য। অর্থনীতিতে সত্যিকার প্রবৃদ্ধির সৃষ্টি না হলে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্য বাস্তবায়ন হয় না। অর্থনৈতিক নীতিমালার মধ্যে এমন সব বিকল্প আছে যেখানে দারিদ্র বিমোচন এবং প্রবৃদ্ধি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বি না হয়ে বরং পরস্পরকে শক্তিশালী করে। যেসব অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলির মাধ্যমে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয় সেগুলি আমরা অবশ্যই পরিহার করবো। ঐসকল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করবো যার মাধ্যমে তারা পরস্পরের পরিপূরক হয়। বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের লক্ষ্য হবে আমরা যেন এর ব্যবহারের মাধ্যমে নিজস্ব অর্থনৈতিক ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারি। ক্রমে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারি। দান এবং ভিক্ষা জাতিকে পরনির্ভরশীল এবং উদ্যমহীন করে ফেলে। যদি মানুষ জানে কোন জিনিস বিনামূল্যে পাওয়া যাবে, তবে তাঁরা তাঁদের সময় এবং শক্তি ঐ বিনামূল্যের বস্তুটি সংগ্রহ করার পেছনে ব্যয় করবেন। একই পরিমাণ সময় এবং শক্তি ব্যয় করলে যে তাঁরা নিজেরাই ঐ একই জিনিস উৎপাদন করে নিতে পারতেন সেকথা তাঁদের আর মনে থাকে না। জাতি, গোষ্ঠী, এবং ব্যক্তিকে মাছ ধরে এনে নাদিয়ে বরং মাছধরার কৌশলটি শেখানো এবং মাছ ধরার অভ্যাসটা ধরিয়ে দেওয়াটাই হলো আসল সাহায্য। আমাদের দাতা বন্ধুরা আমাদেরকে মাছই দিয়ে যাচ্ছেন, মাছ কিভাবে ধরে খেতে হয় সেটা শেখানোর ব্যাপারে তাদের খুব একটা আগ্রহ নাই, সকল উন্নয়ন কৌশলের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষ, বস্তুগত সম্পদের পাহাড় গড়া নয়।

রাজনৈতিকঃ অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে যন্ত্রের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের নিকট জবাবদিহির ব্যবস্থা অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। জবাবদিহি এবং আইনের শাসনকে সার্বজনীন হতে হবে। এটা যেন রাজনৈতিক শত্রুদের ঘায়েল করার জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগের বিষয়ে রূপান্তরিত না হয়।

উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করার আগে স্থানীয় জনগণের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রকল্পের যাবতীয় তথ্য জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে।

স্থানীয় পর্যায়ে গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে জবাবদিহির প্রক্রিয়াকে মজবুত করা যেতে পারে।

আদর্শগত ঃ স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য আদর্শগত ভিত্তি তৈরী করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন প্রয়োজন হবে। মানুষের মৌলিক অধিকার, মানুষে মানুষে সমতা, নৈতিকতা, জাতীয় মর্যাদাবোধ, ভিক্ষা হিসেবে কিছু গ্রহণ করার প্রতি তীব্র অনিচ্ছা, নিজের শক্তিতে যা অর্জন করা গেলো তার মধ্যে আত্মমর্যাদার সুদৃঢ় ভিত্তি খুঁজে পাওয়া, ইত্যাদি মূল্যবোধ সৃষ্টি করা নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হতে হবে।

প্রচার মাধ্যম ঃ

প্রচার মাধ্যমকে স্বাধীন এবং দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল সরকারী চুক্তির দলিলকে উন্মুক্ত দলিল হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। নিয়মিতভাবে এই সব দলিল প্রচার মাধ্যমের অবগতির জন্য এবং বিশ্লেষণের জন্য পাঠিয়ে দিতে হবে।

বি, আই, ডি, এস, মডেল ঃ

স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য বি,আই,ডি,এস যে মডেল রচনা করেছে তার মধ্যে দু'টি বিকল্প ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রথম বিকল্পটির মাধ্যমে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা যায় বটে, তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারকে এমন পর্যায়ে উঠানো যায় না যার ফলে একটি স্বতঃ ধারণশীল অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টিহবে।

দ্বিতীয় বিকল্পে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণকে ৩৪ শতাংশে নামিয়ে আনা যায় এবং প্রবৃদ্ধির হারকে ৬·৯৪ শতাংশ করা যায়। এর মূল্য দিতে হয় ভোগের মাত্রাকে প্রারম্ভিক মাত্রায় স্থির করে রাখার মধ্যে। এতে ধনী শ্রেণীর ভোগের মাত্রাকে পাঁচ বছরের জন্য কঠিনভাবে সীমিত রাখতে হবে। তবে এর ফলে দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) পরিমাণ দশ বছরের কম সময়ে দ্বিগুণ হবে।

স্বনির্ভরতা অর্জনে বাধা ঃ

খুব সহজেই বৈদেশিক সাহায্য পেতে থাকায় আমরা কষ্টের পথ পরিহার করতে অভ্যস্থ হয়ে গেছি। বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে যারা এই পদ্ধতি চালু রাখতে এবং সম্প্রসারণ করতে উন্মুখ। এই সুবিধাভোগী শ্রেণীই হচ্ছে স্বনির্ভরতা অর্জনের পথ বেছে নেবার পথে প্রথম প্রতিবন্ধক। তারা এই পদ্ধতিকে চিরন্তন করে রাখতে চায়। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের দিক থেকে আমরা আমাদের আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিতে আর লজ্জা পাচ্ছি না। চুক্তির দলিলে যখন দাতাদেশ বা সংস্থা অবমাননাকর শর্ত অবলীলাক্রমে বসিয়ে দেয় সেটা আমাদেরকে আর মানসিকভাবে কষ্ট দেয় না।

মুক্তির পথ ঃ

এই পরনির্ভরশীলতার বিরুদ্ধে ব্যক্তি পর্যায়ে, গোষ্ঠী পর্যায়ে এবং জাতীয় পর্যায়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বৈদেশিক সাহায্য নেবার আগে প্রকল্প বাছাই করার পদ্ধতিকে কঠিন করতে হবে। বিভিন্ন দিক থেকে যাচাই করে বৈদেশিক সাহায্যের জন্য প্রকল্প সনাক্ত করতে হবে। জাতির পক্ষ থেকে চুক্তি চূড়ান্তকরণের আলাপ–আলোচনায় আরো অনেক বেশী দক্ষতা দেখাবার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। প্রচার মাধ্যমে দেশী জিনিস ব্যবহারের গৌরবকে তুলে ধরতে হবে। বিদেশী দ্রব্যকে জনপ্রিয় করার প্রবণতা রোধ করতে হবে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সরকারী আমলা, বুদ্ধিজীবী, প্রচার মাধ্যমের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণসহ সকল পেশার নেতৃবৃন্দকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে অনাড়ম্বরতা এবং স্বনির্ভরতার স্বচ্ছ এবং সকল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

রাজনৈতিক ঐক্য ও সমঝোতা ঃ

স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য এখন সব চাইতে বেশী যেটার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ঐক্য ও সমঝোতা। দ্রুততম গতিতে স্বনির্ভরতা অর্জনকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে তার কৌশলের বিষয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্তই প্রয়োজন। একমাত্র সুতীব্র রাজনৈতিক আকাংখার মাধ্যমেই স্বনির্ভরতা অর্জন সম্ভব হতে পারে। আর এখনই হচ্ছে সে আকাংখা ব্যক্ত করার এবং কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের যথার্থ সময়।

আমরা যদি এবারো আমাদের এই সুযোগ আমাদের আংগুলের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে যাবার সুযোগ দিয়ে দিই, পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষায় থাকি, আবারো সুযোগ যখন আসবে তখন তা কাজে লাগানোর অবকাশ নাও থাকতে পারে।

টাস্ক ফোর্সঃ অসরকারী সংগঠনসমূহ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	জনাব সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ	মহাসচিব, স্ব–নির্ভর	আহবায়ক
২।	জনাব ফজল হাসান আবেদ	ব্রাক	সদস্য
৩।	ডঃ এম, খলিলুল্লাহ	যুগ্ম–সচিব বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়	ঐ
৪।	কাজী ফারুক আহমেদ	নির্বাহী পরিচালক, প্রশিক্ষা	ঐ
৫।	কাজী রকিব উদ্দিন আহমেদ	মহাপরিচালক, এনজিও ব্যুরো	ঐ
৬।	ডঃ খাজা সামছুল হুদা	পরিচালক, এডাব	ঐ
৭।	জনাব এফ, আর, মাহমুদ হাসান	নির্বাহী পরিচালক, গণ সাহায্য সংস্থা	ঐ
৮।	জনাব খালেদ সামস	গ্রামীণ ব্যাংক।	ঐ

অসরকারী সংগঠনসমূহ

বাংলাদেশে দীর্ঘকাল থেকে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসলেও সাম্প্রতিককালে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে পেশাগত দক্ষতা ও বিশেষত্বের চাহিদা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। আক্ষরিক অর্থে এনজিও বলতে সরকারের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন প্রতিষ্ঠানসমূহকে বোঝানো হলেও কার্যত রাজনৈতিক দল, ব্যক্তিমালিকানাধীন ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও যুব সংগঠন প্রভৃতি এর আওতাভুক্ত হতে পারে। তবে এনজিও শব্দের যথার্থ তাৎপর্য এতে প্রতিফলিত নয়। প্রকৃতপক্ষে এনজিও বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়োজিত সংস্থাসমূহকেই বোঝানো হয়। বস্তুতঃ অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা থেকে পৃথক করার জন্যেই এদেরকে 'বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা' নামে অভিহিত করা হয়।

বাংলাদেশে এনজিও বলতে এমন সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয় যেগুলো সরকারের ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ এবং ১৯৭৮ সালের বিদেশী অনুদান গ্রহণ (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) অধ্যাদেশের আওতায় নিবন্ধিত। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী সর্বমোট ১৩,০০০ এবং ১৯৭৮ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী ৪৩৮টি সংস্থা নিবন্ধিত হয়েছে। বস্তুতঃ এসব সংস্থার মধ্যে প্রায় ৬০০টি সংস্থা উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত।

বাংলাদেশে কর্মরত উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকৌশলগত ভিন্নতা সত্ত্বেও একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে, তৃণমুল পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমেই কেবল দারিদ্র-দূরীকরণ সম্ভব। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষা, সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল পর্যায়ে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্বব। তৃণমূল পর্যায়ে আত্মনির্ভর, স্বাবলম্বী ও স্থানীয়ভাবে জবাবদিহিমূলক সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে গণকেন্দ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এনজিওসমূহ মূখ্যতঃ প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে।

ব্যাপ্তির দিক থেকে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট শ্রেণীকরণ করা বাস্তবিকই কঠিন। তবে আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এগুলোকে কল্যাণমূখী, উন্নয়ন-সেবা-ধর্মী, ক্ষমতায়ন-পদ্ধতিমূখী কিংবা তাদের কর্ম এলাকা ও ফান্ডের উৎস অনুযায়ী স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এই তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। আবার ভূমিকা ও কার্যক্রমের বিচারে ত্রাণ ও পুনর্বাসন, সেবা, ফান্ডিং, সমন্বয়কারী ও উন্নয়ন সংস্থা হিসেবেও তাদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়। তবে একটি এনজিও বহুমুখী কার্যক্রমে নিয়োজিত হতে পারে এবং একই সঙ্গে তা বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত হতে পারে।

বস্তুতঃ স্বাধীনতাপরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের অনিবার্যতা থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও-র আবির্ভাব ঘটে এদেশে। পরবর্তীতে পরিবর্তিত বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে এনজিওসমূহ তাদের লক্ষ্য ও কর্মসূচী পুনর্বিন্যস্ত করে। এ পর্যায়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের পরিবর্তে সমন্বত গ্রামীণ উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণভিত্তিক উন্নয়নের ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ করা হয়-যাতে করে তৃণমূল পর্যায়ে নিজেদের সংগঠিত করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রথম দুই দশকের এনজিও কার্যক্রমের মূল্যায়নে এটা পরিলক্ষিত হয়েছে যে সুদুরপ্রসারী লক্ষ্য ও পরিকল্পনা সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এনজিওসমূহের কার্যক্রম কতগুলো সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। তন্মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য দুরীকরণ, নারী অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং পরিবেশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহে এনজিওসমূহ চাহিদাভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। স্থানীয় সম্পদ সমাবেশ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের নিজস্ব সংগঠনের বিকাশের মধ্য দিয়ে স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোর পুনর্বিন্যাস এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গণতন্ত্রায়নে তাদের

সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে। এ প্রক্রিয়ায় তারা সরকারী সম্পদ ও সেবার সুষ্ঠু বন্টন এবং তাদের অনুকূলে নীতি ও পরিকল্পনার যথাযথ সংশোধনের চাহিদা সৃষ্টির পাশাপাশি তারা স্থানীয় শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে কার্যকর আর্থ–সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত এই কার্যক্রমসমূহ শুধু দারিদ্র জনগোষ্ঠীর সংগঠন নির্মাণেই সীমিত থাকেনি, বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সাধ্যক্ষম ও ব্যবস্থাপনা–উপযোগী আর্থ–সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণের সুবিধার্থে তাদের মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী ঋণ, সেবাসহ অত্যাবশ্যক সহায়তাও প্রদান করা হয়েছে। এটা শুধু তাদের আয় বৃদ্ধিই করেনি, বরং কায়েমী স্বার্থ ও শোষণমুক্তির লড়াইয়ে তাঁদেরকে আত্ম প্রত্যয়ী ও স্বনির্ভর করে তুলেছে এবং শোষক শ্রেণীর কবল থেকে তাদেরকে মুক্ত করেছে। এ পর্যন্ত যে সব ক্ষেত্রে এনজিও–রা সহায়তা প্রদান করেছে তন্মধ্যে কৃষি, পশু–সম্পদ, হাঁস–মুরগী, বনায়ন, রেশম শিল্প, মৌচাষ, নার্সারি উন্নয়ন, সেচ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন হস্তশিল্প ও স্থানীয় পরিবহন, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া এনজিওসমূহ পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকসহ জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করে জাতীয় উন্নয়নের সর্ব পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। অব্যাহত শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এনজিও–রা প্রয়োজনীয় ঋণ, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে নারীদের আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে নারী–পুরুষ নির্বিশেষে সকল জনগোষ্ঠীর নিরক্ষরতা দূরীকরণে এনজিওসমূহ তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। বিশেষ করে, শিশু শিক্ষা কার্যক্রমে তাদের ভূমিকা দরিদ্র ও শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের মধ্যে শিক্ষাকে কেবল আকর্ষণীয় ও বাস্তবমুখীই করেনি, বরং ঝরে–পড়ার হারও উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। সম্প্রতি এনজিওসমূহ আগামী দশকের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে "গণস্বাক্ষরতা অভিযান'' শীর্ষক এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তৃণমূল পর্যায়ে একটি কার্যকর স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এনজিওসমূহ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। তারা রোগ প্রতিরোধ, নিরাময়, টিকায়ন, পুষ্টি, স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করে। এনজিওরা তাদের অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে কেবল প্রাথমিক স্বাস্থ্য–পরিচর্যা সম্পর্কেই সচেতন করেনি, বরং তাদের জন্যে তৃণমূল পর্যায়ে স্থায়ী চিকিৎসা সেবা কেন্দ্রও গড়ে তুলেছে। এ ক্ষেত্রে ডায়রিয়া প্রতিরোধে লবন–গুড়–স্যালাইনের ব্যবহার ও কার্যকারিতা বিষয়ে শহুরে ও গ্রামীণ মায়েদের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ এনজিওদের অবদানসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যাপক শিশুমৃত্যু ও শিশুঘাতক রোগ প্রতিরোধের লক্ষে পরিচালিত জাতীয়ভিত্তিক সম্প্রাসারিত টিকাদান কার্যক্রমে এনজিওসমূহ স্মরণীয় ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়—যা সরকারী কার্যক্রমের সম্পূরক ও পরিপূরক হিসেবে দেশে–বিদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত ও স্বীকৃত হয়েছে। সর্বোপরি, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে এনজিওদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। এনজিওদের একটি অংশ যেমন গ্রাম পর্যায়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিতরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমে নিয়োজিত ছিল, তেমনি অন্য একটি অংশ স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পৃক্ত স্থায়ী বন্ধ্যাত্বকরণের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে।

পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রেও বিশেষ করে বনায়ন কার্যক্রমে, এনজিওরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে ফল ও জ্বালানীবৃক্ষের বীজ ও চারা বিতরণের মাধ্যমে বাড়ির আঙিনা, বাঁধ–এলাকা ও স্কুল চত্বরসহ অনুরুপ উম্মুক্ত স্থানসমূহে বনায়নের ক্ষেত্রে এনজিওদের ভূমিকা ছিলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরকার নিয়ন্ত্রিত বনাঞ্চল ও পতিতভূমির সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দরিদ্র জনগোষ্ঠির ওপর অর্পিত হলে এ ক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য অর্জন সম্ভব এনজিওরা তা প্রমাণ করেছে এবং তারা তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন পর্যায়ে অবহিতও করেছে। কিন্তু তা সত্বেও অদ্যাবধি এ বিষয়ে সরকার কোন সুষ্ঠু নীতিমালা গ্রহণ করেননি।

পাশাপাশি জলাবদ্ধ পায়খানা ও নলকূপ সরবরাহের মাধ্যমে নিরাপদ পানীয়জল ও পয়ঃনিষ্কাশণ ব্যবস্থার সুবিধাদি অভীষ্ট জনগোষ্ঠির কাছে পৌছানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সরবরাহকৃত পায়খানা এবং নলকূপ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তাদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় উন্নয়নে এনজিওসমূহ বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হলেও তাদের মধ্যে কিছু কিছু দূর্বলতাও আছে। তন্মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও অত্যাবশ্যক দক্ষতাসমৃদ্ধ ব্যবস্থাসমূহের পদ্ধতির অভাব, বাস্তবতার সঙ্গে দাতাসংস্থাপনা চাহিদা ও প্রত্যাশার কর্মসূচীগত অসঙ্গতি, দাতাসংস্থাও এনজিওদের মধ্যে কার্যকর সমঝোতা ও সহযোগিতার অভাব, তথ্য সংরক্ষণ ও নথিকরণে প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব প্রভৃতি উল্লেখ্যযোগ্য।

তদুপরি, এনজিও সম্পর্কে সরকার ও রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন মহলে ব্যাপক সংশয় বিদ্যমান। যে কারণে প্রায়শঃ এনজিওরা নানাধরণের সমালোচনার সম্মুখীন হয় ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলসমূহকে গোপনে অর্থ সরবরাহের অভিযোগও রয়েছে এনজিও সম্পর্কে। যদিও এ ধরণের অভিযোগ শুধু ভিত্তিহীনই নয়, এনজিও আদর্শ ও লক্ষ্যেরও সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বলাবাহুল্য যে, এনজিওসমূহ কোনো ধরণের দলীয় রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। সঙ্গত-কারণেই সবধরণের দলীয় আদর্শ ও দর্শনের প্রতিও তারা সমান নির্মোহ। বিশেষ করে, বামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের অভিযোগ হলো যে এনজিওরা সমাজবিপ্লবকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক-প্রক্রিয়া-বিধ্বংসী তৎপরতায় লিপ্ত। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো শিক্ষা, সচেতনতা ও সংগঠিত করণের প্রক্রিয়ায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে এনজিওসমূহ সমাজ পরিবর্তনের অত্যাবশ্যক ক্ষেত্র তৈরিতে সুদুর প্রসারী ভূমিকা রাখছে। উন্নয়নসংস্থাসমূহ, বিশেষ করে, বিভিন্ন খ্রীশ্চিয়ান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অর্থসাহায্য পরিচালিত ধর্মান্তরিত করার অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য যে অভিযুক্ত সংস্থাসমূহও বাংলাদেশ সরকারের ১৯৭৮ সালের অধ্যাদেশের আওতায় নিবন্ধিত। শুধু তাই নয়, একই উৎস থেকে অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থাও অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। সংগতকারণেই এ ধরণের ঢালাও অভিযোগ আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। বাস্তবিকই যদি কোনো সংস্থা এ ধরণের কাজে নিয়োজিত থাকে, তা হলে, সুনির্দিষ্টভাবে ঐ এনজিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ উথাপন করা উচিত এবং সরকারের দায়িত্ব হলো যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বাংলাদেশে সরকার-এনজিও সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার দৃষ্টান্ত যেমন আছে, তেমনি পারস্পরিক সন্দেহ ও অবাঞ্ছিত নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সরকারের পক্ষ থেকে একদিকে যখন পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে এনজিওসমূহের অংশগ্রহণের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে, অন্যদিকে তখন বিভিন্ন অধ্যাদেশ জারি ও পদ্ধতিগত জটিলতা সৃষ্টির মাধ্যমে এনজিও কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টাও অব্যাহত আছে। সরকারের এই দ্বৈত-ভূমিকা এনজিও কার্যক্রমের স্বাভাবিক গতিধারাকে বাধাগ্রস্ত করছে।

তবে আশার কথা হলো, কিছু কিছু সরকারী কর্মকর্তা আন্তরিকভাবেই এনজিও কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করে আসছেন। তাদের এই সহায়তা শুধু সর্মসুচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই সীমিত নয়, বরং সরকারী কার্যক্রমেও তারা এনজিওদের অনুসৃত কর্মকৌশল প্রয়োগ ও অনুসরণ করার পক্ষে যৌক্তিক ভূমিকা পালন করছেন। এ সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় উন্নয়নে এনজিও সমূহের ভূমিকাকে আরো কার্যকর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হতে পারে ঃ

১। পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরসমূহের পাশাপাশি এনজিওসমূহকে বেসরকারী এবং অলাভজনক একটি বিশেষ সেক্টর হিসেবে বিবেচনা ও স্বীকৃতিদান করা প্রয়োজন। জাতীয় উন্নয়ন এনজিওসমূহের কার্যকর অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জারীকৃত বিভিন্ন অধ্যাদেশের ফলে সৃষ্ট প্রশাসনিক এবং পদ্ধতিগত জটিলতা দুর করে একটি সহযোগী ও অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

২। দেশে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্যে বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বর্তমানে এনজিওসমূহকে ১৯৭৮ সালের বৈদেশিক অনুদান আইন অধ্যাদেশের (Foreign Donation Regulation Ordinance) আওতায় রেজিষ্ট্রেশন নিতে হয়। পদ্ধতিটি জটিল, যন্ত্রণাদায়ক এবং এর অবসান দরকার। সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে সকল আনুষ্ঠানিকর্তা সম্পন্ন করার জন্যে সরকারকে বিরাজমান পদ্ধতিসমূহকে আরো কার্যকর করতে হবে। এনজিওসমূহের রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সরকারী বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। যা চার মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। সরকারকে অবশ্যই নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্ভাব্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার দায়িত্ব নিতে হবে। একবার রেজিষ্ট্রেশন হয়ে গেলে এনজিওসমূহকে প্রকৃত সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এবং প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এর রেজিষ্ট্রেশন নবায়নের বিধান প্রত্যাহার করতে হবে।

৩। রেজিষ্টেশনের পর তাদের প্রকল্পের জন্যে সরকারের কাছ থেকে পূর্ব-অনুমোদন এবং প্রতিবছর অর্থ বরাদ্দের অনুমতি নিতে হয়। এ পদ্ধতি আবারো জটিল ও কষ্টকর হয়ে পড়েছে। পূর্ব অনুমোদন ছাড়া এনজিওসমূহকে বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহের অনুমতি দেয়ার জন্যে প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন করা প্রয়োজন। তবে এনজিওসমূহ তাদের প্রস্তাবিত প্রকল্প ও বাজেট এবং প্রকল্পের অনুকূলে কত টাকা কোন্ উৎস থেকে সংগ্রহ করেছে সেসব সরকারের কাছে পেশ করবে। সুনির্দিষ্ট ব্যাংক এ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করায় এনজিও সেক্টরে ঐসব অর্থপ্রবাহের সঠিক অনুসন্ধান ও তত্ত্বাবধান করা সরকারের জন্যে সহজ হবে। এনজিওসমূহ তাদের বার্ষিক রিপোর্ট, অর্থ সংক্রান্ত

বিবরণ এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়মিত সরকারের নিকট পেশ করবে। এতে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে এর কর্মকান্ডের তত্ত্বাবধান এবং প্রকল্পের সমাপ্তির পর এর ফলাফলের মূল্যায়ন করা সরকারের জন্যে সহজ হবে। এ ধরনের পদ্ধতি প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কা, ভারত ও পাকিস্তানসহ এশিয়ার অনেক দেশেই রয়েছে।

৪। উন্নয়নের যেসব ক্ষেত্রে এনজিওসমূহের সচ্ছন্দ সুবিধাজনক অবস্থান রয়েছে এবং তারা নিজেদের দক্ষ প্রমাণ করতে পেরেছে সেসব ক্ষেত্রে বৈদেশিক অর্থের পাশাপাশি সরকারও তাদের অর্থ যোগান দিতে পারে। এর ফলে হঠাৎ করে বৈদেশিক সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলেও এনজিওসমূহে যেমন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে তেমনি জাতীয় উন্নয়নেও এদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাবে এবং এনজিওসমূহকে সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে প্রকল্পসমূহকেও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

৫। এনজিও ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতার দৃষ্টান্ত বিরল। সরকার এবং এনজিওসমূহ একসাথে জনগণের কল্যাণের জন্যে কাজ করতে পারে, এই সত্য প্রমাণের জন্যে নেতৃস্থানীয় কিছু এনজিও সম্প্রতি সরকারের সহযোগিতায় ব্যাপক জাতীয় কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।অবশ্য সম্ভাব্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে সরকারের ইচ্ছা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় এনজিওসমূহকে শুধুমাত্র বাস্তবায়নকারী হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এনজিওসমূহের অধিক কার্যকারিতা ও কর্মসূচীর সাফল্যের জন্যে সরকারকে তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞাতা ও দক্ষতার কথা বিবেচনা করে তাদেরকে স্বাধীনভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুযোগ দিতে হবে—এক্ষেত্রে সরকারকে শুধু অর্থ সাহায্য দিতে হবে এবং গৃহীত কর্মসূচীর সাফল্য তত্ত্বাবধান করতে হবে।

৬। সচেতনতা সৃষ্টি এবং দরিদ্র জনগোষ্টির দৌরগোড়ায় সেবা পৌছে দেয়ার মাধ্যমে শেকড় পর্যায়ে চাহিদা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এনজিওসমূহ তাদের কার্যকারিতা প্রমাণ করেছে। সরকারী সম্পদ ও সেবা দরিদ্র জনগোষ্ঠির কাছে পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর চাহিদার পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি এনজিওসমূহকে সুনির্দিষ্ট ক্ষুদ্র পর্যায়ের কর্মসূচীতে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে দরিদ্র জনগণের কল্যাণে সরকারের সম্পদ ও সেবা এনজিওরাই সরাসরি তাদের কাছে পৌছে দিতে পারে। এ ধরণের কর্মসূচীতে এনজিওদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার কথা বিবেচনা করে জনগণের প্রকৃত চাহিদা সনাক্তকরণে তাদেরকে বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সুযোগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারকে প্রয়োজনীয় সম্পদ ও সেবা প্রদান করতে হবে। সরকার এক্ষেত্রে সম্পদ ও সেবা প্রদানের পাশাপাশি কর্মসূচীর সাফল্য তত্ত্বাবধান করবে।

৭। এনজিও কর্মপদ্ধতি ও কর্মপ্রবাহের যথাযথ মুল্যায়ণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়মিত এনজিও কার্যক্রম পরিদর্শনের একটি ব্যবস্থা থাকা উচিত। এ ধরণের উদ্যোগ সরকার ও এনজিওর মধ্যে স্বচ্ছ তথ্যগত সেতুবন্ধন রচনার পাশাপাশি উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান বিভ্রান্তি ও বিচ্ছিন্নতা নিরসনে সহায়ক হবে।

৮। স্থানীয় ও জাতীয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদার যথাযথ প্রতিফলন ও তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এতে এনজিওদের অর্ন্তভূক্ত করা উচিত। কারণ তৃণমূল পর্যায়ের প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে তাদের রয়েছে দীর্ঘ–কর্ম–অভিজ্ঞতা ও বাস্তব–জ্ঞান।

৯। সরকারী ও এনজিও প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা যেতে পারে। যে কমিটি সরকার এনজিও সম্পর্কে উন্নয়ন, এনজিও কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান এবং এনজিও–কার্যক্রমকে বাধামুক্ত করার লক্ষ্যে একটি যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন করবে। এ কমিটি নীতিগত সুপারিশমালা প্রণয়নের পাশাপাশি উদ্ভুত সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং তা নিরসনের লক্ষ্যে প্রতি দু'মাস অন্তর বৈঠকে মিলিত হবে।

১০। উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্যে এনজিও এবং সরকারের কর্মসূচীর মধ্যে বাস্তবভিত্তিক সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে কার্যকর সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ অপরিহার্য। সুতরাং সরকারের উচিত বর্তমানে কর্মরত এনজিও সমন্বয়কারী সংস্থাসমূহের ভুমিকাকে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে বৃহত্তর এনজিওদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা।

১১। এনজিও কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে এনজিও–ব্যুরোর সৃষ্টি সন্দেহাতীতভাবে, একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। সচিবালয়ের বাইরে অবস্থানের কারণে প্রবেশাধিকার সহজতর হয়েছে। তাছাড়া এনজিও ব্যুরো আবেদনপত্রসহ, বিভিন্ন এনজিও কার্যক্রমের অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়গুলির নিস্পত্তি দ্রুততর করার ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে সম্ভাবনাময় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ব্যুরোর কার্যপণালীতে পূর্ববর্তী জটিলতা এখনও অপরিবর্তিত আছে যা এনজিও ব্যুরোর মূল উদ্দেশ্যকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। অতএব, অবিলম্বে এই সমস্যা নিরসনের জন্য সরকার ও এনজিওদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যরো সংক্রান্ত নিয়মাবলী সহজতর করার উদ্যোগ নেয়া উচিত।

টাস্কফোর্সঃ উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	মিসেস সালমা খান	যুগ্ম-প্রধান পরিকল্পনা কমিশন	আহবায়ক
২।	বেগম মালেকা বেগম	মহিলা পরিষদ	সদস্য
৩।	বেগম শামিম হামিদ	বিআইডিএস	ঐ
৪।	বেগম গুল আফরোজ মাহবুব	পরিচালক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	ঐ
৫।	ডঃ নাজমা চৌধুরী	উইমেন ফর উইমেন	ঐ
৬।	ডঃ প্রতিমা পাল	বিআইডিএস	ঐ
৭।	ডঃ মেঘনা গুহ ঠাকুরতা	জন প্রশাসন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ঐ
৮।	বেগম সুলতানা কামাল	নারী পক্ষ।	ঐ

উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা

১·০ এ প্রতিবেদনের মূল উদ্দেশ্য হ'ল নারীকে উন্নয়নের মূল ধারায় আনার কলাকৌশল নির্ধারণ করা এবং নারী–প্রেক্ষিত থেকে (ক) দারিদ্র বিমোচন, (খ) দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন, ও (গ) স্ব–নির্ভরতার উপাদান ও সূচকসমূহকে বিশ্লেষণ করা, যাতে করে উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আগামী নির্বাচিত সরকার বাস্তবমুখী নীতিমালা নির্দ্ধারণের দিক নির্দ্দেশনা হিসেবে তা ব্যবহার করতে পারেন।

১·১ উপরোল্লিখিত মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আলোচ্য প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে নজর দেয়াহয়েছে।

(ক) নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় আনয়নের সহায়ক হিসাবে এবং "উন্নয়নে নারী" শীর্ষক ধারনার পক্ষে উন্নয়ন প্রশাসনের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা স্বরুপ উন্নয়নের মহিলাদের অবদানকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিতকরণ ও অধিকতর স্বীকৃতি প্রদান।

(খ) "উন্নয়নে নারী" শীর্ষক ধারনার প্রেক্ষাপটে ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কলাকৌশল নির্মানের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনগত বিষয়গুলির প্রাসংগিকতার প্রতি আলোকপাতকরতঃ তাদের প্রকৃতি চিহ্নিতকরন।

(গ) নারী–পুরুষের সমতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও গণমাধ্যমে নারীর ইতিবাচক প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করা।

(ঘ) মহিলাদের উন্নয়ন বৈভবকে উন্নয়নের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করনের লক্ষ্যে উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া চিহ্নিতকরণ।

২·০ প্রতিবেদনের কাঠামো বিন্যাসঃ

আলোচ্য প্রতিবেদনটি মূলতঃ সাতটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবেদনের পটভূমি ও উদ্দেশ্য বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ভাগে বিগত সময়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে মহিলাদের অবস্থান, উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায় সম আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কর্মকান্ড যা উন্নয়নে নারী বিষয়টিকে প্রভাবিত করেছে, দেশের অভ্যন্তরে বিশেষভাবে উল্লেখ্য প্রাসংগিক কর্মকান্ড ও সর্বশেষে "উন্নয়নে নারী" বিষয়ক ধারনার প্রেক্ষাপটে বিগত পাঁচশালা পরিকল্পনাসমূহের পর্যালোচনা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্র এ দুই প্রধান বিষয়ের আওতায় যথাক্রমে প্রতিবেদনের তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমস্যাসমূহ ও তা নিস্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় কলাকৌশল চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রতিবেদনের পঞ্চম ভাগে "উন্নয়নে নারী" শীর্ষক ধারনার প্রেক্ষাপটে কতগুলো বিশেষ ক্ষেত্রসমূহের উপর বিস্তৃত পরিধিতে আলোকপাত করা হয়েছে এবং উন্নয়নের মূলধারায় মহিলাদের অংশগ্রহনে নিশ্চিতকরন প্রচেষ্টায় সেগুলোর যোগসূত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এই বিষয়টি বিশেষ মনযোগের দাবী রাখে। ষষ্ঠভাগে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্বন্ধে প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে। সর্বশেষে প্রতিবেদনের সপ্তমভাগে একটি উপসংহারমূলক বক্তব্য রাখা হয়েছে। আশা করা যায় যে, টাস্ক ফোর্স অত্র প্রতিবেদনে যে সব কলাকৌশলের প্রস্তাব রেখেছে তা নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় আনয়নের প্রচেষ্টা ক্রমে নতুন সরকারের উদ্যোগ গ্রহণে বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

৩·০ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে "উন্নয়নে নারী (WID)" শীর্ষক ধারণা ঃ

উন্নয়ন পরিকল্পনার চিন্তনে "উন্নয়নে নারী" শীর্ষক ধারনাটি একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। বস্তুতপক্ষে; ৭০'র দশক থেকে সার্বিক আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলা জনগোষ্ঠীকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করনের প্রয়োজনীয়তার অনস্বীকার্য স্বীকৃতির ফলস্বরূপ "উন্নয়নে নারী" শীর্ষক ধারনাটির প্রসার লাভ ঘটে। এ ধারনার প্রসারের প্রয়োজনীয়তার পেছনে দুটি পরিপূরকমূলক যৌক্তিকতা রয়েছে। যথা–একটি জনগোষ্ঠীর অর্ধেক অংশকে অবহেলায়, অবজ্ঞায় ও অস্বীকৃতির মাঝে ফেলে রাখা অনভিপ্রেত ও অমানবিক এবং দ্বিতীয়তঃ দেশের

সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য বিবেচিত কলাকৌশলের ভিত জোরদারকরণ সম্ভব । বাংলাদেশে বিরাজমান একটি অনগ্রসর আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে বিশেষর্তঃ যেখানে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠি তথা মহিলা জনগোষ্ঠি চরমভাবে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে সেখানে তাদের উন্নয়নের পথে সমস্যাসমূহকে চিহ্নিতকরণ এবং পাশাপাশি তাদের উন্নয়ন বৈভবকে রেখে মহিলা জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূলধারায় আনয়নের উদ্দেশ্যে স্থান ও সময়োপযোগী কলাকৌশল নির্মাণ ও নির্ধারণ বিশেষ প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে "উন্নয়নে নারী" শীর্ষক ধারনার দুটি বিষয়কে আলাদাভাবে বিবেচনাধীন রাখা প্রয়োজন। একটি হচ্ছে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ সহজতর করা; অন্যটি হচ্ছে দেশের আইনগত ও মূল্যবোধগত কাঠামোকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহনের প্রচেষ্টার সহায়ক হিসাবে নির্মাণ করা। দ্বিতীয় দিকটি বাংলাদেশের জন্যে বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য।

৪.০ দেশে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরীক্ষে মহিলাদের অবস্থান ঃ

উন্নয়নের উপাদান ও সূচকসমূহের বিশ্লেষণে এটা প্রতীয়মান হয় যে, দেশের নারীকুল দীর্ঘদিনের আর্থ-সামাজিক বৈষ্যমের করুন শিকার। এটা কোনভাবেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়না, অস্বীকারের ও প্রশ্নই উঠেনা যে, শিক্ষায়, পুষ্টিতে, বিত্ততে, আইন, সামাজিক ও সংস্কৃতগত ভাবে দেশের মহিলা জনগোষ্ঠি অমানবিকভাবে পিছিয়ে আছে। অন্যদিকে দেখা যায় যে কৃষিতে, গার্হস্থ্যকর্মে ও অকৃষি কাজে মহিলারা নিভৃতে থেকেই উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখে যাচ্ছে। কিন্তু তারা উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে ও স্বীকৃতিলাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে যা কোন সমাজের সুস্থ বিকাশের পরিপন্থি। তা ছাড়া সাম্প্রতিককালের রপ্তানীমূলক শিল্পে মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখ্য দাবী রাখে। উল্লেখ্য যে, ভূমিহীনতা, দারিদ্রতা ও নানা বিধ কারণে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক ভূমিকা দ্রুতগতিতে বদলিয়ে যাচ্ছে। মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ক্রম পরিবর্তনশীলতা এই বাস্তব চিত্রকে বিবেচনায় রেখেই যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা বাঞ্চনীয়।

৫.০ "উন্নয়নে নারী" ধারনার বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায়সমূহঃ

(ক) আমাদের দেশে তথা সমাজে মহিলাদের বিষয়ে দীর্ঘদিনের লালিত অনাকাংখিত নিয়ম, প্রথা ও বিশ্বাস জনিত কারণে ঘরে বাইরে মহিলার দুর্বল, অসহায় নির্ভরশীল ও উপেক্ষিত হচ্ছে। ফলে তারা সার্বিক অর্থে আর্থ-সামাজিকভাবে বৈষম্যের শিকার, এবং এ অবস্থায় তাদেরকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে পুর্ণ অংশগ্রহণে বাধার সৃষ্টি করছে।

(খ) আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে শত বাঁধার মধ্যেও যে অবদান তারা রেখেছে তা যথাযথভাবে সরকারী পরিসংখ্যানে প্রতিফলিত হয়না, ফলে তারা যোগ্য স্বীকৃতিলাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

(গ) মহিলাদের পক্ষে কর্মসংস্থান লাভ বস্তুতপক্ষে দুরূহ, তাছাড়া তারা যোগ্য পারিশ্রমিক লাভ থেকে বঞ্চিত। কর্মক্ষেত্রে মহিলারা মূলতঃ অদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ কাজে ব্যাপৃত থাকে এবং যে কোন প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রথম শিকার স্বাভাবিকভাবেই মহিলা গোষ্ঠি।

(ঘ) শিক্ষার অভাবে মহিলারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি লাভে ব্যর্থ হয়।

(ঙ) পর্যাপ্ত তথ্য ও পরিসংখ্যানের অভাবে মহিলাদেরকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূলধারায়-আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মাল্টি সেক্টোরাল প্রকল্প/কার্যক্রম প্রণয়ন বাধার সমুখীন হয়।

(চ) রাজনীতির ক্ষেত্রে ''উন্নয়নে নারী'' বিষয়ক ধারনার পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতির অভাবে দেশের উন্নয়ন নীতিমালা নারীদের জন্যে যথোপযুক্ত ভারসাম্যতা হারিয়ে ফেলে।

৬.০ বিগত পরিকল্পনাকালে উন্নয়নের মূল ধারায় মহিলাদের আনয়নের প্রয়াসঃ

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ''উন্নয়নে নারী'' বিষয়ক ধারনাটি তেমন প্রসার লাভ ঘটেনি, তাছাড়া তখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে পুনর্বাসনমূলক কর্মকান্ডই স্বাভাবিকভাবে গুরুত্ব পায়। পরবর্তীতে ১৯৭৮-৮০ মেয়াদের জন্যে প্রস্তুতকৃত দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় মহিলাদের বিষয়টির উন্নয়ন পরিকল্পনার ধ্যানধারনার অন্তর্গত করা হয়

এবং এ ব্যাপারে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়, যেমন, মহিলা বিষয়ক বিভাগ ও বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা বিষয়ক সংস্থা সৃষ্টি করা হয়। তাছাড়া মহিলাদের জন্যে কর্মসংস্থান, পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, কৃষিভিত্তিক কর্মসূচী, পুষ্টি ও শিশু যত্নের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পূর্বে গৃহীত কর্মসূচী চালু রাখা হয় এবং মহিলাদের স্বার্থ রক্ষার্থে কিছু আইনগত পদক্ষেপ নেয়া হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পূর্বের ধারাকে আরো বলবান করার প্রয়াস চালানো হয় এবং সেই সাথে নারীকে উন্নয়নমূলক খাতসমূহে সম্পৃক্ত করার উদ্যেগ নেয়া হয়। তবে সার্বিকভাবে এ সমস্ত কার্যক্রম ছিল অত্যন্ত সীমিত ও খন্ডিত।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় আনার জন্যে প্রথমবারের মত কার্যকরী নীতিমালা প্রণয়নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ বৈষম্য দূরকরণের প্রচেষ্টাকে চতুর্থ পরিকল্পনার একটি লক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

টাস্কফোর্সের সদস্যবৃন্দ তাদের বহুমুখী অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার আলোকে নারীদেরকে উন্নয়নের মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত কার্যকরী উন্নয়ন কৌশল নির্মাণের জন্য পুরো বিষয়টি প্রধান তিনটি ভাগে, যথা– অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নারীর বিশেষ সমস্যাজনিত ক্ষেত্র; বিভক্তকরতঃ বিস্তৃত পরিধিতে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছে। অত্র প্রতিবেদনের ৩য়, ৪র্থ ও পঞ্চম ভাগে তা পেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে "উন্নয়নে নারী" ধারনার বিকাশে যে সব অন্তরায় রয়েছে বলে বিষয়গুলো উল্লেখের দাবী রাখে তা অতি সংক্ষেপে বিবৃতকরতঃ কতিপয় সুপারিশমালা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৭.১ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রঃ

৭.১.১ কৃষিক্ষেত্রঃ

প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ নারী শ্রমজীবি প্রতক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি কর্মে নিয়োজিত।

কৃষি খাতে নিয়োজিত নারী শ্রমজীবির প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ পারিবারিক শ্রম হিসাবে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে থাকেন।

কৃষি ও অকৃষি খাতে নারী শ্রমিকের পারিশ্রমিক পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ।

মৎস্য উৎপাদন, পশুপালন ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারী ব্যাপকভাবে নিয়োজিত।

কৃষি খাতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে ব্যাপকভাবে নারীর কর্মচ্যুতি ঘটছে।

সুপারিশমালাঃ

–শস্য, খাদ্য, সেচ, পশুপালন, মৎস্য, ইত্যাদির সমন্বয়ে একটি সুসম–নারী কৃষি নীতি প্রণয়ন যার মূল উদ্দেশ্য হবে কৃষিখাতে নারীর অংশগ্রহণকে অধিকতর দৃশ্যমান করা যাতে করে কৃষির যাবতীয় ইনপুটসমূহে তার অধিকার সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

–কৃষি সম্প্রসারণের প্রশিক্ষণে কৃষিতে নারীর ভুমিকা বিশেষভাবে প্রতিফলিত করা ও কৃষি সম্প্রসারনে অধিক নারী নিয়োগ করা।

–কৃষি ঋণের শতকরা ১০ ভাগ নারী কৃষিজীবিদের জন্যে নির্দ্ধারিত রাখা।

–কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ নারীর প্রেক্ষিতকে গুরুত্ব দেয়া।

৭.১.২ শিল্প ক্ষেত্রঃ

–শিল্প উৎপাদন খাতে নিয়োজিত শ্রমের শতকরা ৩৬ ভাগ এবং কারখানা শ্রমিকদের শতকরা ২৮ ভাগ নারী শ্রমিক।

–নারী শ্রমিকগণ ব্যাপকভাবে ইউনিয়ন বহির্ভূত এবং পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় নারীর পারিশ্রমিক প্রায় এক পঞ্চমাংশ।

–প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ নারীদের ক্ষেত্রে সীমিত।

সুপারিশমালাঃ

–শ্রমনীতিমালা সম্পর্কে নারী শ্রমিকের সচেতনা বৃদ্ধি।

–শিল্প ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে সহজ শর্তে অধিক ঋণ দান।

–শিল্পক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের প্রতি বৈষম্যমুলক আচরণসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে "সেনসাস অফ ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাষ্ট্রির'' পক্ষ থেকে একটি বিশেষ জরিপ চালনা ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ।

–রপ্তানীমুখী শিল্পে নারী শ্রমিকের সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে একটি পৃথক লেবার কমিশনার নিয়োগ করা ।

৭·১·৩· কর্মসংস্থান ক্ষেত্রঃ

–নারী শ্রমিক পুরুষ শ্রমিক অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ২০০০ সালে নাগাদ শতকরা ২৫ ভাগ হারে নারী শ্রমজীবির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

–কর্মরত নারী শ্রমজীবীর মধ্যে শতকরা ২৭ ভাগ গৃহ পরিচারিকা হিসেবে নিয়োজিত।

–সরকারী চাকুরীতে মেয়েদের কর্মসংস্থান-মাত্র শতকরা ৬ ভাগ এবং সরকারের উচ্চ নীতি নির্দ্ধারণ ক্ষেত্র পরিপূর্ণভাবে নারী বিবর্জিত।

সুপারিশমালাঃ

–নারীকে নীতি নির্দ্ধারণের উচ্চ পর্যায়ে চুক্তি/আত্মীকরণ/লেটারেল এন্ট্রির মাধ্যমে নিয়োগদান এবং নারীর বিশেষ কোটা পাঁচ বছরের জন্যে শতকরা ২৫ ভাগে উন্নীত করা।

–পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ব্যাপকভাবে নারীদের নিয়োগ প্রদান।

–কর্মজীবী মহিলাদের জন্যে জেলা পর্য্যায়ে হোষ্টেল ও শিশু দিবা যত্নকেন্দ্র স্থাপন।

–সকল প্রশাসনিক প্রশিক্ষন কোর্সে উন্নয়নে নারীর প্রেক্ষিত সংযোজন করা।

৭·২ সামাজিক ক্ষেত্রঃ

৭·২·১ শিক্ষা ও প্রশিক্ষনঃ

–নারী শিক্ষার হার পুরুষ শিক্ষার হারের তুলনায় অর্ধেক এবং প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে মাত্র শতকরা ৫০ ভাগ মেয়ে শিশু ভর্তি হচ্ছে। শিক্ষাক্রম থেকে মেয়ে শিশুর ঝরে পড়ার হার ছেলে শিশুর তুলনায় দ্বিগুণ।

–দক্ষতাবৃদ্ধি ও কারিগরী বিষয়ক প্রশিক্ষন লাভের সুযোগ নারীদের ক্ষেত্রে খুবই সীমিত।

–শিক্ষা খাতে যে অর্থ ব্যয় হয় তার বিভাজনে মহিলাদের প্রতি বৈষম্য স্পষ্ট।

সুপারিশমালাঃ

–২০০০ সাল নাগাদ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্যে অন্তত শতকরা ৬৫ ভাগ মেয়ে শিশুকে শিক্ষাক্রমে ধরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

–মেয়েদের জন্যে যথাক্রমে শতকরা ১০ ও ১৫ ভাগ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল নির্দিষ্ট রাখা।

–প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের নতুন শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা ১০০ ভাগই মহিলা নিয়োগ করতে হবে।

–নারী শিক্ষা পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে শিক্ষা পরিদপ্তরে একটি বিশেষ "নারী শিক্ষা সেল" স্থাপন করা।

–এন, জিওদের নারী অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্যে উৎসাহিত করা।

৭·২·২ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিক[redacted]নাঃ

[redacted] স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ব্যাপা[redacted]পক উদাসীনতা ও অজ্ঞতা।

–নারী স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উদ্যেগজনক নিম্নহার।

–পরিবার পরিকল্পনায় শুধু নারীকে লক্ষ্য হিসেবে নির্দ্ধারণ করা।

–প্রচলিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অধিকাংশই নারী জনসংখ্যার আওতা বহির্ভূত থাকে।

সুপারিশমালাঃ

–প্রতি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ন্যূনতম ২৫ ভাগ বেড মহিলা রোগীর জন্যে নির্দ্ধারিত রাখা।

–মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগে উন্নীত করা।

–শিশুকন্যার স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকে অধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা।

–স্থানীয় পর্য্যায়ে সকল সরকারী স্বাস্থ্য ইউনিট পরিচালনায় নূন্যতম শতকরা ২০ ভাগ মহিলার উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

–পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষ গ্রাহকের অংশগ্রহণ জোরদার করা।

৭·২·৩ জমি ও গৃহায়নঃ

সুপারিশমালাঃ

–জমিতে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য জমি নীতির পূনর্বিন্যাস প্রয়োজন, বিশেষভাবে 'খাস' জমি কৃষিখাতে নিয়োজিত নারীর মধ্যে তখনকার ভিত্তিতে বিতরণ করতে হবে।

–আইন অনুযায়ী সকল কৃষি ও খাস জমি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের যুক্তনামে দলিলকৃত হতে হবে।

–গ্রামীণ ব্যাংকের অনুরুপ বিনা জমানতে শতকরা ৫ ভাগ হারে সকল তফসিল ব্যাংক মারফত মেয়েদের গৃহ নির্মাণ ঋণদান করতে হবে।

–'রাজউক কর্তৃক' শহরের শ্রমজীবি নারীদের জন্যে বিশেষ গৃহায়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

–নগরবাসী বিশেষতঃ বস্তিবাসীদের জন্যে উন্নত পানীয় ও পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করতে হবে।

৭·৩ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্রতিবেদনের পঞ্চম অংশে আলোচিত হয়েছে এমন কতগুলো সমস্যার কথা যা মেয়েদের আর্থ–সামাজিক অংশগ্রহণ বিশেষভাবে সীমিত করে এবং তাদের ব্যাপক বৈষম্যের শিকারে পরিণত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছেঃ

৭·৩·১ জাতীয় পরিসংখ্যানে মহিলাদের কর্মকান্ডের দৃশ্যমানতাঃ

সংগাগতঃ ও পদ্ধতিগত জটিলতা ও অস্পষ্টতার কারণে আর্থ–সামাজিক কর্মকান্ডে মহিলাদের যে অবদান ও ভূমিকা তা যথাযথ আকারে ও মাত্রায় জাতীয় পরিসংখ্যানে প্রতিফলিত হয়না। এ বাস্তবতা বস্তুত নারীকূলের প্রতি বিদ্যমান বৈষম্যেরই পরিচায়ক। ফলে উন্নয়নের মূল ধারায় মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চতকরণ প্রচেষ্টায় এ পরিস্থিতি এক অনাতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করে। এ অবস্থার আশু নিরসন দরকার।

সুপারিশমালা ঃ

বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের অবদান ও ভূমিকা পৃথকভাবে নির্দেশ করতঃ জাতীয় পরিসংস্থান ভান্ডার সৃষ্টি করতে হবে।

৭·৩·২ রাজনীতিতে নারীর অবস্থান ঃ

নারী পুরুষের সমতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে রাজনীতির মূলধারায় নারীর অংশ গ্রহণ এবং রাজনৈতিকভাবে তাকে সক্রিয় করার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকাকে নারীর মৌলিক অধিকার ও দীর্ঘ মেয়াদী সুষম উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ প্রসংগে নারীর সাংবিধানিক অধিকার ও ক্ষেত্র বিশেষে সংবিধানে নারীর অধিকার ক্ষুন্ন করার প্রক্রিয়াকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর সীমিত অংশ গ্রহণের অধিকার ও প্রকারসমূহ চিহ্নিত করে নিম্নলিখিত সুপারিশ রাখা হয়েছে।

সুপারিশমালা ঃ

– রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীকে অধিক দৃশ্যমান করতে হবে।

– নারীর প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কোটার মাধ্যমে তাকে রাজনীতির মূলধারায় আসার সুযোগ করে দিতে হবে। মেয়েদের রিজার্ভ সিটের সংখ্যা বর্তমানের ৩০ থেকে অন্ততঃ ৬০ এ উন্নীত করতে হবে এবং মেয়েদের জন্যে প্রত্যক্ষ ভোটে অংশ গ্রহণের জন্যে বিশেষ নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ করতে হবে।

– প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ১০–১৫ ভাগ আসনে মেয়েদের মনোনয়ন দান করার পক্ষে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

– একটি নির্ধারিত আনুপাতিক হারে মন্ত্রিসভায় নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।

– রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি আবেদন করা হয়েছে যাতে করে তাদের পার্টি মেনিফেষ্টোতে যথাযভাবে 'নারী প্রেক্ষিত' প্রতিফলিত হয় এবং শ্রেণী বৈষম্যের সাথে জেন্ডার ভিত্তি বৈষম্যসমূহ দুর করণের প্রচেষ্টার উল্লেখ থাকে।

– বিভিন্ন নারী সংস্থা ও ফোরামসমূহকে নারীর রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষিত করার লক্ষ্যে অধিক সংহত হওয়াপ্রয়োজন।

৭·৩·৩ নারী নির্যাতন, দেহ জীবিকা ও নারী পাচার সমস্যা ঃ

নারীর প্রতি ক্রমবর্ধমান নৃশংসতা ও চরম দারিদ্রের ফলশ্রুতিতে যে সব নারী দেহজীবিকা গ্রহণে বাধ্য হয় অথবা নারী পাচারের শিকারে পরিণত হয় বিদ্যমান আর্থ সামাজিক পটভূমিতে তাদের সমস্যা বিশ্লেষণের আলোকে নিম্নলিখিত সুপারিশ রাখা হয় ঃ

সুপারিশমালা ঃ

– নারী নির্যাতন মোকাবেলার জন্যে পুলিশ বাহিনীকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দান এবং অধিক হারে মহিলা পুলিশনিয়োগ।

– যৌতুক বিরোধী আইনের কঠোর প্রয়োগ।

– সমাজের সর্বস্তরে নারী নির্যাতন রোধে সামাজিক সচেতনা বৃদ্ধি।

– নারী দেহজীবিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সমাজে পুনর্বাসনের নব পদক্ষেপ প্রকল্প গ্রহণ।

– নারী পাচার রোধকল্পে সকল জনশক্তি রপ্তানী আইন পর্যালোচনা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কার্য্যবিধি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।

– এন, জি, ও এবং সরকারী সংস্থার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ভুক্তভোগী মেয়েদের আইন–সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থাগ্রহণ করা।

৭·৩·৪ **নারীর আইনগত অধিকার ঃ**

এ প্রসংগে প্রধানত মুসলিম আইনের আওতায় নারীর পারিবারিক, বৈবাহিক ও উত্তরাধিকার আইন এবং শ্রম আইনসমূহ আলোচিত হয়েছে ঃ

সুপারিশমালা ঃ

- সকল বিবাহ নিবন্ধীকরণ আবশ্যকীয়করণ।
- নারী ও পুরুষ উভয়কে তালাক ও সন্তানের অভিভাবকত্বের সমান অধিকার প্রদান।
- সম্পত্তিতে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ।
- নারী ধর্ষণের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনের ব্যাপক সংশোধনের মাধ্যমে ধর্ষিতার পক্ষে আইনের সাহায্য চাওয়া সহজতর করা এবং ধর্ষণকারীর কঠিন শাস্তির বিধান করা।
- স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতনের ক্ষেত্রে পারিবারিক কোর্টে মামলা দায়ের করার সুব্যবস্থা সৃষ্টি করা।

৭·৩·৫ **গণমাধ্যম ও নারী প্রতিকৃতি ঃ**

আমাদের সামাজিক রীতিনীতি ও প্রচলিত ধ্যানধারণার মাধ্যমে নারীর আনুগত্য ও বৈষম্যের যে প্রচ্ছন্ন চিত্রটি তুলে ধরা হয় তার জন্যে অনেকাংশে দায়ী আমাদের গণমাধ্যমসমূহ, যথা টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম।

সুপারিশমালা ঃ

- গণ মাধ্যমে নারীর তথাকথিত 'নারীত্বের' নামে তার আনুগত্য, সহনশীলতা ও অযৌক্তিকতাকে প্রতিফলিত না করা এবং নারীকে একটি মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে প্রতিফলিত করা।
- সকল প্রকার কালাকানুন বাতিল করে গণমাধ্যমসমূহের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।
- পাঠ্য পুস্তক, নাটক, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে বলিষ্ঠভাবে নারীর ইতিবাচক রূপ প্রতিফলিত করা।

৭·৩·৬ **সংস্কৃতি ও খেলাধুলায় নারী ঃ**

বিনোদনমূলক প্রয়োজন এবং একই সাথে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকে বিবেচনায় রেখে সংস্কৃতি ও খেলাধুলায় নারীকুলকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করার প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ নিম্নে পেশ করা হ'ল।

সুপারিশমালা ঃ

- বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
- স্কুল পর্যায়ে মেয়েদেরকে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক কর্মকান্ডে উৎসাহ দান।
- মহিলা শিল্পী ও ক্রীড়াবিদদেরকে আর্থিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান।
- বিভিন্ন ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠনে মহিলাদের অংশ গ্রহণে উৎসাহ দান।

৮·০ **কলাকৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ঃ**

প্রতিবেদনের ৬ষ্ঠ অংশে নারী উন্নয়নকে ম্যাক্রোফ্রেমওয়ার্কে সম্পৃক্ত করণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নারী উন্নয়ন বহু খাত ভিত্তিক হওয়ায় আন্তঃখাত সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ এর লক্ষ্যে একটি ''জাতীয় মহিলা উন্নয়ন কাউন্সিল'' গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে যার মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নারী উন্নয়ন কার্য্যক্রম সমন্বিত হবে।

৯·০ **উপসংহার ঃ**

টাস্ক ফোর্স মনে করে যে, উন্নয়নের মূল ধারায় নারীদেরকে আনয়নের লক্ষ্যে যে সব কলাকৌশল নির্মাণ করা হয়েছে তা বাস্তবায়নের সময়ে সংশ্লিষ্ট অন্তরায়/ইস্যুসমূহ বিশেষ বিবেচনায় রাখা হবে। এই সাথে টাস্কফোর্স আশা পোষণ করে যে, আলোচ্য বিষয়ে আশু পদক্ষেপ গৃহীত হবে।

টাস্ক ফোর্স ঃ বৈদেশিক বিনিয়োগ নীতি

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	অধ্যাপক এস, এ, লতিফুর রেজা	অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আহবায়ক
২।	ডঃ আয়ুবুর রহমান ভূঞা	ঐ	সদস্য
৩।	জনাব মুসফেকুর রহমান	অতিরিক্ত সচিব, ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	ঐ
৪।	ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফরিদ	মহাপরিচালক, বিআরডিবি	ঐ
৫।	জনাব হাবিবুর রহমান	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অক্সিজেন লিঃ	ঐ
৬।	জনাব জাহেদ হোসেন	প্রাক্তন পরিচলক, বিটিসি	ঐ
৭।	জনাব এ, হাসনাত খান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ অক্সিজেন লিঃ	ঐ
৮।	জনাব এ এস মাহমুদ	প্রেসিডেন্ট, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ	ঐ
৯।	ডঃ এ কে এ মুবিন	পরিচালক, টিআইপি, পরিকল্পনা কমিশন	ঐ
১০।	ডঃ মোঃ আলী রশিদ	সহযোগী অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়।	ঐ

বৈদেশিক বিনিয়োগ নীতি

আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের গুরুত্ব আজ প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। এমনকি অতি সাম্প্রতিককালের কট্টরপন্থী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক জোটভুক্ত দেশগুলোরও অধিকাংশই আজ নানারকম উৎসাহপ্রদ নীতিমালা গ্রহণের মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাই সারা বিশ্বের হিসেবে যা বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ আগের তুলনায় এখন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এ বাজারে প্রতিযোগিতাও তেমনি তীব্রতর হয়ে এসেছে। এক হিসেব অনুযায়ী ১৯৭০ দশকের শুরু থেকে ১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১০·৫ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার হতে ৪৮·৫ বিলিয়ন ডলার উন্নীত হয়েছে এবং এ বর্ধিত অংকের প্রায় অর্ধেকই বিনিয়োগ করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। এ সময়ের মধ্যেই এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের উন্নয়নশীল দেশসমূহের শতাংশ ভাগ প্রায় ৫ থেকে দ্বিগুণ হয়ে ১২তে উন্নত হয়। তবে অবশ্য বাংলাদেশসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশই এ বর্ধিত অংকের সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এদিকে বাংলাদেশের চিত্রটি নিতান্তই হতাশাব্যাঞ্জক। ১৯৮৭ সনে এ দেশে নীট বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল শুধুমাত্র ২ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার যখন এর পরিমাণ পাকিস্তান, শ্রীলংকা এবং চীনে ছিল যথাক্রমে ৬২, ২৯ এবং ১৬৬৯ মিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশে বিনিয়োগের প্রতি বিদেশীদের এ অনীহা অবশ্যিই ব্যাখ্যার দাবী রাখে। এ দেশের শিল্প ও বাণিজ্য নীতি পর্যায়ক্রমে বেশ উদারপন্থি করা হয়েছে। ১৯৮০ সনে বৈদেশিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রণীত আইন বৈদেশিক বিনিয়োগের জাতীয়করণ বা বেদখলীকরণের বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। নতুন শিল্প নীতি–১৯৮২ (যা ১৯৮৬ সনে সংশোধিত হয়েছে) ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্প প্রসারকে উৎসাহিত করার জন্য কতগুলো বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নিয়েছে। তদুপরি বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার নীতিমালা কাঠামোও এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট আকর্ষণীয়। যদিও নীতিমালায় বেশ কিছু ক্রুটি বিচ্যুতি এখনও রয়ে গেছে যার অধিকাংশই প্রস্তাবিত শিল্প নীতি ১৯৯০–এ শোধরানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তবুও স্পষ্টতঃই বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগের মুখ্য অন্তরায় হিসেবে এগুলোকে চিহ্নিত করা যায় না। বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হচ্ছে বিদ্যমান নীতিমালা ও অন্যান্য আইনসমূহের বাস্তবায়নে প্রশাসনিক জটিলতা যার ফলে একদিকে অসাধু পন্থার ব্যাপক বিস্তার শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে অপ্রতিযোগী করে তুলেছে। এর সাথে সাথে অনেক অনুষ্ঠিত শিল্প প্রকল্পও সূতিকাগারেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে আরো যেসব অসুবিধা এক্ষেত্রে বিদ্যমান সেগুলি হচ্ছে অর্থনৈতিক অবকাঠামোর অনুন্নয়ন, ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াও রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং শ্রমিক অশান্তি যা বাইরে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে যথেষ্ট ক্ষুন্ন করেছে।

যাই হোক, বাংলাদেশে বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ, গতিধারা এবং সংমিশ্রণের দিকে তাকালে অবশ্য সময়ের ব্যবধানে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে ঃ যেমন, ১৯৮০–এর দশকে বিনিয়োগের পরিমাণে তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি নিট বিনিয়োগের চেয়ে বিনিয়োগকৃত পুঁজির লব্ধ আয় হতে পুনর্বিনিয়োগের প্রাধান্য, কৃষিজাত খাতের গুরুত্ব কমে শিল্প ও ব্যবসা খাতের গুরুত্ব বৃদ্ধি, শিল্পখাতে নতুন নতুন দ্রব্যে (যেমন তৈরী–পোশাক ও খাদ্য দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ) অধিকতর বিনিয়োগ, বিনিয়োগক্ষেত্রে কতিপয় নতুন এশীয় দেশের (যেমন হংকং, কোরিয়া, সিংগাপুর) আবির্ভাব এবং লাইসেনসীং ও টেকনিক্যাল সাহায্যসহ কিছু নতুন ধরণের বিনিয়োগের প্রবেশ। এ সময়ের মধ্যে চট্টগ্রামে রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা চালু করাও বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগে বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

বাংলাদেশে এখন সাতটি সংরক্ষিত খাত ছাড়া (যা তিনটিতে নামিয়ে আনার প্রস্তাব রয়েছে) বর্তমানে মোটামুটি অন্যান্য যে কোনও শিল্পই শতকরা ১০০ ভাগ বিদেশী মালিকানাধীনেও স্থাপন করা যেতে পারে। কতগুলো শিল্পে (বিশেষ করে রুগ্ন শিল্পে) অবশ্য বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হয়। ১৯৮৮ সনে বোর্ড অফ ইনভেস্টমেন্ট স্থাপিত হওয়ার পর এখন শিল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াও আগের তুলনায় বেশ সহজ হয়ে এসেছে। অবশ্য

শিল্প এলাকায় যে সব অবকাঠামোগত সুবিধা অপরিহার্য্য যেমন গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, জমি এগুলি পাওয়া সবসময় অত সহজ হয় না। বি- এম-আর এবং বি- এম-আর-ই করার ব্যাপারেও কিছু কিছু সংকোচন নীতি নতুন দ্রব্যাদি ও প্রযুক্তি ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করে। পুরানো যন্ত্রপাতি আমদানীতেও যথেষ্ট বাধা নিষেধ রয়েছে। কাঁচামাল আমদানীতে একইভাবে শুল্ক ছাড়করণসহ অন্যান্য নানারকম ঝামেলা পোহাতে হয়। রপ্তানী বাণিজ্যিকে উৎসাহিত করার জন্য যেসব হাতিয়ার রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারেও প্রায়শঃই অভিযোগ শোনা যায়। সর্বোপরি বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের অভাবে বিদেশী কর্মকর্তা নিয়োগ এবং বিনিয়োগের উপর লাভ ও অন্যান্য অর্থ প্রেরণেও যথেষ্ট বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। বৈজ্ঞানিক বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য এসব সমস্যার বাস্তব সমাধান জরুরী ভিত্তিতে করা প্রয়োজন।

এছাড়া আরো কিছু সমস্যা রয়েছে। যেমনঃ বাংলাদেশে আবগারী শুল্কের হার পার্শ্ববর্তী অনেক দেশের তুলনায় অনেক বেশী। এর ফলে অবৈধ বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং কর ফাঁকীর প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা প্রয়োজন। বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হলে যেসব বৈদেশিক শিল্প প্রতিষ্ঠান এখানে উৎপাদনে নিয়োজিত রয়েছে তাদের সাথে সুষ্ঠু সম্পর্ক রাখাও প্রয়োজন। সম্প্রতি ওষুধ শিল্পে নিয়োজিত দুটো বিদেশী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ থেকে তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। গ্ল্যাক্সো গত পাঁচ মাস শ্রমিক সমস্যার আবর্তে নিপতিত ছিল। ঢাকায় একটি দিয়াশলাই প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বৈদেশিক সহযোগিতার সম্পর্কও বিপন্ন হতে চলেছে। যদিও এখানে ঢালাওভাবে বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা বা সাহায্য দেয়ার কথা বলা হচ্ছে না তবুও যে কোন অর্থনৈতিক নীতি পরিবর্তনে ও প্রণয়নে বিদেশী শিল্প সংস্থাগুলোর সাথে আলাপ আলোচনা করে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থকে সংরক্ষণের প্রচেষ্টা করা বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থেই প্রয়োজন মনে হয়।

তবে বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগ আকর্ষণে অবশ্য মুল কথা হচ্ছে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কে স্থিরতা অর্জন যা অর্থনৈতিক নীতিমালাগুলোর ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে পারে। আইনের শাসন কায়েম করে একটা সুশৃঙ্খল এবং উন্নয়নশীল জাতি হিসেবে বিদেশে আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সক্ষম হলেই কেবল বৈদেশিক পুঁজি দীর্ঘমেয়াদীভাবে এখানে বৃদ্ধি পেতে পারে। অন্যথা শুধুমাত্র নীতিমালার প্রলোভন দেখিয়ে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা বাংলাদেশের পক্ষে বর্তমানে কোন প্রকারেই সম্ভব নয়।

টাস্ক ফোর্স ঃ উনয়ন প্রশাসন

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	জনাব এ সামাদ	প্রাক্তন সচিব, সমুদ্র সম্পদ লিঃ	আহবায়ক
২।	জনাব খালেদ শামস	গ্রামীণ ব্যাংক	সদস্য
৩।	অধ্যাপক লুৎফুল হক চৌধুরী	বিভাগীয় প্রধান, জন প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	ঐ
৪।	জনাব আলমগীর ফারুক চৌধুরী	প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প।	ঐ
৫।	জনাব এম জয়নুল আবেদীন	অধ্যক্ষ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী।	ঐ
৬।	বেগম শামীমা ইসলাম	৬/৮ ইষ্টার্ণ হাউজিং এপার্টমেন্ট	ঐ

উন্নয়ন প্রশাসন

দেশের আপামর জনসাধারণ দীর্ঘ দিনের স্বৈরাচার শাসনের অবসানের পর একটি শোষণমুক্ত উন্নয়নমুখী দেশ গঠনে আশাবাদী। স্বৈরাচার শাসনামলে দেশবাসীর চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে ছিল একটি বিরাট ব্যবধান। বর্তমান গণতান্ত্রিক জোয়ারে জনগণের আশা আকাংখার পরিধি বৃদ্ধি পাইয়াছে অনেক গুণ। মধ্য প্রাচ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি, দেশের প্রকট অর্থনৈতিক সংকট, বৈদেশিক ঋণের বোঝা এবং অনুৎপাদন খাতে ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায়, পরিকল্পনার মুল লক্ষ্য ও জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় নাই। দেশের বিবিধ সমস্যা দূরীকরণ ও জনগণের দীর্ঘদিনের কাংখিত আশা পূরণের দায়িত্ব নুতন সরকারের উপর অর্পিত হইতে যাইতেছে যাহা বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীল অর্থনীতিতে যে কোন সরকারের পক্ষে সুরাহা করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইবে।

উন্নয়ন প্রশাসন সম্মন্ধে সুস্পষ্ট ধ্যান-ধারণা দেওয়ার জন্য অন্তবর্তীকালীন সরকার একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেন। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করিবার লক্ষ্যে আলোচ্য টাস্ক ফোর্স দেশের সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান উন্নয়ন প্রশাসনের ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন নীতিমালা, পরিকল্পনা ও প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ নূতন সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করিতেছে।

১। প্রকল্প প্রণয়ন, উহার সফল বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ণের ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থাসমূহের দায়-দায়িত্ব চিহ্নিতকরণ ও সুষ্ঠু যথাযথ পুনঃ বন্টন আবশ্যক।

(ক) পরিকল্পনা কমিশন জাতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য উন্নয়ন নীতিমালা এবং প্রয়োজনানুগ উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে সরকারকে সাহায্য করিবে;

(খ) এই কৌশলসমূহ প্রণয়নে পরিকল্পনাবিদ, প্রশাসক ও সাহায্যকারী সংস্থার সক্রিয় ভুমিকা থাকিবে;

(গ) পরিকল্পনা কমিশন দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের দায়িত্বও পালন করিবে;

(ঘ) পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত খাতওয়ারী উন্নয়ন কৌশলসমূহ অনুমোদন করিবে;

(ঙ) ''একনেক'' বড় ধরণের প্রকল্প অনুমোদন করিবে এবং অন্যান্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অনুমোদন করিবে;

(চ) পরিকল্পনা কশিশন পূর্ব নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে প্রকল্পের বিভিন্ন অংশ ও তাহাদের প্রাক্কলিত ব্যয়, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সংগতিপূর্ণ কিনা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে;

(ছ) পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন দিক বিবেচনান্তে প্রকল্পের গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করিবে;

(জ) পরিকল্পনা কমিশনের দীর্ঘ দিন যাবত শূন্য ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদটি অবিলম্বে পূরণের সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্ত পদাধিকারী একজন মন্ত্রীর মর্যাদা পাইবেন।

মন্ত্রণালয়- খাতওয়ারী পরিকল্পনা নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করিবে এবং অধীনস্থ সংস্থাসমূহের প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ণ কাজে নির্দেশনা প্রদান করিবে। অধীনস্থ সংস্থাসমূহের প্রণয়নকৃত সকল প্রকল্প অনুমোদন এবং জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করিবে। অধীনস্থ সংস্থা/প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে সুষ্ঠু কার্য সম্পাদনের স্বার্থে পর্যাপ্ত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ করিবে এবং প্রকল্পের কাজ তরান্বিত করিবার ব্যাপারে তদারকীর দায়িত্ব পালন করিবে। নির্ধারিত সময় এবং ব্যয়ে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সঠিকভাবে সম্পাদিত হইতেছে কিনা সেইদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিবে।

বিভাগ/অধীনস্থ সংস্থা - প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্বে থাকিবে। প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদানের প্রাক্কলিত ব্যয়, অর্থায়নের ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, কারিগরী সাহায্যের পরিমাণ, বাস্তবায়ন মেয়াদ ইত্যাদি বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। ''ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিষ্টেমে''র মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যাবলীর প্রকল্পের সঠিক মূল্যায়ণের ব্যবস্থা থাকিবে।

২। প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী দাতাসংস্থার মুল্যায়ণ ব্যতীত বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের কাজ শুরু করা যায় না বিধায় প্রকল্প প্রণয়ন পদ্ধতি পরিবর্তন করিতে হইবে। '' পূর্ব নির্ধারিত প্রকল্প তালিকা'' হইবে বৈদেশিক সাহায্য চাওয়ার মূল ভিত্তি। সংশ্লিষ্ট সংস্থা, মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনকে এই তালিকা এবং প্রকল্প প্রণয়নের কাজ অনেক আগে হাতে লইতে হইবে।

৩। উন্নয়ন বিনিয়োগে সরকারী ও বেসরকারী খাতের ভূমিকা গুরুত্ব সহকারে পুনঃ বিবেচনা করিতে হইবে। এতদসংক্রান্ত বিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের দায়-দায়িত্ব যথাযথ সম্পাদনের জন্য দিক নির্দেশনাসহ প্রয়োজনীয় ক্ষমতা পুনঃ নির্ধারণ করিতে হইবে এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারকে নূতন উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। প্রকল্প প্রণয়ন বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে মাত্রাতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিকতা পরিহার করিতে হইবে। বেসরকারী খাতের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সরকার আর্থিক সুযোগের ব্যবস্থা রাখিবে।

৫। সরকারী সংস্থায় নিয়োজিত সকল স্তরের কর্মকর্তাদের সততা নিশ্চিতকরণ ও কর্মস্পৃহা সমুন্নত রাখিবার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশসহ বেতন-ভাতাদি ও পদোন্নতির বিষয়াদি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করিতে হইবে। একই পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদির ক্ষেত্রে সমতা বিধান করিয়া বিভিন্ন ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে সংহতির সৃষ্টি করিতে হইবে। ক্যাডার বহির্ভূত কর্মকর্তাদের জন্য টাইম স্কেল পুনঃপ্রবর্তন করিয়া তাহাদেরকেও দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

৬। বিভিন্ন সংস্থা আওতাধীন উন্নয়ন বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা নিয়োগে কারিগরী ও প্রশাসনিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি নির্বাচন করিতে হইবে।

৭। কর্মচারী নিয়োগ, মালামাল ক্রয়, জমি হুকুম দখল, অর্থ অবমুক্তকরণ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্ব সময়মত সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে। চাকুরী নিয়মিতকরণসহ অন্যান্য সুবিধাদি নিশ্চিত করিয়া যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রকল্পের কাজে আকৃষ্ট করিতে হইবে।

৮। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ গুরুত্বানুসারে-

(ক) কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা;

(খ) জেলা পরিষদ;

(গ) উপজেলা পরিষদ; এবং

(ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ

বাস্তবায়ন করিবে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন উদ্যোগ ও সম্পদ আহরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক ও গ্রামীণ বহু সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে।

৯। সরকারী কর্মকান্ডের জবাব দিহির ব্যবস্থা সক্রিয় ও জোরদার করার জন্য নতুন প্রশাসনিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইবে। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, কৌশল ও খাতওয়ারী বরাদ্দ সম্পর্কে সংবাদ সংস্থাসহ অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমে জনগণকে অবহিত ও তাহাদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট মহলের অবগতির জন্য স্বল্প মূল্যে ছাপানো অনুমোদিত প্রকল্প দলিল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১০। জনগণ ও সরকারী কর্মকর্তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং সহযোগিতামূলক হওয়া প্রয়োজন। তাই সরকারী কর্মচারীদের কাজের গুণগতমান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়ন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদানে অহেতুক বিলম্ব দুর করিতে হইবে। জনগণের অভাব-অভিযোগ প্রশাসনিকভাবে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

১১। প্রকল্প বাস্তবায়ন পরীক্ষণের ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। প্রকল্পের কেবলমাত্র পরিমাণগত দিকের প্রতি গুরুত্ব প্রদান না করিয়া প্রকল্পের ফলাফলসহ গুণগত মানের গুরুত্ব প্রদান করা দরকার। বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলাফল পরিবীক্ষণের তেমন কোন ব্যবস্থা নাই। বাস্তবায়নাধীন এবং সমাপ্ত উভয় প্রকার প্রকল্পের নিয়মিত পরিবীক্ষণ মন্ত্রণালয়কেই করিতে হইবে। আই এম ই ডি এর দায়িত্ব জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী সাহায্য পুষ্ট বৃহৎ প্রকল্পে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। কোন কোন প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করা যাইতে পারে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মকর্তা, গবেষক ও জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা ও প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণার্থে একটি তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করিবে।

১২। মহিলা উন্নয়নে সরকারী চকুরীতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ বহুলাংশে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, চাকুরী ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও সুযোগ সৃষ্টি এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মহিলা বিষয়ক তথ্যের অপ্রতুলতা দুরীকরণের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

টাস্ক ফোর্স ঃ খাদ্যনীতি

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	জনাব মোহাম্মদ আলী	প্রাক্তন সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২।	ডঃ নঈম উদ্দিন চৌধুরী	আই পিএফ আর আই	সদস্য
৩।	ডঃ কে এ এস মোর্শেদ	বিআইডিএস	ঐ
৪।	জনাব মাহে আলম	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর	ঐ
৫।	ডঃ রহিস উদ্দিন আহমেদ	আইপিএফআরআই	ঐ

খাদ্য নীতি

এই প্রতিবেদন প্রসূত নীতিমালা বিষয়ক পরামর্শসমূহ দুইভাগে বিভক্তঃ স্বল্পমেয়াদী ও মাঝারী মেয়াদী। এর মধ্যে স্বল্পমেয়াদী পরামর্শসমূহ তৈরী হয়েছে চলতি অর্থ বছরের অনতিবাহিত সময়ের উপর ভিত্তি করে, মাঝারী মেয়াদী পরামর্শসমূহ প্রণীত হয়েছে ১৯৯১/৯২-১৯৯২/৯৩ সময়কালকে ধারণ করে।

স্বল্পমেয়াদী পরামর্শসমূহঃ মজুতবিরোধী আইন বিলুপ্তিসাধনের ব্যাপারে সরকারের স্থির সিদ্ধান্ত থাকা উচিত। কেননা এই রাজাজ্ঞা কোন সময়ই খাদ্যশস্য বাজারের ব্যক্তিমালিকানাধীন অংশের উপর বাস্তব প্রভাব ফেলতে পারেনি। বরং এই আইন যখন নামমাত্র কার্যকর ছিল তখনও ব্যবসায়ীদের লেনদেন ব্যয় বাড়িয়ে অর্থনীতিতে একটি 'রেন্ট সিকিং' চরিত্রকেই চাঙ্গা করে তুলত।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে গমের সাপেক্ষে সরকারী চালের মজুত কম। 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' ও 'দুঃস্থ মাতা উন্নয়ন কর্মসূচী'তে চাল এবং গমের অদল-বদলকে এর জন্য দায়ী করা যায়। আসন্ন 'নাজুক মওশুমে' অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল মাসে চালের মজুত আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেতে পারে।

ধানের সংগ্রহমূল্য মণপ্রতি-২২০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৪০ টাকায় নির্ধারণের সরকারী সিদ্ধান্ত আগামী বোরো মওশুমে শস্য সংগ্রহ অভিযানের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে। 'মিল গেইটে পারচেজ' এ ধরণের অভিযানের একটি সুবিধাজনক কৌশল, কিন্তু এই ব্যবস্থায় মিল মালিকদের লাভ কাম্য পরিমাণের তুলনায় অনেক বেশী। সম্ভবতঃ ১৯৯০ এর বোরো মওশুমে লক্ষ্যমাত্রাধিক সংগ্রহ মিলগেইট চুক্তিতে অধিক লাভজনকতারই প্রতিফলন। উল্লেখ্য, এই মওশুমে সরকারী লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৭৫০০০ মেট্রিক টন অধিক খাদ্যশস্য সংগৃহীত হয়েছিল। বস্তুতঃপক্ষে এই ব্যবস্থা সংগ্রহ মূল্যকে বাড়িয়ে দেয়। সংগ্রহ মূল্য না কমিয়েও এই ব্যবস্থার আকর্ষণীয় লাভজনকতাকে কমানো সম্ভব। ধান-চালের প্রচলিত অনুপাত বৃদ্ধি করে আগামী বোরো মওশুমেই এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা যেতে পারে।

মাঝারী মেয়াদী নীতিমালা পরামর্শঃ ১৯৯১/৯২ ও ১৯৯২/৯৩ অর্থ বছরে SR এবং OP এর উপর ভর্তুকী তুলে নেয়া উচিত এবং কোটা আরও কমিয়ে দেয়া প্রয়োজন। এটি হবে বাংলাদেশ সরকারের সহিত যুক্তরাষ্ট্র সরকারের চুক্তি ৪৮০-র এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোটা কমিয়ে সরকার গমের মজুদ স্বল্পতার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে কারণ SR এর আওতায় শুধু গমই সরবরাহ করা হয়। ফিনান্সিয়াল অর্থনীতির স্বার্থে, EP এর ক্ষেত্রে একক প্রতি বাজেট ভর্তুকী আরও কমিয়ে দেয়া উচিত এবং একই সাথে প্রতিরক্ষা এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ভর্তুকী তাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের বাজেটভুক্ত করা উচিত-খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নয়।

আগামী বছর দু'একের মধ্যে LE এবং FM ব্যবস্থার বিলুপ্তিসাধন করা উচিত। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই LE'র আওতায় শস্য কিনে না, সুতরাং এই রুগ্ন ব্যবস্থাকে লালন করা যুক্তি নির্ভর নয়। ময়দা মিল মালিকদেরও আর অগ্রাধিকার সুবিধা পাওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ বিগত বছরগুলোর সুবিধার ভিত্তিতে তারা এখন যথেষ্ট সংগঠিত এবং সম্পদশালী। অতএব, তারা এখন খোলা বাজার থেকেই চাহিদা মাফিক গম সংগ্রহ করতে সমর্থ। যে সময়ে ময়দাকলসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল, তখন গমের বাজার ছিল খুব ছোট। কিন্তু সে তুলনায় গমের বাজার এখন অনেক বেড়েছে। এ ছাড়া ময়দাকল মালিকরা তাদের বর্তমান অবস্থানে থেকে আমদানীর মাধ্যমেও তাদের চাহিদা মেটাতে পারে। বর্তমানে গমের CIF মূল্য এবং আটার খুচরা মূল্যের যে ব্যবধান, এই ব্যবধান বিরাজ করলে বৃহৎ বেকারী শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে গম আমদানী সম্ভব। তাছাড়া, গত তিন চার বছর ধরে গমের আন্তর্জাতিক বাজার দর প্রকৃত অর্থে (Real term) কম এবং গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সম্ভাবনাও গমের প্রকৃতমূল্য নিচু স্তরে রাখার ক্ষেত্রে অনুকূল ভূমিকা রাখতে পারে।

পল্লী রেশনিং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে ১৯৮৯'র এপ্রিল মাসে। এই কর্মসূচী বর্তমানে IFPRI' ওয়াশিংটন এর গবেষণাধীন, সুতরাং এই কর্মসূচী চালিয়ে যাওয়ার যথার্থতা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা হচ্ছে না। তবুও এটুকু বলা যায় যে, এই কর্মসূচীর আওতা বৃদ্ধি করা নতুন সরকারের উচিত হবে না। সরকারের বর্তমান সম্পদ সীমাবদ্ধতার আলোকে এই কর্মসূচী যথার্থই ব্যাপক। এই মুহূর্তে এটিই একমাত্র বৃহৎ মুদ্রায়িত (monetised) সরকারী শস্য সরবরাহ পথ।

মূল্যস্থিতিশীল রাখার কৌশল হিসাবে OMS অবশ্যই থাকা উচিত। বাস্তবে, যেখানে বেশীর ভাগ (Monetised Channel), খাদ্যশস্যের আয়তনের দিক থেকে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়তে বাধ্য, সেখানে OMS শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে OMS এর প্রায়োগিক দিকসমূহকে পরিবর্তিত বাজার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নিতে হবে। যেহেতু IFPRI বর্তমানে সংগ্রহমূল্য এবং কাঙ্খিত স্থিতিশীল মূল্যের ব্যবধান নির্ণয়ের উপর কাজ করছে, সেহেতু এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা এবং স্বরূপ সম্পর্কে যথার্থ ধারণা নিয়েই মন্তব্য করা উচিত। এখানে মূলতঃ ব্যক্তিমালিকানাধীন খাদ্যশস্য বাজারের স্বাভাবিক লাভজনকতার উপরই আলোকপাত করা হবে, যা কিনা OMS এর প্রায়োগিক কার্যকারিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে পরিবর্তনশীল। অতএব, প্রতি তিন বছর অন্তর নমুনা জরিপের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বাজারে লাভজনকতা পরিমাপ করা একান্ত বাঞ্চনীয়। দ্বিতীয়ঃ OMS ব্যবস্থায় মূল্য আপেক্ষিকতার প্রেক্ষিতে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন খাদ্যশস্য বন্টন ব্যবস্থায় (সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ ইত্যাদি স্তরে) শস্যের মান নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরী। এমনকি সমস্ত নিয়ন্ত্রিত মূল্য যথার্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও কেবলমাত্র OMS ব্যবস্থায় সরবরাহকৃত শস্যের নিম্নমানের কারণে বাজার উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ শুধুমাত্র একটি যথাযথ মূল্যনীতি খাদ্যশস্য বন্টন ব্যবস্থার যথার্থ কার্যকারিতার বিকল্প হতে পারে না।

অমুদ্রায়িত ব্যবস্থার (Nonmonetised Channels) কিছু প্রায়োগিক দিক এর উন্নয়ন সাধনা সম্ভব। প্রথমতঃ 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী' আওতাভুক্ত শ্রমিকদের মজুরী (গম) আংশিক মুদ্রায় রূপান্তর অনেকের কাছেই একটি সম্ভাব্য দিক। বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী প্রায় বিশ্বব্যাপী 'আংশিক খাদ্য আংশিক নগদ' মজুরী নীতি চর্চা করে। যখন শ্রমিকরা এমন সব প্রকল্পে কাজ করে যার উপকারিতা তারা বা তাদের পরিজন সরাসরি ভোগ করে, শুধুমাত্র সেই সব ক্ষেত্রেই মজুরী খাদ্য হিসাবে প্রদান করা হয়। কিন্তু এর কোনটিই বাংলাদেশের 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর' ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না। বাজেটগত Constraints এর কারণে 'আংশিক খাদ্য আংশিক নগদ' এই কর্মসূচী Infeasible, সরকারের এ যুক্তিও সন্তোষজনক নয়[১]। যেমন, সরকারী বন্টন ব্যয় কমিয়ে যে বাজেট সঞ্চয় তৈরী করা সম্ভব তা হিসাবে নিয়ে এই যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছে কিনা পরিষ্কার নয়। খাদ্যশস্যের আংশিক মুদ্রায় রূপান্তরের বিষয়টি আরও অধিক পরীক্ষা নিরীক্ষার দাবী রাখে। বিশেষতঃ অল্প সংখ্যক বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে বৃহৎ পরিমাণ সাহায্য (গম) শস্য মুদ্রায় রূপান্তরকরণের কারণে মূল্যের উপর কোন বিপরীত প্রভাব এখন পর্যন্ত স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়নি।

VGD শস্যের মুদ্রায় রূপান্তরকরণও অগ্রাধিকারযোগ্য নয়। কারণ এই কর্মসূচী মূলতঃ দুঃস্থ মহিলাদের সরাসরি পুষ্টি সরবরাহের উদ্দেশ্যেই গৃহীত। এছাড়া জরিপের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, VGD কর্মসূচীর দুই তৃতীয়াংশ সুবিধাভোগকারীই শারীরিক অথবা সামাজিকভাবে অথর্ব মহিলা খানা প্রধান। এক্ষেত্রেও দুঃস্থ পুরুষদের ব্যাপারটি বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। সর্বোপরি এই ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুংখ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২০০০ সালের জন্য নির্ণিত খাদ্যঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় 2 MMT গম ও 2 MMT চাল। যদিও ২০০০ সালের পথ পরিক্রমায় এখনও ৯ বছর বাকী, তবুও কিছু কিছু নীতিমালায় এখনই কিছু পরিবর্তন আনা উচিত। এ'জন্য চালের আভ্যন্তরীণ ভোগ ও রপ্তানী বৃদ্ধি এবং গমের চাহিদা সংরক্ষণ করা উচিত।

একটি সাম্প্রতিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, চলতি বছরের ১লা জুলাই পর্যন্ত সময়কালের জন্য কাঙ্খিত সরকারী খাদ্যশস্য মজুত হওয়া উচিত এক মিলিয়ন মেট্রিক টন। অতএব, এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে বর্তমানে প্রচলিত সরকারী মজুতনীতিকে ঢেলে সাজানো উচিত। এটাও দেখানো হয়েছে যে, মজুত-শূন্যতা মোকাবেলার জন্য চলতি মজুতের পরিমাণও ০.৪ মিলিয়ন মেট্রিক টনে নামিয়ে আনা যেতে পারে। অবশ্য, এই ব্যবস্থার কার্যকারিতার জন্য

সরকারী Offtake চাহিদা মেটানোরকল্পে খাদ্য শস্যের আমদানী/সাহায্য উভয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে আগাম ফরমায়েশ তৈরীর নীতি গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ মাসিক Offtake চাহিদা মেটানোর জন্য নিয়মিতভাবে আগাম ফরমায়েশ তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে। টাইম সিরিজ তথ্যের মাধ্যমে Offtake চাহিদার Confidence Interval হিসাব করা যেতে পারে। অবশ্য অতিরিক্ত বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতার কারণে যদি একমাস সময়কাল খুব ছোট হয় তবে এই মেয়াদ বৃদ্ধি করে দুই, এমনকি তিন মাস করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে শুধু মাত্র ফরমায়েশকৃত খাদ্য শস্যের পরিমাণই আনুপাতিকভাবে বেশী হবে। কিন্তু চলতি মজুতের পরিমাণ ৪ লাখ টনেই স্থির রাখা যেতে পারে। যদি এ-ধরনের একটি প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যায় তাহলে মজুত শূন্যতার সম্ভাব্যতাকে খর্ব না করেও জাতীয় সহায়কে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব। সরকারী মজুত কমানোর স্বার্থে এ ধরণের নিয়মিত আগাম চাহিদা নিরূপন চর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। যতদিন পর্যন্ত খাদশস্য সাহায্য প্রাপ্তির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকবে ততদিন পর্যন্ত এ'ধরণের উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন মজুত নীতি গ্রহণের প্রয়োজন অনুভূত হবে সামান্য। কিন্তু খাদ্যশস্য সাহায্য ভবিষ্যতে কমে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে এ ধরণের একটি ব্যবস্থা খুব সহজেই গ্রহণ করা যাবে।

এই অবস্থা এবং আগামী দিনগুলিতে চালের উদ্বৃত্ত সৃষ্টি এবং বিদেশে রপ্তানীর সম্ভাব্যতার প্রেক্ষিতে, আন্তর্জাতিক বাজার সম্পর্কে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এশিয়া মহাদেশের বেশীর ভাগ চাল উৎপাদনকারী দেশেই এ'ধরণের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ এবং শ্রম পুরস্কৃত হয়েছে।

এ ধরণের প্রজ্ঞা বিভিন্নভাবে ভূমিকা রাখতে পারে, যেমনঃ (ক) চুক্তি সম্পাদনে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ, (খ) আকর্ষণীয় মূল্য Quotation, (গ) বিক্রেতার সহিত দর কষাকষি ইত্যাদি। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মূল কর্মকর্তাদের দ্রুত Turn-over এর মাধ্যমে এ'ধরণের দক্ষতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রেও চাকুরীতে স্ব স্ব অবস্থানে দক্ষতার উন্নয়নসাধন অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক খাদ্যশস্য বাজারে প্রধান প্রধান রপ্তানীকারকদের সংগে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পর্কস্থাপন এবং দরাদরির দক্ষতা অর্জন সহজসাধ্য নয়। কিন্তু এ'ধরণের দক্ষতা একবার অর্জন করা গেলে তার Benefit/Cost অনুপাত সবসময়ই ধনাত্মক হয়। আগামী দিনগুলিতে খাদ্যশস্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা ক্ষীণ হওয়ার সাথে সাথে আন্তর্জাতিক বাজারের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পাবে তাই এ সবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বাজার সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা।

টাস্কফোর্স ঃ যমুনা বহুমুখী সেতু বিষয়ক

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	জনাব নূরুল হক	প্রাক্তন সদস্য পরিকল্পনা কমিশন	আহবায়ক
২।	জনাব সফিউল আলম	ভাইস চেয়ারম্যান যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৩।	ডঃ জে আর চৌধুরী	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪।	ডঃ সেলিম জাহান	অর্থনীতি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫।	ডঃ আলমগীর মুজিবুল হক	ডিপার্টমেন্ট অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬।	জনাব এস, টি, এস, মাহমুদ	প্রধান প্রকৌশলী, পিডিবি	সদস্য
৭।	জনাব এ, এ, খান মজলিস	যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৮।	জনাব এ, কে, এম, সামসুল হক	যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য

যমুনা বহুমুখী সেতু

যমুনা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ দীর্ঘদিনের জাতীয় আকাংখা। কিন্তু নদীর প্রশস্থতা, গতিপথ নিয়ন্ত্রণ, ভূমিকম্প অধ্যুষিত নরম মৃত্তিকাবিশিষ্ট এলাকায় ভিত্তি স্থাপন, নদী ভাংগন জনিত সৃষ্ট অবস্থা ইত্যাদি কারণে সেতু নির্মাণ কার্য্যক্রম প্রকৌশগতভাবে জটিল বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু ১৯৬৯ এবং ১৯৭২-৭৬ সালে সেতু নির্মাণ বিষয়ক সমীক্ষা হইতে প্রতিভাত হয় যে কারিগরী দিক হইতে সেতুটি নির্মাণ সম্ভব হইলেও ব্যয়াধিক্যের কারণে (১৯৭৫ সালের মুদ্রামানে ৮৬৩ মিঃ মার্কিন ডলার) সেতু নির্মাণ কার্য্যক্রম অর্থনৈতিকভাবে আকর্ষণীয় নহে।

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ দেশের পূর্বাঞ্চল (যেখানে গ্যাস ফিল্ডসমূহ অবস্থিত) হইতে পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সড়ক ও রেল পরিবহন এবং বিদ্যুৎ ও গ্যাস সঞ্চালনমূলক বহুমুখী কার্য্যক্রম একটি সেতু নির্মাণ করা হইলে তাহা অর্থনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে বলিয়া অনুমান করা হয়। এই পটভূমিতে ১৯৮৫ সালে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয় এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার আর্থিক সহযোগিতায় দুই পর্বে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়।

যমুনা ও পদ্মা নদীর ৭টি বিভিন্ন স্থানের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনার পর কারিগরী ও আর্থিক দিক বিবেচনায় সিরাজগঞ্জের ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে সেতুটি নির্মাণের জন্য সর্বাধিক উপযোগী স্থান হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে।

সেতুতে রেল স্থাপন বিষয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান আছে। সমীক্ষাকারী পরামর্শকগণ (আরপিটি/নেডেকো/বিসিএল) মিটার গেজ রেল সহ সড়ক সেতু নির্মাণ অর্থনৈতিক দিক হইতে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছে। কিনতু আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) মনে করে যে সামগ্রিক প্রকল্পটি অর্থনৈতিক দিক হইতে যুক্তিযুক্ত হইলেও সেতুতে রেল স্থাপনজনিত অতিরিক্ত ব্যয় ও রেল হইতে প্রত্যাশিত উপযোগ (benefit) বিবেচনায় গ্রহনযোগ্য নয়। যেহেতু আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা সম্ভাব্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার নেতৃত্বে আছে কাজেই তাহাদের মতামতের প্রেক্ষিতে ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ, ১৮.৫ মিটার প্রশস্থ সেতুর নকশা এমন ভাবে প্রণয়ন করা হইয়াছে যাহাতে সেতুর ভিত্তিতে কোনরূপ অতিরিক্ত কার্য্যসম্পাদন ছাড়া শুধুমাত্র উপরের (Superstructure) গার্ডার শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে মিটারগেজ রেলস্থাপন করা সম্ভব হইবে। ফলে প্রস্তাবিত বহুমুখী সেতুতে শুরুতে কেবলমাত্র সড়ক সেতু ও দ্বিতীয় বিদ্যুৎ সংযোজকের ব্যবস্থা থাকিবে। পরবর্তী পর্য্যায়ে মিটারগেজ রেল ও গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন করা যাইতে পারে। এই ব্যবস্থায় ১৯৯০ সালের মুদ্রামানে সেতু নির্মাণের ব্যয় হইবে ৫৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিগত ২ দশকে নির্মাণ প্রযুক্তির উন্নতির কারণেই সেতু নির্মাণজনিত ব্যয় ও সময়কাল সংকোচনে সহায়ক হইয়াছে।

সেতু নির্মাণ সংশ্লিষ্ট সকল কাজের দরপত্রসমূহ প্রস্তুত করা হইয়াছে। নির্বাচিত ঠিকাদারদের তালিকা চূড়ান্ত করা হইয়াছে। সেতু নির্মাণ, নদী প্রশাসনজনিত কাজ এবং প্রবেশ সড়ক নির্মাণজনিত দরপত্র ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে জারী করার কার্য্যক্রম নির্ধারিত থাকিলেও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার পরামর্শক্রমে ইহা করা হয় নাই। সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্য্যক্রমের প্রেক্ষাপটে যমুনা বহুমুখী সেতুর অর্থায়নের সম্ভাব্যতার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্রশ্ন উথাপন করিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার চতুর্থ পরিকল্পনার একটি অগ্রাধিকার বিনিয়োগ কার্য্যক্রম প্রণয়ন করিয়াছে এবং উহার অনুসরণে প্রথম ৩ বৎসরের কোর (Core) আবর্তক কর্মসূচী (১৯৯০-৯৩) প্রণয়ন করা হইয়াছে। টাস্ক ফোর্স চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সার্বিক অগ্রাধিকার কার্য্যক্রম এবং প্রথম ৩ বৎসরের কোর আবর্তক কর্মসূচী পর্য্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণ কার্য্যক্রম গ্রহণ করিলেও উচ্চ অগ্রাধিকার সম্পন্ন অন্য কোন প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যাহত হইবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রকল্পটির বাস্তবায়নযোগিতা গ্রহণযোগ্য (Affordable)।

সম্ভাব্য বৈদেশিক সাহায্য সংস্থা/দেশ (আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং জাপান) হইতে এই পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য হইতে অনুমান করা যায় যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। প্রকল্পটির স্থানীয় ব্যয় সংকুলানের জন্য ১৯৮৫ সাল হইতে সংগৃহীত সার-চার্জ ও লেভী আদায় করা হইতেছে। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ২৮২ কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে ইহার জন্য একটি স্বতন্ত্র হিসাব রক্ষা করা হয়। শুল্ক ব্যতীত স্থানীয় মুদ্রার পরিমাণ আনুমানিক ৩৯৭ কোটি টাকা (১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ)।

যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণের দরুন পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন ও দূরীকরণার্থে ভূমি অধিগ্রহণজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের পুনর্বাসন, ভূমি ব্যবহারজনিত মাষ্টার প্লান, সংশ্লিষ্ট এলাকার পানি নিষ্কাসণ, বন্যপ্রাণী এবং মৎস্যের উপর প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সমীক্ষা করা হইতেছে। ইহা ছাড়া নদী শাসন কার্য্যক্রমের জন্য কঠিন শিলা সংগ্রহের জন্য চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি সমীক্ষা সম্পাদন করা হইয়াছে। এই সমীক্ষার ফলাফল হইতে বুঝা যায় যে উক্ত এলাকায় প্রাপ্তব্য কঠিন শিলা নদী শাসন কার্য্যক্রমের জন্য উপযুক্ত দিক বিবেচনায়ও সুবিধাজনক হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

১৯৯১ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখের সেতুর পূর্ব তীরে সড়ক তথা বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধের নির্মাণ কাজ শুরু করা হইয়াছে। ১৯৯১ সালের জুন মাসের মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণের কাজ সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রকল্পটি দ্বিতীয় বিদ্যুৎ সংযোজক এর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যমুনা নদীর উপর পৃথকভাবে দ্বিতীয় বিদ্যুৎ সংযোজন করিতে হইলে যে ব্যয় হইবে, সেতু নির্মাণ করা হইলে উহার সাশ্রয় হইবে। বস্তুতঃপক্ষে এই সাশ্রয়ের ফলেই প্রস্তাবিত বহুমুখী সেতু অর্থনৈতিক ভাবে যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। কাজেই দ্বিতীয় বিদ্যুৎ সংযোজক এর নির্মাণ কাজ ১৯৯৫ সালের মধ্যে অবশ্যই সমাপ্ত করিতে হইবে। প্রস্তাবিত সেতু নির্মাণ সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যদি ত্বরান্বিত করা হয় তবে ১৯৯২ সালের আগষ্ট মাসে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করা এবং ১৯৯৫ সালের শেষ নাগাদ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে। পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহিত আলোচনায় জানা গিয়াছে যে ত্রিবার্ষিক কোর আবর্তক কর্মসূচীতে (১৯৯০-৯৩) দ্বিতীয় বিদ্যুৎ সংযোজক এর স্থল অংশের নির্মাণজনিত কার্যক্রমের জন্য কোন বরাদ্দ রাখা হয় নাই। আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে এই কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন।

সেতুর শুরুতে রেল অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিচালন ব্যবস্থা উন্নতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করার আবশ্যকতা আছে।

প্রস্তাবিত বহুমুখী সেতুটি বাস্তবায়িত না হইলে মাল ও যাত্রী পরিবহণের জন্য সড়ক পথে বিদ্যমান আরিচা-নগরবাড়ী এবং ভুয়াপুর-সিরাজগঞ্জের মধ্যে ফেরী চলাচল ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে। অনুরূপভাবে রেল পরিবহনের ক্ষেত্রেও বাহাদুরাবাদ-তিস্তামুখঘাট এবং জগন্নাথগঞ্জ-সিরাজগঞ্জ এর মধ্যে ফেরী পারাপার ব্যবস্থা চালু রাখিতে হইবে। ক্রমবর্ধমান সড়ক যানবাহন চলাচলের চাহিদার প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত ফেরী চলাচল সুবিধা সৃষ্টিতে একটি হিসাবমতে ১৯৯৩-২০২০ সালের মধ্যে ১৯৪.৭-২০৬.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রয়োজন হইবে। বিকল্প হিসাবমতে নদী শাসনসহ রেল ও সড়ক ফেরী কার্য্যক্রমের জন্য ২০০০—২০২০ সালের মধ্যে যথাক্রমে ৮০ মিলিয়ন ও ২২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রয়োজন হইবে। ইহাছাড়া আবর্তক ব্যয় ২০০০ সালে আনুমানিক ১০-১১ মিলেয়ন মার্কিন ডলার হইতে ২০২০ সাল নাগাদ ২৫-৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে বৃদ্ধি পাইবে।

দেশের পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যুৎ চাহিদা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৯৪ সালের প্রথম হইতেই বিদ্যমান বিদ্যুৎ সংযোজক কর্তৃক সঞ্চালিত বিদ্যুতের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন হইবে। দ্বিতীয় বিদ্যুৎ সংযোজক নির্মাণ করা না হইলে বিকল্প হিসাবে ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করিতে হইবে। বড় পুকুরিয়া

কয়লাভিত্তিক দুই ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করিতে প্রায় ১৮০০ কোটি টাকা (৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ) প্রয়োজন হইবে। ২০০০ সালের পূর্বে বড়পুকুরিয়া হইতে কয়লা উত্তোলন ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। অপর বিকল্প হইতেছে গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ। ইহা ব্যয় সাপেক্ষ ও আমদানীকৃত জ্বালানীর উপর নির্ভরশীল।

স্বতন্ত্রভাবে দেশের পশ্চিমতীরে গ্যাস সরবরাহ করিতে ২২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১৯৮৭ সালের মুদ্রামানে) প্রয়োজন হইবে। দেশের পূর্বাঞ্চলে সামগ্রিক গ্যাস রিজার্ভ নির্ণীত না হওয়ায় শুরু হইতে যমুনা সেতুর মাধ্যমে গ্যাস পরিবহণ করা হইবে না। পূর্বাঞ্চলে গ্যাস রিজার্ভের পরিমাণ যথেষ্ট বিবেচিত হইলে সেতুর উপর দিয়া পরবর্তী পর্যায়ে গ্যাস পশ্চিমাঞ্চলে সরবরাহ করা সম্ভব হইবে। ফলে গ্যাস পরিবহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে সেতুর বদৌলতে প্রায় ২২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ সাশ্রয় হইবে।

টাস্কফোর্স এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে কারিগরী ও অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণ কার্যক্রম যুক্তিযুক্ত এবং সেতুটি নির্মাণের বিষয়ে সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবীদার।

টাস্কফোর্সঃ উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কঃ ইস্যুসমূহ ও অভিমত।

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	জনাব এম, মনিরুজ্জামান	প্রাক্তন সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	আহবায়ক
২।	জনাব কে, এম, এজাজুল হক	যুগ্ম-সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
৩।	ডঃ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য	বিআইডিএস	ঐ
৪।	জনাব সৈয়দ জামাল উদ্দিন	যুগ্ম প্রধান, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	ঐ
৫।	বেগম সাদেকা সফিউল্লাহ	উপ-সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	ঐ
৬।	ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান	সহযোগী অধ্যাপক, হিসাব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ঐ
৭।	ডঃ এম. সোহরাব উদ্দিন	নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ ব্যাংক।	ঐ

উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কঃ ইস্যুসমূহ ও অভিমত

একথা অনস্বীকার্য যে ভূমিকা ও গুরুত্বের উভয়বিধ দৃষ্টিকোণ থেকে বৈদেশিক সাহার্য্য বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়ন প্রচেষ্টার অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপাদান। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী 'ত্রাণ ও পুনর্বাসন পর্ব' এবং তৎপরবর্তী 'পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাধীন পর্বসমূহ' এ দুই পর্যায়েই বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশে অপরিহার্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। আভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের সীমাবদধতা ও উন্নয়ন চাহিদার ব্যাপকতার প্রেক্ষাপটে সঞ্চয় বিনিয়োগের প্রধান মোকাবেলা আমদানী ব্যয় রপ্তানী আয় পার্থক্যের সাশ্রয়, রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়ের সাশ্রয় ইত্যাদির জন্য 'অর্থ সংকুলানের' প্রয়োজনীয়তার কারণে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বৈদেশিক সাহায্যের বার্ষিক অন্তঃপ্রবাহ জি,ডি,পি'র প্রায় ৭-৮% স্বাধীনতা পরবর্তীকালে খাদ্য, পণ্য ও প্রকল্প খাতে ঋণ, অনুদান ও সাহায্য হিসাবে মোট প্রাপ্তি ছিল প্রায় ১৯০০ কোটি ডলার (জুন,১৯৮৯)। আশির দশকে বৈদেশিক সাহায্যের বার্ষিক গড় প্রতিশ্রুতি ও অবমুক্তি ছিল যথাক্রমে প্রায় ১৭০ কোটি ডলার ও ১৩০ কোটি ডলার; বিগত তিনটি পঞ্চবার্ষিক পকিল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের যোগান ছিল মোট পরিকল্পিত ব্যয়ের যথাক্রমে ৭২%, ৬৪% ও ৬৫%। জুন ১৯৮৯ পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ৯৯০ কোটি ডলার এবং বর্তমানে বার্ষিক ঋণ পরিশোধ দায় বার্ষিক রপ্তানী আয়ের শতকরা প্রায় ১৯ ভাগের সমান। স্বাভাবিকভাবেই নির্ভরশীলতার উল্লেখিত প্রেক্ষাপটে সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক এবং সংশ্লিষ্ট ইস্যুসমূহ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিতে নিয়ামক গুরুত্বের দাবীদার।

২। বৈদেশিক সাহায্যের পেছনে যে যুক্তিটি সাধারণতঃ মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে তা হল এই যে, বৈদেশিক সাহায্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে প্রাথমিক নির্ভরশীল থেকে স্বয়ংম্ভর অর্থনীতিতে উত্তরণের একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে, সঞ্চয় ও আভ্যন্তরীন সম্পদ আহরণে প্রসারিত হবে, ক্রমান্বয়ে আমদানী নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে, রপ্তানী বাজার সম্প্রসারিত হবে, বৈদেশিক ঋণ ভার সংকুচিত হয়ে আসবে এবং অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার স্থলে উত্তরোত্তর ও ক্রমান্বয়ে স্বনির্ভরতা অর্থনীতিতে স্থান করে নেবে।

৩। ঋণ প্রদানের ব্যাপারে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর সময়ে যে উপাদানগুলি সাহায্যদাতা দেশসমূহের ধারণাকে প্রভাবিত করেছে তা হল দরিদ্র দেশসমূহকে কিছুটা মানবিক কারণে সাহায্য করা। ক্ষেত্র বিশেষে ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব বলয় বজায় রাখা, উন্নত দেশের পণ্য ও প্রযুক্তি বাজার সম্প্রসারিত করা, বিশ্ব পরিসরে একটি ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা, উন্নত বিশ্বের উদ্বৃত্ত পুঁজির স্থানান্তর ও বিনিয়োগ উন্নয়নশীল দেশসমূহের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রকৃত আকাংখা ইত্যাদি।

৪। সুতরাং উল্লেখিত প্রেক্ষাপটে প্রতীয়মান হচ্ছে যে উন্নয়নশীল দেশে বৈদেশিক সাহায্যের ইস্যুটি ঋণগ্রহীতা এবং ঋণদাতা উভয় পক্ষের পারস্পারিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একটি বিষয় এবং এটা থেকে যে আন্তঃসম্পর্কের উদ্ভব হয় তাকে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা ও পারস্পারিক স্বার্থকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার একটা বাস্তব চাহিদা বর্তমান। বাংলাদেশের সাথে বৈদেশিক সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সম্পর্ক সাধারণভাবে এ পারস্পরিক সমঝোতার উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, দারিদ্র পরিস্থির পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে উভয় পক্ষেরই দৃষ্টি ভংগির মধ্যে সামঞ্জস্য আছে।

৫। যদিও সাধারণভাবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের মধ্যে একটা ঐক্যমত পরিলক্ষিত হয় তথাপি এর পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতিসমূহের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই উভয় পক্ষের মধ্যে মত পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়, যার ফলশ্রুতিতে উভয় পক্ষের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কও বিগত বছরগুলিতে ঠিক এক জায়গায় থেমে নেই। বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট ইস্যু এবং সাধারণভাবে উন্নয়ন দর্শনকে কেন্দ্র করে এই কাল পর্বে বাংলাদেশ ও সাহায্যদাতা সংস্থাসমূহের মধ্যে সংঘাতেরও সৃষ্টি হয়েছে যা বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে।

৬। বিগতকাল পর্বে বাংলাদেশের সরকারসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্যের প্রয়োগ ও ব্যবহার সাহায্যদাতা সংস্থাসমূহকে সবসময় সন্তুষ্ট করতে পারেনি, প্রদত্ত সাহায্যের সুষ্ঠু বিতরণ ও ব্যবহার,-অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের মধ্যে সঠিক অগ্রাধিকার নির্ধারণ, রাষ্ট্রীয় খাতসমূহের দক্ষতার অভাব, সাহায্য কনসোর্টিয়ামের সভায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত শর্তসমূহ বাস্তবায়নে ব্যর্থতা, ব্যক্তিখাত ও ব্যক্তিখাতের প্রসারের লক্ষ্যে পরিচালিত বিভিন্ন প্রনোদনার ব্যর্থতা ও বৃহৎ ঋণ খেলাপী, ব্যাপক প্রযুক্তি হস্তান্তর সত্ত্বেও নিম্ন পর্যায়ের প্রযুক্তি কাঠামো, ব্যক্তিশাসনের ফলশ্রুতি হিসাবে প্রশাসনিক ব্যর্থতা ইত্যাদি। ম্যাক্রো-ইকনমিক মিসম্যানেজমেন্ট এর কারণে বাংলাদেশের প্রতি দাতা দেশ ও সাহায্যদাতা সংস্থাসমূহের আস্থা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ থেকে পরিচালনা ও বাস্তবায়ন পর্যন্ত সমগ্র কর্মকান্ডকে সুদূরপ্রসারী শর্তাবলী দ্বারা বেঁধে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে এক্সটেন্ডে স্ট্রাকচারাল এডজাষ্টমেন্ট ফেসেলিটিস (ইসাফ) এর আওতায় ব্যাপক শর্তাবলী বাংলাশের উপর আরোপিত হয়েছে। এসব শর্তাবলী দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য্য বলে গণ্য করা হয়। অবশ্য এসব শর্তের সবগুলিই যে অগ্রহণযোগ্য এ রকম ধারনা সঠিক নয়। বস্তুতঃ এর অনেকগুলিই বাংলাদেশ সরকারের নিজের থেকেই গ্রহণ করা উচিত ছিল। তবে কয়েক ক্ষেত্রে হয়তো আলোচনার অবকাশ আছে।

৭। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এ বিপজ্জনক ও বাধ্যতামূলক পরনির্ভরশীলতা ব্যাপক ও শর্তাধীন উন্নয়ন প্রচেষ্টা আজকে যে পর্যায়ে এসেছে তার পেছনে বাংলাদেশের সরকারের সাহায্য ব্যবহারে উপর্যপরি ব্যর্থতাই মূলতঃ দায়ী ছিল। একই সাথে সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ যে সব শর্ত আরোপ করে থাকে সেগুলোর বিপরীতে যথার্থ বিকল্প নীতি উপস্থাপনের ব্যর্থতাও আজকের এ অবস্থার জন্য দায়ী। সাহায্যদাতাদের সাথে সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন অংশীদারীত্বের পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে বাংলাদেশকে একদিকে অর্থনীতির কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে অন্যদিকে অর্থনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে তার নিজস্ব স্বার্থানুকুল নীতিমালাসমূহকে আরো জোরালো ও যুক্তিনির্ভরভাবে উপস্থাপিত করতে প্রয়াস পেতে হবে যদিও কোন প্রকল্প গৃহীত হবার পূর্বে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট এজেন্সী ও দাতা সংস্থাসমূহের মধ্যে বেশ কয়েক পর্যায়ে তা আলোচিত হয়ে থাকে কিন্তু প্রায়শঃই দেখা যায় যে পর্যাপ্ত পূর্ব ধারণার অনুপস্থিতিতে এগুলো বিশ্লেষণের গভীরতার অভাব কাটিয়ে উঠতে পারে না, যার ফলে, গৃহীত প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রতিফলগুলো সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে অবহিত হওয়া সম্ভব হয় না। অন্যদিকে বিকল্প নীতিমালার অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন শর্তাবলীও চাপিয়ে দেয়া হয় যা অনেক সময় বাংলাদেশের প্রকৃত স্বার্থের পরিপন্থী বলেই বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ বিবেচনা করেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রতি আস্থাহীনতার প্রেক্ষাপটে এসব শর্তাবলী এতবেশী ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে যে, সার্বভৌম একটি দেশ হিসাবে এ অবস্থা কোন মতেই মেনে নেওয়া যেতে পারে না। সুতরাং, উন্নয়ন অংশীদার হিসাবে বিশ্বাসযোগ্যতা ও আস্থা অর্জন করে দাতা গ্রহীতা আন্তঃ সম্পর্ক পুনরায় সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য প্রয়োজনীয়তা পদক্ষেপ গ্রহণ বাংলাদেশের জন্য আজ আশু ও জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে।

৮। বাংলাদেশকে এটা মেনে নিতে হবে যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের দীর্ঘকালীন কৌশল উৎপাদশীল সম্পদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, আভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের আরো জোরালো প্রচেষ্টা, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সর্বোপরি সামগ্রিক অর্থনীতি পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদির অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশ কোন সময়ই একটি পরনির্ভরশীলতা গ্লানি কাটিয়ে উঠতে পারবে না। দাতা গ্রহীতা সম্পর্কে পূর্ণমূল্যায়ন পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস সম্ভব হবে যদি কেবলমাত্র বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে। স্বৈরশাসন, একব্যক্তির হাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রীকরণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামোকে কার্যতঃ অবলুপ্তিকরণ, জবাবদিহিতার অভাব, বিনিয়োগ ও ব্যয় অগ্রাধিকারের বিকৃতিকরণ, সরকারী কর্মচারীদের নিজস্ব উদ্যোগ প্রচেষ্টার অবদমন ইত্যাদির কারণে গ্রহীতা হিসেবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রের ভূমিকা হয়ে পড়েছে নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয়। এরূপ অবস্থায় সস্তা জনতুষ্টির দিককে লক্ষ্য রেখে আপাততঃ অজনপ্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণে অপারগতা দেখা দেয় এবং দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে উন্নয়ন কৌশল ও তার প্রয়োগের ব্যাপারে ভিন্নমত দৃষ্ট হয়। মনে রাখতে হবে যে সরকার জনপ্রতিধিত্বশীল সে সরকার দেশের সুদূরপ্রসারী মংগলার্থে আপাততঃ কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এর বাস্তব উদাহরণও আছে।

৯। সর্ব সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত করার একটা বাস্তবসম্মত সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশকে অবশ্যই বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রথমতঃ দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের কাছ

থেকে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করতে হলে বাংলাদেশকে তার নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও চিন্তাভাবনা যুক্তি গ্রাহ্যভাবে উপস্থাপিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে নীতি নির্ধারক বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংযোগকে আরো অর্থবহ ও কার্যকর করতে হবে। পরিকল্পনা কমিশন 'বার্ষিক কান্ট্রি মেমোরেন্ডাম' যদি প্রত্যুত্তর হিসেবে না প্রস্তুত করে স্ব উদ্যোগে তা প্রস্তুত করতে পারে তা হলে নীতি নির্ধারণ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদ্যোগী ভূমিকা নিশ্চিত করা সম্ভব। তবে এ আপাততঃ আশাবাদী পদক্ষেপ বাস্তবায়িত করতে হলে অর্থনীতির বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনকে বিশ্ব ব্যাংকের মানের সমকক্ষ হতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন সরকার বহির্ভূত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে' প্যানেল অব এক্সপার্টস' গঠন করে তাদের সহায়তা গ্রহণ করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ জনপ্রতিনিধিত্বশীলতা ও জবাবদিহি ভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তথাকথিত জনতুষ্টিবাদী নীতি পরিহার করে দেশের জন্য প্রকৃতপক্ষে কল্যাণকর বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করতে দ্বিধা করবে না। যেগুলো আপাততঃ জনপ্রিয় প্রতীয়মান হতে পারে, তৃতীয়তঃ কোন সম্ভাব্য বিশেষ জরুরী অবস্থার প্রেক্ষিতে (তৈল সংকট, মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ ইত্যাদি) বাংলাদেশের একটা বিশেষ পরিকল্পনা পূর্বাহ্নেই থাকতে হবে যাতে করে ঐ বিশেষ অবস্থায় অর্থনীতি নাজুক না হয়ে পড়ে এবং নির্ভরশীলতার মাত্রা গ্রহণযোগ্যতা অতিক্রম না করতে পারে। চতুর্থতঃ শুধুমাত্র প্রাপ্তিই ঋণগ্রহণের কারণ হতে পারে না। প্রতিটি ঋণগ্রহণ যৌক্তিকতা দ্বারাই কেবলমাত্র বিবেচিত হবে, পঞ্চমতঃ প্রায়শই বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এত সহজে শর্তাবলী মেনে নেবার প্রবনতা থাকে যে এটা ঋণদাতা দেশ ও সাহায্য সংস্থাসমূহকেও আশ্চার্যান্বিত করে। সর্ব পর্যায়ে এ প্রেক্ষিতে প্রশাসনে মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা যেমন একদিকে জরুরী অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দিক থেকেও প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নৈতিক সাহায্য প্রদান একান্ত অপরিহার্য।

১০। একটি গণতান্ত্রিক সরকারই কেবলমাত্র স্বয়ংম্ভর অর্থনীতি গড়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম হতে পারে এবং এরূপ একটি সরকারের পক্ষেই কেবল ব্যাপক জনগণকে সাথে নিয়ে এটা অর্জন করতে পারে। এ সদিচ্ছা ও জন সমর্থনই বাংলাদেশকে তার কাংক্ষিত নৈতিক সমর্থনযোগ্য ও অর্থনৈতিক যুক্তিগ্রাহ্য একটি দাতা গ্রহীতা আন্তঃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করতে পারে।

টাস্ক ফোর্স ঃ প্রযুক্তি

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	অধ্যাপক ইকবাল মাহমুদ	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	আহবায়ক
২।	জনাব হাবিবুল্লাহ খান	বাড়ী-৭, সড়ক-৭৮, গুলশান, ঢাকা-১২১২।	সদস্য
৩।	অধ্যাপক শমশের আলী	পদার্থ বিদ্যা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ঐ
৪।	ডঃ এ. আতিক রহমান	পরিচালক, বি,সি,এ,এস	ঐ
৫।	ডঃ এম, নজরুল ইসলাম	ইনষ্টিটিউট অফ এ্যাপরোপ্রিয়েট টেকনোলজী, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	ঐ
৬।	ডঃ এম, ওয়ালিউজজামান	চেয়ারম্যান, বিসিএসআইআর	ঐ
৭।	ডঃ এম,এম, হক	বিআইডিএস	ঐ
৮।	ডঃ শামসুজ্জামান মজুমদার	বিভাগীয় প্রধান পরিকল্পনা কমিশন	ঐ
৯।	ডঃ আবদুস সাত্তার সৈয়দ	এ্যাবাকাস অটোম্যাশন লিঃ	ঐ
১০।	বেগম খোদেজা আজম	যুগ্ম-সচিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ।	ঐ

প্রযুক্তি

বাংলাদেশের প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় আমাদের সম্পদের বিশেষ করে দক্ষ মানব সম্পদের–দৈন্য, বহুদিনের পরাধীনতা ও ঐতিহাসিক ঘটনা–প্রবাহের প্রভাবে গড়ে উঠা রক্ষণশীল মন–মানসিকতা এবং সর্বোপরি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার আমূল পরিবর্তনে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। একটি জাতীয় প্রযুক্তি নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন যে কোন দেশের জন্যই জটিল প্রক্রিয়া। কিন্তু আমাদের জন্য এই প্রক্রিয়া জটিলতার বলে প্রতীয়মান হচ্ছে আমাদের সম্পদের দৈন্য এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নানাবিধ বিদেশী প্রভাবের ফলশ্রুতিতে। আরো একটি মানসিকতা যা আমাদের প্রযুক্তি উন্নয়ন চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে–সেটি হল প্রযুক্তিকে উন্নয়নের চাবি–কাঠি হিসাবে ব্যবহারে বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রকৌশল বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের গন্ডির বাইরে অবস্থিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে সর্বস্তরে প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের এবং আত্মস্থকরণের প্রতি অনীহা।

বলাবাহুল্য আমাদের দেশে উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং সফল প্রযুক্তি প্রয়োগের মধ্যে একটি সহজ সুন্দর যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি। এ ধরণের যোগসূত্রের জন্য **প্রয়োজন নতুন ধরণের অংগীকার ও উদ্যোগ।** নব্য উন্নত দেশসমূহের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে সম্পদের দৈন্য বা সমাজের প্রযুক্তির প্রতি নেতিবাচক মন–মানসিকতার বাধা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। এর জন্য প্রয়োজন হয় **দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি নীতিমালা, সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তিকে সর্ব ক্ষেত্রে উন্নয়নের চাবি–কাঠি হিসাবে ব্যবহার করার এক নতুন উদ্যোগ।**

প্রযুক্তি উন্নয়নে সমস্যাসমূহ

(ক) পরিকল্পনা প্রক্রিয়া

(১) **দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য সম্পূরক স্বরূপ একটি প্রযুক্তি পরিকল্পনা** কখনও প্রণয়ন করা হয় নাই। প্রযুক্তি প্রয়োগ ও আত্মস্থকরণকে উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসাবে কখনও বাস্তব ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয় নাই।

(২) বিভিন্ন খাত সমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা বা প্রকল্পে প্রণয়নের সময় উক্ত প্রকল্প প্রযুক্তি আত্মস্থকরণ বা সংশ্লিষ্ট নির্মাণ–কৌশলে দেশজ প্রযুক্তি প্রয়োগ সম্পর্কে কোনও রূপরেখা দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয় নাই।

(৩) উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলসমূহে জাতীয় উন্নয়নে প্রযুক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রকল্প প্রণয়ন, প্রাক–মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের সময় প্রযুক্তিগত দিকসমূহ–বিশেষ করে প্রযুক্তি আত্মস্থকরণ ও দেশজ উদ্ভাবনের প্রতি খুব কমই দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

(৪) একটি সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি নীতিমালা ও এ ব্যাপারে স্বনির্ভরতা অর্জনের পরিকল্পনার অভাবে নীতি–নির্ধারণী আলোচনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় বিভিন্ন ব্যক্তিগত, গোষ্ঠিগত বা বহিরাগত প্রভাবদৃষ্ট হয়ে প্রযুক্তি আমদানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

(খ) বৈদেশিক সাহায্য

(১) বৈদেশিক সাহায্য সংস্থাসমূহ আমাদের দেশে যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় নতুন কোনও প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও আত্মস্থকরণে আমাদের নিজস্ব নীতিমালা বা সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে বৈদেশিক সাহায্য সংস্থার পক্ষে আমাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত চাহিদা নিরুপণ করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং অধিকাংশ সময় প্রযুক্তি হস্তান্তরকরণ প্রক্রিয়া সঠিক চাহিদা মাফিক হয় না।

(২) অধিকাংশ সাহায্য সংস্থার নিজেদের নীতিমালা ও উদ্দেশ্য থাকে যা অনেক সময় আমাদের প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যের সাথে সম্পূরক নাও হতে পারে। **আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে তুলে ধরতে না পারলে বিদেশী সাহায্য পুষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক সময় সফল প্রযুক্তি হস্তান্তর হয় না এবং আমরা স্বনির্ভরতার পথে এগুতে পারিনা।**

(৩) আন্তর্জাতিক লগ্নি প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশ সময় মনে করেন প্রকল্প বাস্তবায়ন তড়িৎ গতিতে করতে পারলেই পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন হল। একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশজ প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা অর্জিত হল কিনা অথবা দেশজ মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি হল কিনা সে সব বিষয়কে তাঁরা অতটা গুরুত্ব দিতে পারেন না।

(গ) বিভিন্ন খাতে প্রযুক্তি উন্নয়নের ধারা

(১) বাংলাদেশের চাষযোগ্য জমির স্বল্পতা হেতু কৃষিতে প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি আমাদের প্রধান জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে সব সময়ই চিহ্নিত হয়ে আসছে। সৌভাগ্যক্রমে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং এর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কতকগুলি নির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হয়েছে। তবে এ সকল প্রচেষ্টা কেবল মাত্র খাদ্য শস্য উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। **মৎস্য ও গবাদি পশু ক্ষেত্রে এ ধরণের সার্বিক প্রচেষ্টা এখনও পরিলক্ষিত হয় নাই।**

(২) গ্রামীণ প্রেক্ষিতে কৃষি বহির্ভূত কর্মকান্ডে প্রযুক্তি প্রয়োগের প্রচেষ্টা বিভিন্নরূপে অব্যাহত আছে। গ্রামীণ প্রকৌশল কারখানাগুলি আকারে ছোট এবং আধুনিক প্রকৌশল শিল্পের সাথে এর কোনও আনুষ্ঠানিক যোগসূত্র স্থাপন এখনও হয় নাই। কিন্তু এই স্বল্প পরিসর অবস্থানে থেকেও **অনেকে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনী শক্তির প্রমাণ দেখিয়েছেন যার স্বীকৃতি বা একই সাথে আধুনিক প্রযুক্তির একটি সহজ ও গতিশীল উপযোজনের প্রচেষ্টা হয় নাই।**

(৩) দেশের হাল্কা ও ক্ষুদ্র প্রকৌশল শিল্পসমূহের অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র প্রকৌশল শিল্প–কারখানাগুলির গুরুত্ব গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিশেষ করে আধুনিক কৃষি সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ, যন্ত্রাংশ নির্মাণ এবং অন্যান্য উপকরণ নির্মাণে এরা উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে থাকে। এই সকল ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটসমূহের সাথে শহরে অবস্থিত আধুনিক প্রকৌশল কারখানাসমূহের যোগসূত্র স্থাপন বিশেষ গুরুত্বের সাথে ও সুপরিকল্পিতভাবে করা প্রয়োজন।

(৪) দেশজ যন্ত্রাংশ ও বিভিন্ন শিল্প–কারখানা নির্মাণে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহে আধুনিক প্রকৌশল শিল্পের অবদান অপরিসীম। শিল্পে ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনে প্রথম পদক্ষেপ হল প্রকৌশল শিল্পের উৎপাদনশীলতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি। দেশের আধুনিকায়নে এবং প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা অর্জনে প্রকৌশল শিল্প প্রধান ভূমিকা পালন করে।

(৫) সরকারী মালিকানাধীন বৃহৎ ও মাঝারী প্রকৌশল শিল্প–কারখানাগুলিতে উৎপাদনক্ষম যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ব্যবহার সরকারের অন্যান্য অংগ প্রতিষ্ঠানের অনীহা দেশে প্রযুক্তি স্বনির্ভরতা অর্জনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। **দেশজ উৎপাদন যেখানে সম্ভব সেখানে বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে।** এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। ফলশ্রুতিতে স্থানীয় প্রচেষ্টার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে এবং স্থানীয় কারখানার উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই।

(৬) দেশে স্থাপনযোগ্য কল–কারখানার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও উপকরণসমূহ একটি সুপরিকল্পিত বিবর্তণধর্মী কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের প্রকৌশল শিল্প ইউনিটসমূহের সহায়তায় নির্মাণের রূপরেখা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। একই সাথে প্রয়োজন জাতীয় ভিত্তিতে অভিন্ন মান নিরূপণের জন্য যথোপযুক্ত নীতিমালা ও আইন। বিভিন্ন উপকরণ, যন্ত্রাংশ ও শিল্পে ব্যবহার্য সামগ্রীর জন্য জাতীয় মান নির্ধারিত থাকলে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত প্রযুক্তি ও দেশে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মধ্যে একটি সহজ সুন্দর সম্পুরক সম্বন্ধ বজায় রাখা সম্ভব হবে। এর ফলে ক্রমে ক্রমে দেশজ উৎপাদন আন্তর্জাতিক মানদন্ডে স্বীকৃতি লাভ করবে এবং আগামীতে রপ্তানী বাণিজ্যে অধিকতর অংশগ্রহণে সক্ষম হবে।

(৭) আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কেবল বিদেশ থেকে প্রযুক্তি আমদানি করলে দেশের শিল্পায়ন বা অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক প্রযুক্তি মূল্যায়ন, বাছাই, অত্মস্থকরণ ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা অর্জন ও তার সফল প্রয়োগ। এখানে আরো উল্লেখ করা উচিত যে দেশ দরিদ্র বলে সব ক্ষেত্রে শ্রমঘন প্রযুক্তি যথোপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে এমন কোনও কথা নেই। কোনও ক্ষেত্রে আমাদের উন্নত প্রযুক্তি সাদরে গ্রহণ করতে হবে আবার কোনও ক্ষেত্রে নিজেদের আর্থ–সামাজিক অবস্থানের নিরীখে শ্রমঘন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। তবে কোনও ক্ষেত্রেই উৎপাদনশীলতায় যাতে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রযুক্তি বিশেষ নির্ধারণে ও নির্বাচনে স্বনির্ভরতা অর্জনই হবে মূল জাতীয় লক্ষ্য।

(৮) দেশে আধুনিক কল–কারখানা স্থাপনের সময় যখন প্রযুক্তি হস্তান্তরের প্রশ্ন আসে তখন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উক্ত শিল্প ইউনিটটি কেবল চালু রাখা ও সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি গড়ার জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য চুক্তি করা হয়ে থাকে। অনেকে এই ধরনের চুক্তির মাধ্যমে ''সফল'' প্রযুক্তি হস্তান্তর হয়ে গেছে বলে মনে করেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় সফল প্রযুক্তি হস্তান্তর তখনই সম্ভব হয়েছে যখন কোনও শিল্প–কারখানা বা প্রযুক্তির জন্য নতুন উদ্ভাবনী শক্তি বা এই ধরনের শিল্পের নতুন কোন ও ইউনিটের নক্সা বা ডিজাইন ও বাস্তবায়ন সক্ষম জনশক্তি নিজের দেশেই গড়ে উঠেছে। এ ধরনের জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য নতুন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন যেটা উপরে উল্লেখিত চুক্তি মোতাবেক সম্ভব নয়।

(৯) বিভিন্ন সেক্টরে যে সকল প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়েছে সেগুলি স্থিতি (Static) আকারে রয়ে গেছে। গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের মত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অভাবের কারণে প্রযুক্তি গ্রহীতা সাধারণতঃ আমদানীকৃত প্রযুক্তির গতিশীল (dynamic) অংশগুলির প্রয়োগে ব্যর্থ হয় এবং সে কারণেই প্রযুক্তির বর্ধিত সুফল থেকে বঞ্চিত হয়।

(১০) দেশীয় কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে প্রযুক্তি উদ্ভাবন অথবা আহরণের জন্য বেশ কয়েক বৎসর আগে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগারের (বি সি এস আই আর) ন্যয় বর্তমানের গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপন করা হয়। এ যাবত, নতুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সৃষ্টির প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। গবেষণা লব্ধ ফলাফলের বাজারজাতকরণ বা কারিগরী জ্ঞানের উন্নয়নের প্রতি প্রচেষ্টা খুবই সীমিত রয়ে গেছে। এমনকি, আমদানিকৃত প্রযুক্তির আত্মস্থকরণে গবেষণা ও উন্নয়নের প্রতি অংগীকার ছিল অনুপস্থিত। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের শিল্প আমদানিকৃত প্রযুক্তির উপরই অনেকাংশে নির্ভর করবে। তথাপি, বর্তমানের গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলির যথেষ্ট আর্থিক বা অন্যান্য সুযোগ–সুবিধাদী না থাকার কারণে সেগুলি তাদের অংগীকারবদ্ধ কর্মসূচীও পালন করতে পারছে না।

(ঘ) কিছু বিশেষ সমস্যা

(১) আমরা লক্ষ্য করেছি যে যখনই কোন নতুন প্রযুক্তির উন্নয়ন/প্রচলন করা হয়েছে, কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে সেগুলির যথোপযুক্ততা বিশেষ করে অমানুষিক শারীরিক পরিশ্রম বা মহিলা শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের উপর প্রযুক্তির পরিবর্তনশীল প্রভাব আগ্রহ করা হয়েছে।

(২) প্রযুক্তিগত অগ্রসরতার জন্য যা আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হচ্ছে শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে সকল শিল্প উন্নত এমনকি নব্য শিল্প উন্নত দেশগুলির শিক্ষিতের হার অনেক বেশী বাংলাদেশে পাঁচ (৫) বৎসর বা ততোধিক বয়সের জনসংখ্যার শিক্ষিতের হার ২৩·৪ শতাংশ ও ১৫ বৎসর বা ততোধিক বয়সের জনসংখ্যার শিক্ষিতের হার ২৯·২ শতাংশ। অত্যন্ত নিম্ন শিক্ষিতের হার ছাড়াও, ঐতিহাসিকভাবে ভারত উপমহাদেশের এ অংশে মানব–সম্পদ সংক্রান্ত নীতিমালা বিশেষভাবে বিজ্ঞান বা কারিগরী বিষয়ের পরিবর্তে গতানুগতিক কলা (liberal arts) শিক্ষার উপরই ভিত্তি করে পরিচালিত করা হয়েছে।

সুপারিশকৃত কৌশলসমূহ

(ক) সাধারণ

(১) প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়ন তরান্বিত করার জন্য 'প্রযুক্তির' বিভিন্ন অংশের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। প্রযুক্তির চারটি মূল অংশ (component) আছে যা আমাদের সামনে বিরাজমান এইগুলি হচ্ছে ঃ

(ক) বস্তু–নির্ভর (Object-embodied form) প্রযুক্তি। যথা উৎপাদন যন্ত্রপাতি, উৎপাদন অবকাঠামো, মোটর গাড়ী ইত্যাদি;

(খ) ব্যক্তি–নির্ভর (Human-embodied form) প্রযুক্তি, যথাঃ উৎপাদন দক্ষতা, সৃজনশীলতা, ব্যক্তি বা দলের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদি;

(গ) নথিপত্র–নির্ভর (Document-embodied form) প্রযুক্তি, যথাঃ নীল–নক্সা, ম্যানুয়াল, কারিগরী নক্সা ইত্যাদি;

(ঘ) প্রতিষ্ঠান নির্ভর (Institution-embodied form) প্রযুক্তি, যথাঃ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কনসালটিং এবং ডিজাইন ফার্ম, ব্যবস্থাপনা কাঠামো ইত্যাদি।

(২) প্রযুক্তির সব ক'টি অংশেই একটি অপরের সম্পূরক। এদের মধ্যেকার সম্পর্ক বৃত্তাকার এবং একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির চারটি অংশেরই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং সেটা হতে হবে একই সময়ে।

(গ) সরকারের ভূমিকা

(১) অর্থনীতিতে প্রযুক্তি প্রয়োগের প্রাথমিক উদ্দ্যোগ হতে হবে সরকারী খাতে যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় উচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা। অবাধ অর্থনীতি অনুসরণের নীতিমালার সাথে সাথে প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনে সরকারের যোজন ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তা থাকা বাঞ্ছনীয়। এ জন্য অবশ্যই দৃঢ় রাজনৈতিক প্রত্যয় থাকতে হবে।

(২) বাংলাদেশে প্রযুক্তি নীতি অনেকগুলি জাতীয় নীতির সাথে সম্পৃক্ত–

শিল্পনীতি,

এনার্জিনীতি,

কৃষিনীতি,

শিক্ষানীতি,

ঋণনীতি,

আমদানি, রপ্তানীনীতি,

শুল্কনীতি।

এই কারণে **প্রযুক্তিনীতিকে শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণাগার সীমিত গন্ডির মধ্যে বিবেচনা করা ঠিক হবেনা।** অন্যান্য নীতির প্রভাব বিশ্লেষণ, বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান, নিয়ন্ত্রণ ও লক্ষ্য অর্জনের সময় প্রযুক্তি নীতির ভূমিকা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

প্রযুক্তি নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, অলাভকারী প্রতিষ্ঠান, অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান, বোর্ড অব ইনভেষ্টমেন্ট এ সকল প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করাও প্রয়োজন।

(৩) সরকারের প্রতি বছর নিয়মিতভাবে প্রযুক্তিগত দক্ষতা তফসীল (টেকনোলজী ক্যাপাবিলিটি সিডিউল) প্রণয়ন ও প্রকাশ করা উচিৎ। প্রযুক্তি তফসীলে বিভিন্ন সেক্টরের প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা অর্জনের অগ্রগতি অন্তর্ভূক্ত থাকবে। অগ্রগতি বিবেচনার সময় যন্ত্রপাতি তৈরী করার ক্ষমতা ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্টের ক্ষমতা, টেষ্টিং এবং মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা আর্থিক এবং অন্যান্য উৎসাহ প্রদান ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে।

(গ) প্রযুক্তি আমদানি এবং স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন

(১) কিছু পরীক্ষিত প্রযুক্তি বাছাই করে তার আমদানির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প–কারখানার আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমে **দেশের আর্থ–সামাজিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমদানিকৃত প্রযুক্তি আত্মস্থ করার ব্যবস্থা করতে হবে।**

(২) স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিশেষভাবে বাছাই করা কিছু প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষমতা অর্জন করা প্রয়োজন। বিশেষভাবে বাছাই করা কিছু ক্ষেত্রে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষমতা বিশ্ব বাজারে আমাদেরকে রপ্তানী সুবিধা পেতে সহায়তা করবে।

(৩) আজকের প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নকল করার কৌশল অবলম্বন করে হাই টেকনোলজীর ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করার সম্ভাবনা সীমিত। রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল সংযোজনধর্মী শিল্প–কারখানা চালু রাখার জন্য সহায়ক কিন্তু উন্নত মানের উৎপাদন তৈরীর জন্য যথেষ্ট নয়। **শিল্প ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-শুধুমাত্র অনুকরণের দক্ষতা অর্জন করলেই চলবেনা, উদ্ভাবনী দক্ষতারও বিকাশ ঘটাতে হবে।** উন্নত বিশ্ব থেকে প্রযুক্তি আমদানি এবং দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করা একটি অপরটির বিকল্প নয়, সম্পূরক। সে কারণে একই সাথে উভয়দিকের প্রতি নজর দিতে হবে, বাস্তবিক পক্ষে, জাতীয় দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যেই উভয়দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

(৪) নিজস্ব দক্ষতা অর্জন করা, শুধু দক্ষতা অর্জনের জন্যই নয়, নিজস্ব প্রয়োজনে সুষ্ঠুভাবে নতুন প্রযুক্তি আত্মস্থকরণ এবং ব্যবহারের জন্য এর প্রয়োজন আছে।

(৫) **বর্তমানে এ ধরনের গবেষণা উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নেতৃত্বদানকারী বৈজ্ঞানিক ও গবেষকের অভাব রয়েছে।** এ লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(৬) উচ্চ মেধা সম্পন্ন এবং গবেষণায় উৎসাহী জনশক্তি আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। বহু অর্থ ব্যয়ে তৈরী শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তির জনশক্তিকে বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিসরে ধরে রাখার জন্য তাদের পেশাগত উন্নয়নের নিমিত্তে যথেষ্ট পরিমাণ সুবিধা প্রদান করতে হবে। ঐ সমস্ত লোকজনকে জাতীয় পে স্কেলের সুবিধাজনক পর্যায়ে নিয়োগের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৭) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইনগত ও অন্যান্য **অর্থনৈতিক ভিত্তিসমূহ উন্নয়নের সাথে সাথে এক পর্যায়ে তথ্য, প্রশিক্ষণ পরামর্শ ও সম্প্রসারণ সার্ভিসের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে একটি জাতীয় প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।** এর অন্যতম লক্ষ্য হবে প্রযুক্তি নির্বাচন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর আলোচনায় এবং নির্বাচিত প্রযুক্তি বিশ্লেষণে দক্ষতা বৃদ্ধি করা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিতে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের অনুরূপ কাজ করবে না, অথবা এর ফলে বর্তমান গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয়তাও কমাবে না। এখন সময় এসেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনীতিতে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানটির পরিকল্পনা করার।

(৮) **প্রতিটি খাতের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বরাদ্দের কমপক্ষে ১০% অর্থ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যয় করা প্রয়োজন।** কৃষি সেক্টরে বেশ কয়েক বছর ধরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে ক্রমাগতভাবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বরাদ্দের শতকরা ১০ ভাগেরও বেশী অর্থ ব্যয় করার কারণে এ দেশে কৃষি সেক্টরে প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তরে বেশ সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। দেশের অন্যান্য সেক্টরেও অতিসত্ত্বর (বিশেষ করে শিল্প, এনার্জী, মৎস্য ও পশুপালন) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসমন্বয়ে কার্যক্রমে অনুরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(৯) প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের বেসরকারী খাতের অর্থ যোগান একেবারেই নাই। বে-সরকারী খাতকে (বিশেষ করে বড় বড় প্রকল্পে) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে বিনিয়োগের জন্য উৎসাহিত করার প্রয়োজন। এতে করে দেশে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

(ঘ) গ্রামীণ এলাকায় প্রযুক্তি উন্নয়ন

(১) স্থানীয় উদ্ভাবনসমূহ গ্রামীণ অর্থনীতির চাহিদা মিটানোর সাথে সাথে আনুষ্ঠানিক খাতকেও প্রভাবান্বিত করে, সুতরাং এ দু'য়ের বিভিন্ন যোগসূত্রগুলি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। মূল্যায়নের সময় বর্তমানে গ্রামীণ কারিগরী কর্মকান্ডের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ক্ষমতার বিশেষ করে নিম্নের ইস্যুগুলিকে মনে রেখে নিরীক্ষণ করা উচিৎ।

(ক) নক্সা, কাঁচামাল এবং উৎপাদনশীলতা প্রভৃতির নিরীখে পণ্যের মান উন্নয়ন,

(খ) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক গবেষণা উন্নয়ন-এর যোগসূত্র সম্ভাব্যতা,

(গ) স্থানীয় উদ্ভাবন ও উন্নয়নে কি পরিমাণ প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রয়োজন তা নির্দ্ধারণ,

(ঘ) বাজারজাতকরণের সম্ভাবনা।

(২) গ্রামীণ উন্নয়নকে প্রভাবন্বিত করার জন্য প্রকৌশল উৎপাদন–এর উন্নয়ন ও প্রচলনের নিমিত্তে বর্তমানের যোগসূত্রগুলির নিরীক্ষার প্রয়োজন। এরূপ তিনটি উদ্ভাবনী যোগসূত্র হলোঃ (১) দেশের বিভিন্ন জায়গার উন্নততর প্রকৌশল কারখানাসমূহের সংগে গ্রামীণ কুশলীগণের সংযোগ সাধন, (২) প্রকৌশল কারখানাসমূহের সংযোগ সাধানকারী কেন্দ্রীয় প্রকৌশল ওয়ার্কশপ স্থাপন, (৩) একই গ্রামীণ এলাকার উৎপাদনকারী ও বিপণনকারীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন।

(৩) অন্যান্য দেশের শিল্পোন্নয়নের অভিজ্ঞতা থেকে এই দিক নির্দেশেই পাওয়া যায় যে সাফল্য লাভ করতে হলে আমাদের প্রযুক্তিগত দিক নিয়ে পারিবারিক উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে ক্ষুদ্র শিল্পভিত্তিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অতিক্রম করতে হবে।

(৪) **"উৎপাদন প্রথম" অথবা "কর্মসংস্থান প্রথম" এর কোনটিই এককভাবে উন্নয়নের নিয়ামক হওয়া উচিৎ নয়।** কর্মসংস্থান অর্জন করতে হবে, কিন্তু তা বর্দ্ধিত উৎপাদনের পরিবর্তে নয়, বরং উৎপাদন ও প্রযুক্তির সমন্বয়ের পরিবর্তনের মাধ্যমে করতে হবে। অবশ্য এই দু'টি নিয়ামকের মধ্যে কিছু অগ্রাধিকার নির্দ্ধারণ করার প্রয়োজন আছে। বলা বাহুল্য দারিদ্রমোচন নীতির সাথে সম্পৃক্ত নীতি নির্দ্ধারকের কাছে কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব থাকলেও যে সমস্ত শিল্প অতিরিক্ত মূলধন সরবরাহে সক্ষম সেগুলি গুরুত্বের দাবী রাখে। তার মানে এই নয় যে ঐতিহ্যগত কুটির শিল্পের কলা–কৌশল যেমন হস্ত শিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতিকে নিরুৎসাহিত করা। বরং এগুলিকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা উচিৎ। আসলে **শিল্পোন্নয়নের জন্য একটা সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরী করতে হলে ছোট ছোট উৎপাদন কারখানাগুলি যারা যথাযথ যন্ত্রপাতি এবং আধুনিক উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করে অথবা যাদের পরিবর্তিত প্রযুক্তি এবং ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করার** যোগ্যতা আছে তারাই হওয়া উচিৎ আমাদের **প্রাথমিক লক্ষ্য।**

(ঙ) প্রাগ্রসর প্রযুক্তি আহরণের সম্ভাবনা

(১) আগামী দিনের উৎকৃষ্ট প্রযুক্তির সাথে তাল মেলানো সত্যিই দুষ্কর। তা করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে জাতীয় পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ এবং জোরালো প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক।

(অ) যে সমস্ত মৌলিক বিজ্ঞান এ ধরনের প্রযুক্তির উৎস তাদের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করতে হবে এবং

(আ) এ ধরনের কিছু পযুক্তিকে সম্পদ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করতে হবে। এ সমস্ত প্রযুক্তি আত্মস্থঃ করার জন্য একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করতে হবে এমন কোন কথা নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে বস্তুতঃ কিছুটা এগিয়ে মাঝামাঝি কোন পর্যায় থেকেও শুরু করা যেতে পারে এবং পরে প্রয়োজন মত তার উপর গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ হাতে নেয়া যেতে পারে।

(২) এ ব্যাপারে জাতীয় পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক সম্পদ সৃষ্টির জন্য এককালীন একটি বিরাট অংকের টাকা স্থায়ী আমানত হিসাবে রাখা যেতে পারে যার উদ্ভূত আয় থেকে জরুরী গবেষণা খাতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এর ফলে আমাদেরকে বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখায় গবেষণার জন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। সত্যি কথা বলতে গেলে বিদেশী টাকার উপর নির্ভর করে কোন দেশের গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা করা খুবই কঠিন সে জন্য কোন দেশের প্রাগ্রসর গবেষণা ও উন্নয়ন খরচ অতিকষ্টে সৃষ্ট দেশীয় সম্পদ থেকেই করা উচিৎ। এর ফলশ্রুতিতে স্বাভাবিকভাবেই গবেষণা কার্যক্রম যাচাই প্রক্রিয়া আরো কঠোর হবে এবং নব্য বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরো কার্যকরভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে।

(৩) উচ্চ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দক্ষতা সৃষ্টি করতে আমাদের আরো কিছু সময়ের প্রয়োজন হবে। **সুতরাং এই অবসরে আমাদের শিল্প–কারখানাগুলি 'লিপ–ফ্রগিং' নীতি অবলম্বন করে কিছু উচ্চ প্রযুক্তি কাজে লাগাতে পারে।** এতে নতুন কর্মসংস্থান না হলেও দেশের সম্পদ গড়তে সাহায্য করবে। উচ্চ প্রযুক্তি উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন জনশক্তি ব্যবহার করে তবে এতে নুন্যতম উপকরণের প্রয়োজন হয়। যেহেতু এসব প্রযুক্তির উচ্চ মূল্য–সংযোজন সম্ভাবনা আছে এবং বাংলাদেশে এই ধরনের প্রযুক্তিজাত উৎপাদনে শ্রমের মূল্য তুলনামূলকভাবে কম তাই দু'একটা বিশেষ উচ্চ প্রযুক্তিতে ঝুঁকিমূলক বিনিয়োগ করা আমাদের জন্য যুক্তিযুক্ত হতে পারে।

টাস্কফোর্সঃ জনসংখ্যা নীতি

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	অধ্যাপক বরকত-এ-খুদা	অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয	আহবায়ক
২।	ডঃ এম, বদরুদ্দোজা	সমাজ বিজ্ঞানী এবং জনংসংখ্যাবিদ	সদস্য
৩।	ডঃ এম, এ, মাবুদ	পরিকল্পনা কমিশন	ঐ
৪।	জনাব রফিকুজ্জামান	মহাপরিচালক, নিপোর্ট	ঐ
৫।	বেগম সিমেন মাহমুদ	বিআইডিএস	ঐ
৬।	ডঃ সাজেদা আমিন	বিআইডিএস	ঐ
৭।	জনাব আজিজুল করিম	উপ-প্রধান (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	ঐ
৮।	জনাব নওয়াব আলী	পরিচালক, নিপোর্ট	ঐ
৯।	জনাব এস, আর চৌধুরী	পরিচালক, (এমআইএস)	ঐ
১০।	ডঃ আবুল বরকত	সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ঐ

জনসংখ্যা নীতি

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানতঃ গ্রামীণ ও কৃষি নির্ভরশীল। কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির হার অত্যন্ত নিম্ন এবং শিল্প অবকাঠামোও যথেষ্ট দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। জীবনযাত্রার মান নীচু এবং আয়ের বন্টনও দ্রুত অবনতির দিকে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত সামাজিক খাতসমূহের কর্মদক্ষতার মান ও ক্রমাগত নীচু থেকে যাওয়ায় জনসাধারণের জীবনের গুণগত মানের অবনতি ঘটেছে, বিশেষতঃ নারী সমাজের বিরাট একটি অংশ সমাজে আজও অবহেলিত।

২। যেখানে দেশের সার্বিক আর্থ–সামাজিক অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক, সেখানে জনসংখ্যার বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার দুই শতাংশের কিছু উপরে থাকায় দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আরও ব্যাহত করছে। যদিও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণকারীর হার বৃদ্ধি হওয়ার ফলে গত কয়েক বছরে সন্তান প্রজনন হার কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, তবুও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এখনও অনেক বাকী।

৩। জাতীয় লক্ষ্য হচ্ছে স্বনির্ভরতা অর্জন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ। এই লক্ষ্যর সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি স্থিতিশীল জনসংখ্যা নীতি প্রণয়নের জন্য কতিপয় কৌশলাদি প্রস্তাব করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে। প্রস্তাবিত জনসংখ্যা নীতির মুল বিজয় হবেঃ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী সরবরাহ ও সেবাপ্রদান নিশ্চিতকরণ এবং নারী সমাজের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। একটি বাস্তবমূখী জনসংখ্যা নীতিতে দীর্ঘ মেয়াদী জনমিতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা সেবামূলক কার্য্যক্রম শক্তিশালী ও উন্নততর করার প্রয়াসকে প্রাধান্য দেয়া সমীচিন হবে।

৪। সন্তান প্রজনন ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণসমূহকে সামনে রেখে, সম্পদ, দক্ষতার সাথে প্রযুক্তি ব্যবহার এবং এতদসংক্রান্ত ব্যয় এবং পকৃতি নির্ধারণের উপর ভিত্তি করে জনসংখ্যা নীতির জন্য নিম্নলিখিত কৌশলাদি সুপারিশ করা যেতে পারেঃ

(ক) সমাজের প্রতিটি স্তরের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি স্থিতিশীল ও গ্রহণযোগ্য জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন;

(খ) মহিলাদের সামাজিক ক্ষমতা অর্পণ, স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং ছোট পরিবারের আদর্শ বিকাশে সহায়ক শক্তিশালী কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানাদির উন্নতি বিধানের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন উন্নয়ন;

(গ) স্থানীয় পর্য্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধনে উৎসাহ প্রদান যা সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণের সহায়ক;

(ঘ) গোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠন বা সংস্থাসমূহকে অধিকতর কার্যকরী করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত ক্ষমতাদান এবং স্থানীয় পর্য্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;

(ঙ) "পরিবার পরিকল্পনা বহির্ভূত" কিছু কল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যা সন্তান প্রজনন ক্ষমতাকে (Fertility) নিয়ন্ত্রণ করবেনঃ স্বাস্থ্য, খাদ্য, কর্মসংস্থান ও বৃদ্ধ বয়সে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান ইত্যাদি কাজের উন্নয়ন সাধন;

(চ) যে সব জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়, সেসব নিরাপদ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি ও সেবার গুনগত মানের উৎকর্ষ সাধন। একই সাথে মাতৃমংগল ও শিশুস্বাস্থ্য সম্পকীয় সেবা কার্য্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং এতদসংক্রান্ত অবকাঠামোগুলিকে শক্তিশালী করতঃ পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করন;

(ছ) নারী শিক্ষায় উৎসাহ দান এবং সমাজে মহিলাদের যোগ্য ভূমিকা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি;

(জ) মহিলাদের জন্য বৃত্তিমূলক কার্যক্রম এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিলম্বে বিবাহের জন্য উৎসাহ দান;

(ঝ) সন্তান প্রজনন (Fertility) নিয়ন্ত্রণের স্বাস্থ্যগত দিককে প্রাধান্যদান এবং জনগণের কল্যাণ সাধনই জনসংখ্যা নীতির লক্ষ্য বিধায় ইহা সুস্পষ্টভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা;

(ঞ) পরিবার পরিকল্পনার সাথে স্বাস্থ্য সচেতনতাকে একাত্মকরণ এবং পর্যাপ্ত 'ফলোআপ সার্ভিস ও পরামর্শদান' নিশ্চিতকরণ;

(ট) সকল প্রকারের জন্মনিরোধক পদ্ধতির উপকারিতা, স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কীয় তথ্যাবলী শক্তিশালী করা, যেন জনগণ পছন্দমত পরিবার পরিকল্পনা দ্রব্য সামগ্রী গ্রহণ করতে পারে। পুরুষের ব্যবহার উপযোগী জন্মনিরোধ পদ্ধতি প্রচলন ও ব্যবহারে উৎসাহদান;

(ঠ) সামাজিক বিবর্তনে বিশেষতঃ জনগোষ্ঠীর সাংগঠনিক শক্তিকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে অধিকতর ভূমিকা পালনে স্বেচ্ছাসেবী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহকে উৎসাহদান;

(ড) দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ, এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিভিন্ন দিকের উপর গবেষণায় উৎসাহ দান;

(ঢ) দায়িত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসু জনসংখ্যা পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করার জন্য পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং ''পরিবার পরিকল্পনা বহির্ভূত'' জনসংখ্যা নীতিকে উৎসাহ দান;

(ণ) তহবিল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং Cost effective কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহ প্রদান। জন্ম নিরোধক সামগ্রীর মূল্যের উপর ব্যয় ও ভর্তুকীর যথাযথ প্রতিফলন ঘটানোর জন্য বাজেট প্রক্রিয়া বাস্তবসম্মত করা; এবং

(ত) জনমিতিক প্রভাব (Demographic Impact) এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সঠিক বাস্তবায়ন নিরূপনে পর্যাপ্ত মূল্যায়নভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ।

৫। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিভাগটি খুবই দুর্বল এবং ইহার সেবা কর্মসূচী এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। অতএব, মা ও শিশু স্বাস্থ্য খাতে অর্থ বরাদ্দ পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা উচিত। একই সাথে বেসরকারী উদ্যোগকে, বিশেষ করে উদ্ভাবনী প্রয়াস এবং cost effective কর্মসূচী গ্রহণে উৎসাহ দান করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৬। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর কাছে সুষ্ঠু ও পর্যাপ্ত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার সাথে সরকারের বিভিন্ন পর্যায় বিশেষতঃ উপজেলা এবং নিম্ন পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যক্রমের সামগ্রীক ঐক্য ও সামঞ্জস্য অপরিহার্য। এটা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান এধরনের ঐক্য ও সংহতির অভাব রয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে গৃহীত কর্মসূচী ব্যর্থ হয়েছে। অতএব, স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা সেবাকার্যের অর্থবহ ব্যবহারিক ও সাংগঠনিক সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্য বিকল্প ও গ্রহণযোগ্য কৌশল বের করার জন্য একটি ব্যাপক সমীক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কার্যক্রম সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং দায়-দায়িত্ব পালনে স্থানীয় সরকার সংগঠনগুলোকেও অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। এধরনের ব্যবস্থা প্রকল্পের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা উন্নতি সাধনে সহায়ক হবে।

৭। মাঠকর্মী এবং তাদের গ্রাহকদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ নিশ্চিত করার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে মাঠ পরিদর্শনের গুরুত্বকে প্রাধান্য দেয়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই IEM উপাদানসমূহ সেকেলে এবং সৃজনশীল নয়। অতএব, তথ্য শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণের IEM উপাদনসমূহ দুইটি ব্যাপক রূপরেখায় পুনঃবিন্যাস করা যায়ঃ-(১) বর্তমান জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারী এবং অব্যবহারকারী, স্তন্যদাত্রী মা প্রভৃতি গ্রাহকের জন্য IEM উপাদানের পৃথক

পৃথক সেট প্রস্তুত করা উচিত। (২) পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য সম্পকীয় বার্তা ও তথ্যাবলী এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর সমূহের IEM সেবামূলক কার্যাবলীকে একত্রীভূত করতে হবে। IEM কার্যক্রম বর্তমানে বিদেশী বিশেষজ্ঞের (External Expertise) উপর অনেকটা নির্ভরশীল। এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে বিদেশী সাহায্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা যেতে পারে।

৮। পরিকল্পনা মাফিক গঠনমূলক নির্মাণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের Construction Management Cell (CMC) যথেষ্ট কার্যকরী নয়। তাই ভবিষ্যতে উপজেলা পরিষদের প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে FWC গুলি নির্মাণ করা উচিত। তবে CMC কর্তৃপক্ষকে নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করার দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

৯। পরিবার পরিকল্পনা ব্যবহারকারীর হার বৃদ্ধির ও মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নের ব্যাপারে জনসংখ্যা খাতের মহিলা বিষয়ক কার্যক্রমসমূহকে আরো কার্যকরী করতে হবে।

১০। জনসংখ্যা খাতে বিভিন্ন ধরনের জনবল প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। বর্তমান প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বিভিন্ন স্তরের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অপর্যাপ্ত। বিভিন্ন এজেন্সীর (নিপোর্ট, পিডিইউ, বি আই,ডি, এস, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বেসরকারী গবেষণা সংস্থাসমূহ) জনসংখ্যা সংক্রান্ত গবেষণার মানের উন্নতি সাধন এবং সাথে সাথে এই এজেন্সীসমূহের গবেষণালব্ধ তথ্যসমূহের যথাযোগ্য ব্যবহার ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আরো উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তা আছে। জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিষয়াদির উপর গবেষণা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন মেটানোর উপলব্ধি থেকে একটি "National Institute of Population Studies" প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদ ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সর্বাংগীন প্রয়োজনীয়তা নিরূপন করে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হবে এবং সরকারী কার্যক্রমের আওতার বাইরে এর অবস্থান হওয়া উচিত।

১১। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণকারীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানোর জন্যে স্বল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হলে ইহার সংগ্রহ এবং বিতরণ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। বর্তমান ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এবং অনেকগুলো মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হয় বলে সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে মন্থর। সংগ্রহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও সুনির্দিষ্ট সংগ্রহ পরিকল্পনা প্রণয়ন একান্ত প্রয়োজন।

১২। স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে সকল প্রকার গর্ভনিরোধক সামগ্রী (যেমন বড়ি, আইইউডি), সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি এবং অপরিহার্য্য ঔষধপত্র দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন করা সমীচীন। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার এবং দাতা দেশগুলির মূলধন দরকার হতে পারে। সরকারের উচিত দেশীয় উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য কোন রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না এবং কি ধরনের সুযোগ সুবিধা দেয়া যেতে পারে তা নিরূপণ করা।

১৩। মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং গর্ভনিরোধক জিনিষপত্র সম্পর্কে অবহিত করণের জন্য একটি বাস্তবসম্মত জনসংখ্যা নীতি গ্রহণ করা দরকার। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমসমূহে সক্রিয়ভাবে পুরুষদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারে উৎসাহিত করা উচিত। মহিলাদের স্বাস্থ্যহানি এবং অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ এড়ানোর জন্য গর্ভপাতের ব্যাপারে আরো উদারনীতি গ্রহণ করা সমীচীন। ইহার ফলে প্রকারান্তরে জন্ম নিয়ন্ত্রণে সাহায্যহবে।

১৪। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু সমাধান, বেশী সংখ্যক পদ্ধতি থেকে পছন্দ অনুযায়ী চেয়ে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি এবং সেবা শুশ্রূষার মান বাড়িয়ে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্য্যক্রমকে আরো ফলপ্রসূ করা সম্ভব। উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়িত করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে জোর দেয়া প্রয়োজনঃ–

(ক) জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহীতাকে পূর্বেই বিভিন্ন পদ্ধতির গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত করা;

(খ) মাঠ কর্মীদেরও যাতে এসব পদ্ধতি সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা;

(গ) পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে যে পদ্ধতিটি গ্রহীতার জন্য সুপারিশ করা হল, সে সম্পর্কে গ্রহীতাকে সম্যক অবহিত করা;

(ঘ) I.U.D. নরপ্ল্যান্ট এর মত ক্লিনিক্যাল পদ্ধতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দূরীকরণের সুব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে যথাসময়ে এগুলো সরিয়ে নেয়ার সুযোগ নিশ্চিতকরণ।

১৫। জনসংখ্যা কার্যক্রমকে স্বয়ম্ভর করার লক্ষ্যে অর্থাৎ দাতা দেশ/সংস্থাগুলোর উপর থেকে নির্ভরশীলতা কমানোর উদ্দেশ্যে অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ খাতের ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করে জনসংখ্যা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা সরকারের সদিচ্ছার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। জনসংখ্যা খাতকে টিকিয়ে রাখতে হলে জাতীয় রাজস্ব বাজেট দ্বিগুণ করতে হতে পারে, অর্থাৎ সরকারের রাজস্ব আয় আশাপ্রদ হতে হবে। রাজস্ব আয় বাড়ানোর পাশাপাশি কার্যক্রমসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি, সম্পদের অপব্যবহার হ্রাস, খরচ বাঁচানো ও সম্পদের সুষম বন্টন করা এবং সামাজিক সম্পদের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে কর্মসূচীর সমগ্র ব্যয়ভার বহনে সরকারের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ও রাজনৈতিক ইচ্ছা ছাড়াও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদিচ্ছারও একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। এ ব্যাপারে দেশের অবস্থার কথা মনে রেখে সরকার সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হলে জনসংখ্যা খাতকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া সম্ভবপর হবে।

১৬। এ যাবৎ দাতা দেশগুলো পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে এবং তাদের পছন্দ মাফিক প্রকল্পসমূহকে অর্থ ও প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করেছে। সরকারের নিজস্ব সম্পদের ভিতর থেকে জনসংখ্যা খাতে পর্যাপ্ত রাজস্ব বরাদ্দের মাধ্যমে সরকারী প্রতিশ্রুতির যথেষ্ট প্রতিফলন ঘটেনি। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। সম্ভবতঃ কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণে চাহিদা বাড়বে। গণতান্ত্রিক সরকারকে এই সব দাবী এবং দাতা দেশগুলির পছন্দ, অপছন্দ ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

টাস্কফোর্সঃ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	ডঃ নাজমা চৌধুরী	রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আহবায়ক
২।	ডঃ আহমেদ কামাল	ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩।	জনাব আনু মোহাম্মদ	অর্থনীতি বিভাগ, জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	ঐ
৪।	ডঃ মোস্তাক হোসেন যান	ক্যামব্রিজবিশ্ববিদ্যালয়, প্রযত্নে–বিআইডিএস	ঐ
৫।	জনাব আতাউস সামাদ	সাংবাদিক	ঐ
৬।	জনাব মাহবুবুল মোকাদ্দেস	অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ঐ
৭।	ডঃ এফ,আর,এম, হাসান	গণ সাহায্য সংস্থা	ঐ

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

'উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা' সম্পর্কে রিপোর্ট প্রণয়নে টাস্ক ফোর্স স্ব-আরোপিতভাবে নিজস্ব দায়িত্বের পরিধি ও প্রকৃতি নির্দিষ্ট ও সীমিত করেছে। টাস্ক ফোর্স অভিমত পোষণ করে যে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর গঠনই টাস্ক ফোর্সের এখতিয়ার নির্দেশ করছে। গণতন্ত্রের উত্তরণের লক্ষ্যে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে যে নতুন সরকার গঠিত হবে, তাঁদের সামনে দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্যে এবং সম্ভাব্য পন্থা ও কৌশল সম্পর্কে দলিল উপস্থাপন করাই এ টাস্কফোর্সের দায়িত্ব। উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ণয় ও বাস্তবায়নের রাজনৈতিক দলসমূহের সম্ভাব্য ও কার্যকর ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান এই টাস্ক ফোর্সের দায়িত্বের এখতিয়ারভুক্ত বলে মনে করা হয়।

দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক বাস্তবতা, দলীয় অবস্থান ও নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফলের আলোকে মনে করা হয় যে, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন ও পুনঃস্থাপনের সুপারিশ এ টাস্ক ফোর্সের আওতাধীন নয়। আশা করা যায়, কাঙ্খিত উন্নয়ন লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনার ভিত্তিতে ঐকমত্য সৃষ্টি সম্ভব হবে। উন্নয়নে রাজনৈতিক দলের ঈপ্সিত ভূমিকার আলোকে কিছু আত্ম-জিজ্ঞাসা ও মূল্যায়নের সূত্রপাত ঘটবে এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে রাজনৈতিক দলের একক বা গোষ্ঠীগতবাবে কিছু পন্থা অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা-উপযোগিতা সম্পর্কে সজাগতা সৃষ্টি হবে।

টাস্ক ফোর্সের রিপোর্ট প্রণয়নে উন্নয়নের প্রেক্ষিত, পদ্ধতি ও পন্থা কেবল অর্থনীতির পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি, উন্নয়নকে একটি বহুমাত্রিক ধারণা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্র থেকে উপাদানের সমাহারে এবং পরস্পর সম্পৃক্ততায় উন্নয়নের প্যারাডাইম (development paradigm) চিহ্নিত করা বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে টাস্ক ফোর্স অস্থায়ী নিরপেক্ষ সরকারের পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেষ্টার সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত প্যারাডাইম নির্ণয় করেছেঃ

(ক) দারিদ্র্য বিমোচন (Poverty alleviation)

(খ) স্ব-নির্ভরতা (Self-reliance)

(গ) গণতন্ত্রায়ন (democratisation)

(ঘ) নারীর ক্ষমতায়ন (Women's empowerment)

বিদ্যমান সম্ভাবনা ও সম্পদের সচেতন, সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ দ্বারা উন্নয়নের এই নির্ণীত মাত্রা অর্জন সম্ভব। তবে, এর বাস্তব রূপ লাভের পূর্বশর্ত হলো দৃঢ় রাজনৈতিক ইচ্ছা (Strong political will) এবং প্রত্যয়পূর্ণ অঙ্গীকার (firm commitment)।

টাস্ক ফোর্স মনে করে যে, নতুন উন্নয়ননীতির উদ্দেশ্য হতে হবে অবশ্যই (১) উৎপাদিকা শক্তির অব্যাহত বিকাশ, (২) দেশের অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেরাই নিজেদের লক্ষ্য নির্ধারণ, বাস্তবায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন, (৩) চূড়ান্ত দারিদ্র্য ব্যাপকভাবে হ্রাস, (৪) কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয় এবং নিরাপত্তাকে প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি, (৫) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা, (৬) পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশ গ্রহণ ও সমান ভূমিকা নিশ্চিত করা ও (৭) জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রেরবিকাশ।

এটা সত্য যে, ঈপ্সিত উন্নয়ন প্যারাডাইমের বাস্তবায়নের সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন একটি দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। অতীতের অভিজ্ঞতার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির মৌলিক অঙ্গীকারই যথেষ্ট নয় বস্তুতঃ উন্নয়নের মূল নায়ক জনগণের সচেতন সংগঠিত উদ্যোগ ব্যাতীত প্রকৃত উন্নয়ন বাস্তবায়ন কখনো সম্ভব

হবে না। কিন্তু প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামো, রাজনৈতিক কাঠামো এবং তা থেকে উদ্ভুত ক্ষমতা কাঠামোর কারণে আজ পর্যন্ত জনগণ সে ধরণের উদ্যোগী শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারেনি। আশা করা হচ্ছে যে, এই রিপোর্টে যে সব আশু পদক্ষেপের সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলি বাস্তবায়িত হলে জনগণের একটি সক্রিয়, সচেতন ও সংগঠিত শক্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয় ত্বরান্বিত হবে।

টাস্কফোর্স মনে করে যে, একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অভাবেই গত দুই দশকে রাজনৈতিক ও উন্নয়নের যোগসূত্রগুলি একেবারেই ছিন্ন হয়ে যায়। সত্যিকার অর্থে এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলি চিন্তা ও কর্মকান্ডের মধ্যে তেমন কোন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তাগিদ অনুভূত হয়নি। আজকের উন্নয়নের এই জটিলতার জন্য সামাজিক শক্তিগুলির শ্রেণীশক্তি না হয়ে ওঠাকেই টাস্কফোর্স অনেকখানি দায়ী মনে করে। তাছাড়া, টাস্কফোর্স আরো মনে করে উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের সমস্যা জাতি গঠনের সমস্যারই অন্তর্ভুক্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে টাস্কফোর্স যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হয় তা হচ্ছে গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়া, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে গতিশীল রাখা ও সর্বোপরি আন্দোলন উদ্ভুত গণশক্তিকে একটি স্থায়ী অবয়ব দেবার জন্য রাজনৈতিকদলগুলির কি করণীয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভূমিকা, টাস্ক ফোর্সের এখতিয়ার, কর্মপদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে উন্নয়ন প্রেক্ষাপট নির্দিষ্ট করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশে বিদ্যমান উন্নয়ন কৌশলের অভিজ্ঞতা ও ঈপ্সিত উন্নয়ন কর্মসূচী ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে এখানে বিদ্যমান উন্নয়ন কৌশলের থেকে সম্মিলিত ফলাফল হিসেবে কয়েকটি দিককে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এগুলো হলঃ জনগণের উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে ক্রমান্বয় বিচ্ছিন্নতা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অকার্যকারিতা, বহিঃসম্পদের উপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় স্বৈরতন্ত্রের বিকাশ, সামরিকীকরণ, উন্নয়ন সিদ্ধান্ত ও বরাদ্দে স্বেচ্ছাচারিতা, মধ্যস্বত্বভোগীদের আধিপত্য, খন্ডীকৃত লক্ষ্য, রাষ্ট্রের গণমুখি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা ও জনগণের অধিকার হরণ ও সামাজিক মেরুকরণ। এই ফলাফলের প্রেক্ষিতে নতুন উন্নয়ন কর্মসূচী নির্দিষ্ট করা হয় এবং বলা হয় নয়া উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার প্রধান শক্তি হচ্ছে জনগণ। এই জনগণকে সংগঠিত করা এবং একটি অপ্রতিরোধ্য বিজয়ী শক্তিতে পরিণত করা, উন্নয়নের এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিটি পর্যায়ে তাদের আশা আকাঙ্খা ও মতামতকে শক্তিশালীভাবে উপস্থাপন করার জন্য এই উন্নয়ন কর্মসূচীর সমর্থক রাজনৈতিক দল এবং পেশাজীবী ও শ্রেণী সংগঠনসমূহের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাঙ্খিত ভূমিকা তখনই তারা নিতে পারবেন যখন তারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, জনগণের সমালোচনা ও মতামত ধারণ করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করবেন, এবং জনগণের মধ্যে অবস্থান করে জনগণকে নিয়ে অগ্রসর হবেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচী সম্পর্কে তাদের ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে নতুন উন্নয়ন কর্মসূচীর অপরিহায্য শর্ত গণতন্ত্রায়নের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে সার্বিকভাবে গণতন্ত্রায়নকে একটি ত্রি-মাত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এগুলো হলঃ (১) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পরিবেশ সৃষ্টি, (২) গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা এবং (৩) সর্বস্তরের জনগণের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা।

এগুলো বিশ্লেষণ করে বলা হয় যে, একদিকে রাজনৈতিকভাবে জনগণের সার্বভৌমত্ব, সমতা ও সমানাধিকার অন্যদিকে মৌলিক অধিকারসমূহ পূরণ ও সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পূর্বশর্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা গণতন্ত্রায়নের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দেশী-বিদেশী বৈরী শক্তিসমূহের প্রতিবন্ধকতার মুখে গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে একটি অধিকার সচেতন শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা গণতন্ত্রায়নের অন্যতম শর্ত। বস্তুতঃ উন্নয়ন ও গণতন্ত্রায়ন অর্থবহ করতে হলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, শ্রমজীবীদের বিভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেবার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কার্য্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ও কাঠামো নির্মাণ বাঞ্ছনীয় হবে।

সপ্তম অধ্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থান ইত্যাদির পরিসংখ্যানগত তথ্য বিরাজমান বৈষম্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। আয়ুসীমা, মাতৃমৃত্যুর হার নারীর অসম অবস্থানের সূচক। নারীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ সমস্ত বৈষম্যের অবসান ও পরনির্ভরশীলতার নিরসন ঘটানো, নারীর সক্রিয় ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি ও অবদানের স্বীকৃতি এবং পরিবর্তন প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সক্রিয় অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ। সুতরাং নারী ক্ষমতায়নের অর্থনৈতিক, আইনগত ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বিদ্যমান। সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ফলপ্রসু হতে হলে এই সমস্ত প্রেক্ষিত বা মাত্রা ধারণ করতে হবে। বাংলাদেশে বিরাজমান ব্যাপক অশিক্ষা, অভাব, অস্বাস্থ্যের কুফলের অধিকতর হারে শিকার হয় নারী। সমাজ কাঠামোর প্রতিটি স্তরে নারী পুরুষের সম্পর্ক অধস্তনতা ও কর্তৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে নারী অধিকতর হারে দুর্ভোগ ও দুর্যোগের শিকার হয়। নারীর স্বার্থ ও সমস্যাকে জাতির স্বার্থ ও সমস্যার অখন্ড অংশ হিসেবে দেখা এবং নারী উন্নয়ন পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য মাত্রা হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলির পালন করতে হবে। উন্নয়নের ধারাকে প্রবাহমান ও কার্যকর রাখতে হলে উন্নযন মডেল ও প্রক্রিয়ায় সমাজে নারীসহ সকল জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি ও অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নারীর ক্ষমতায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য শুধুমাত্র নারীর শক্তি সঞ্চয়নই নয়। বস্তুতঃপক্ষে নারীর ক্ষমতায়ন সুষম ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটানোর একটি মাধ্যম।

সর্বশেষে উপসংহার ও সুপারিশমালা দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে তার সারকথা নিম্নরূপঃ

(১) একটি জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে জাতি বিকাশের জন্য কল্যাণমূলক বিষয়গুলি, যথা–খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা জনগণের নাগালের মধ্যে আনার পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও সম্ভাবনা বিবেচনা করে একটি ঐক্যমত ভিত্তিক ঘোষণা প্রকাশ করা যা কি না সকল রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) যেহেতু উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও ভাবনা মোটেও কোন সহজসাধ্য কাজ নয় বিশেষ করে বিশ্ব অর্থনীতি ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অবস্থান এবং সেই প্রেক্ষিতে তার উন্নয়নের গতি ও প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য গণপ্রতিনিধিদেরকে অন্ততঃ ৪ সপ্তাহ ব্যাপী একটি সমন্বিত উন্নয়ন কোর্সে অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই কোর্সে বাংলাদেশের জনগণের শক্তি ও দেশের সম্পদ, উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও কাঠামোয় নারীর অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা, বিদেশী সাহায্য ও তার স্বরূপ, বিশ্বব্যাংক ও আই, এম, এফ এর কার্যপ্রণালী, শিল্পখাত ও কৃষিখাতের পারস্পরিক সম্পর্ক, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমস্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দেয়া ও মতামত বিনিময় করা যেতে পারে। এই প্রশিক্ষণ রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিজস্ব ফোরামের মাধ্যমেও দিতে পারেন।

(৩) টাস্ক ফোর্স মনে করে যে, স্বনির্ভর উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সমাবেশ ঘটাতে হবে। বর্তমানে বিদেশী সাহায্যের সার্বিক নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে ধীর অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপ নিতে হবে। সেই লক্ষ্যে সরকারকে যে কোন অবকাঠামো কার্যক্রমে অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ সম্পদ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করতে হবে। এই প্রচেষ্টায় ক্ষমতাসীন দলসহ সকল দলগুলির সহযোগিতা থাকতেহবে।

(৪) এই প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসু করতে হলে দীর্ঘ মেয়াদী কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং এসব পরিকল্পনা প্রণয়ন, অর্থ সংগ্রহ ও বরাদ্দ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত শ্রমজীবীসহ অভিষ্ট জনগণকেও যুক্ত করতে হবে। কেননা টাস্কফোর্স মনে করে যে, উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়িয়েই দুর্নীতি ও আমলাতান্ত্রিকতা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব এ ব্যবস্থা বেসরকারী সাহায্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের ক্ষেত্রেওপ্রজোয্য হবে।

(৫) রাজনৈতিক দলগুলোকে ও আমালাতন্ত্র ও দূর্নীতি মুক্ত হতে হলে জনগণের নিকট তাদের দায়বদ্ধতা বাড়াতে হবে এবং দলীয় সংগঠনের অভ্যন্তরে নিয়মিত নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু করতে হবে।

(৬) নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার উপর আমলাতন্ত্রের প্রভাবকে সীমিত করতে হলে সংসদ ও সংসদীয় কমিটিগুলিকে শক্তিশালী ও সক্রিয় করে তুলতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে জনকল্যাণমূলক বিষয়গুলি রাজনৈতিক ইস্যুতে রূপান্তরিত হয় এবং রাজনৈতিকভাবেই উন্নয়নের ধারা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত–সমূহ গৃহীত হয়।

(৭) এটা করতে হলে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত বিশেষ করে স্থানীয় সরকারগুলিকে রাজনৈতিক দলভিত্তিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে আনতে হবে। তাহলে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সর্বোচ্চ পর্যায় ও নিম্নপর্যায়ের উন্নয়নের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর উন্নয়ন দর্শনের প্রতিফলন ও সামঞ্জস্য দৃশ্যমান হবে।

(৮) টাস্কফোর্স আরো মনে করে, উন্নয়নকে গণমুখী করতে হলে উন্নয়ন বিষয়ক তথ্যাদি জনগণের গোচরীভূত হওয়া আবশ্যক এবং এই কাজটি একটি স্বাধীন গণমাধ্যমের পক্ষেই কেবল করা সম্ভব। তবে ক্ষুদ্রদলীয় স্বার্থে স্বাধীন গণমাধ্যমে যাতে করে দায়িত্বহীনতার পরিচয় না দিতে পারে সেটা দেখার জন্য সংসদীয় কমিটিকে দায়িত্ব দিতে হবে। তাহলে সংসদ ও গণমাধ্যমের এই পারস্পরিক যোগাযোগের ভিত্তিতে উভয় উভয়কে গণতন্ত্রায়নের পথে বিকশিত করতে পারব বলে টাস্কফোর্স মনে করে।

(৯) উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সর্বগামী করতে হলে টাস্কফোর্স মনে করে যে নারীকে রাজনীতিতে সক্রিয় করে তুলতে হবে এবং উন্নয়নের বাহক ও ভোগস্বত্বাধিকারী হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পর্যায় ও ক্ষেত্রসমূহে নারীর দৃশ্যমানতা বাড়াতে হবে। এটা সম্ভব মন্ত্রী পরিষদ, জাতীয় সংসদ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল ও সরকারী নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রসমূহে যথাস্থানে নির্বাচন ও নিয়োগের মাধ্যমে। উপরন্তু, নারী উন্নয়নের কর্মসূচী ও স্বার্থ সংরক্ষণের কর্মতালিকাকে মুক্ত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। টাস্ক ফোর্স আরো মনে করে যে, দলীয় কর্মসূচীতে স্থান দিয়ে, সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পর্যায়ে সচেতন অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে, উন্নয়ন বিষয়ক সরকারী দলিল–পত্রে নারীর ভূমিকা ও অবস্থানগত সঠিক ঘোষণা দিয়েও উপযুক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমেই নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া জোরদার করা সম্ভব।

(১০) টাস্কফোর্স মনে করে যে রাজনীতিকে অশুভ ও কালো টাকার প্রভাবের বাইরে রেখে উন্নয়নকে গতিশীল করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলিকে এই অশুভ শক্তির কবল থেকে মুক্ত হতে হবে। সেই লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থের উৎস সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত রাখা, দলগুলোর তহবিল নিয়মিত নিরীক্ষণ ও জনসমক্ষে প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা আরোপের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়।

সর্বোপরি, টাস্কফোর্স মনে করে যেহেতু এই সব সুপারিশমালা একটি দেশপ্রেমিক রাজনীতির রূপরেখা সেই কারণে এই বিষয়গুলি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি নিয়মিত, খোলাখুলি ও ব্যাপক আলোচনা করবে এবং এগুলিকে পরীক্ষা ও প্রয়োজনমত সংযোজন ও সংশোধন করে একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাবে যা উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে গণমুখী করে তুলতে সাহায্য করবে।

টাস্ক ফোর্সঃ সরকারী পর্যায়ে দুর্নীতি

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	জনাব বোরহান উদ্দিন আহমেদ	প্রাক্তন সচিব	আহবায়ক
২।	ডঃ এ, গফুর	বিআইডিএস	সদস্য
৩।	জনাব এ,এস, সাদেক	প্রাক্তন সচিব	ঐ
৪।	অধ্যাপক রায়হান শরীফ	সিইএন(ডি)	ঐ
৫।	জনাব এস, এম, শহিদুল্লাহ	শহিদুল্লাহ এসোসিয়েটস	ঐ
৬।	অধ্যাপক বি, কে, জাহাংগীর	পরিচালক, সেন্টার ফর সোসালষ্টাডি।	ঐ

সরকারী পর্যায়ে দুর্নীতি

ভূমিকাঃ সরকারী পর্যায়ে দুর্নীতি ইদানিং একটি বহুল আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। গত দশকে বাংলাদেশে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে এবং অর্থনৈতিক বিকাশের উপর নেতিবাচক প্রভাবসহ দুর্নীতির ফলে দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকৃতি সম্পর্কে উদ্বেগ ক্রমশই বাড়ছে।

সাধারণভাবে, যাদের হাতে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ক্ষমতা আছে তারাই দুর্নীতিবাজ হতে ও অন্যান্যদের দুর্নীতির মধ্যে টেনে আনতে পারে। ব্যক্তিগত লাভের জন্য সরকারী সম্পদের অথবা প্রশাসনিক ক্ষমতার ব্যবহারকেই সাধারণভাবে সরকারী পর্যায়ে দুর্নীতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু রাজনীতির অথবা রাজনৈতিক নেতাদের আচরণের ক্ষেত্রে এ সংজ্ঞা যথেষ্ট নয়। একজন ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ ব্যক্তিগতভাবে সৎ মানুষ হিসাবে পরিচিত হতে পারেন; কিন্তু তিনিই আবার তার দলের জন্য যে কোনভাবে অর্থ সংগ্রহের জন্য তার অধীনস্তদের চাপ অথবা উৎসাহ দিতে পারেন।

দুর্নীতির উৎসসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণার চাবিকাঠি হচ্ছে রাজনৈতিক পদ্ধতি ও নেতৃত্বের চরিত্র। সরকারের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত একটি **গণতান্ত্রিক ও উন্মুক্ত সরকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।** বাংলাদেশে এর বিপরীতটিই ঘটছে। একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রশাসনকে জবাবদিহি করতে হয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে। বিপরীতে, বাংলাদেশে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে এবং তদুপরী আইন সভার ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে খর্ব করা হয়েছে। প্রশাসনের অভ্যন্তরে কি ঘটছে জনগণের অথবা জনপ্রতিনিধিদের সে বিষয়ে অবহিত হবার কোন সুযোগ নেই এবং প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করায় কোন পন্থাও জনগণের আয়ত্বে নেই।

ঐতিহাসিক পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, গণবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এ ছাড়া তারা প্রশাসনের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে যার সুযোগে আমলাতন্ত্রও দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আমল থেকেই যারা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছেন তারা দুর্নীতিবাজ ও সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদদের নিয়ে দল গঠন করেছেন। এ সব রাজনীতিবিদদের লক্ষ্য ছিল একটাই– সরকার প্রধান ও তার দলের কাছে আনুগত্যের বিনিময়ে যে কোন পন্থায় অর্থ অর্জন। এ ছাড়াও দলীয় সংগঠনের কাজে নিয়োজিত ছিল এমন সব কর্মীবৃন্দ যাদের শুধুমাত্র টাকার বিনিময়েই কোন রাজনৈতিক কাজে উদ্বুদ্ধ করা যেত। এই রাজনৈতিক পরিবেশে মন্ত্রী ও সরকারী আমলাদের অনেককেই শাসক দলের এমনকি সরকার প্রধানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। স্বাভাবিকভাবে এই অবস্থার সুযোগে অনেক রাজনীতিবিদ ও আমলা দুর্নীতিতে নিমজ্জিতহয়েছে।

একটি অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সরকার প্রধান ও মন্ত্রীবর্গকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না এবং তাদের উপর জনগণের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত না হয় ততক্ষণ তারা আমলাতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী হন না। ফলে আমলাতন্ত্রকে সাধারণভাবে শুধুমাত্র নিজেদের কাছে জবাবদিহি করতে হত। স্বাভাবিকভাবে এই অবস্থা দুর্নীতির ব্যাপক প্রসারের সহায়ক হয়েছে।

ক্ষমতার অপব্যবহারের ধরণ ও পরিণতি ঃ দুর্নীতিকে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন কিন্তু তার প্রকাশকে চিহ্নিত করা ততটা কঠিন নয়। দুর্নীতির উৎসের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঃ (১) দেশ ও বিদেশ থেকে সরকার কর্তৃক পণ্য ও পরিসেবা কেনা এবং কন্ট্রাক্ট দেওয়া, (২) কর ও চোরাচালান প্রতিরোধ প্রশাসন, (৩) সরকারী সম্পত্তি বন্টন ও বিক্রয়সহ শিল্প ও বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহ বিরাষ্ট্রীয়করণ, (৪) সরকারী ঋণদান সংস্থাসমূহ কর্তৃক ঋণ বন্টন, (৫) সরকারী তহবিল তসরুপ, (৬) বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ। দুর্নীতি যে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অন্যান্যের মধ্যে, দুর্নীতির ফলে ঃ (১) সরকারী সম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং তার উৎপাদনশীল বিনিয়োগ থেকে অর্থনীতি বঞ্চিত হয়, (২) সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপদ দক্ষ

হয় না, (৩) সরকারের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হয়, (৪) দুর্নীতির দ্বারা সংগৃহীত সম্পদ বিনিয়োজিত না হয়ে ভোগের বর্ধিত অথবা বিদেশে ব্যাংকে স্থানান্তরিত হয়, (৫) সবচেয়ে বেশী ঘুষদানে সমর্থ অদক্ষ কন্ট্রাক্টর কাজ পায়, (৬) ঘুষ না দেওয়া হবে সরকারী ফাইলের চলাচল শ্লথ হয়ে যায়, (৭) বহির্বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমদানী ও রপ্তানীর অভাব ও আন্ডার ইনভয়েসিং ও পুঁজি রপ্তানী হয়।

সরকারী পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধের কয়েকটি পন্থা ঃ

(ক) **গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ঃ** গণতন্ত্র ও উন্মুক্ত সরকার দুর্নীতি প্রতিরোধের একটি অত্যন্ত কার্যকর পন্থা। উন্মুক্ত সরকারের অর্থ হচ্ছে একটা বিশেষ স্তর পার হবার পরে দুই একটি ক্ষেত্র বাদে সব সরকারী কাগজপত্র উন্মুক্ত করার জন্য শাসনতান্ত্রিক বা আইনগত বাধ্যবাধকতা।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে জবাবদিহিমূলক সরকার। প্রথমতঃ আমলাতন্ত্রকে রাজনীতিবিদদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, রাজনীতিবিদদের জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকতে হবে জনগণের কাছে। জবাবদিহির ব্যাপ্ত হতে হবে ব্যাপক– আইনগত, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ।

আইনগত জবাবদিহি নিশ্চিত হয় যেখানে বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন। এই ধরণের একটি বিচার ব্যবস্থাই নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে পারে যে, সরকারের কোন কার্যক্রম আইনসম্মত কি না। যদি বিচার ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করায় সরকারকে বিরত রাখতে হয়, তাহলে এমন পরিবেশ সৃষ্টি হবে যেখানে জনগণ এবং মুক্ত সংবাদপত্র রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে।

জনসাধারণ কর্তৃক সরকারের নির্বাহী শাখার নিয়ন্ত্রণ ও তাকে জবাবদিহি করাতে বাধ্য করার জন্য প্রয়োজন অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার এবং আইনসভার কাছে দায়ী নির্বাহী শাখা। প্রশাসনকে জনগণের কাছে জবাবদিমূলক করার জন্য যতগুলো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্ভবত স্কান্ডেনেভীয় 'ওমবুডস্ম্যান' (কমিশনার)। 'ওমবুডস্ম্যান' হচ্ছে একজন কর্মকর্তা যিনি পার্লামেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত হন এবং প্রশাসন আইন অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে কি না তিনি তার তদারক করে থাকেন। নিয়ম অনুসারে সরকারের সকল শাখা ও কর্মচারীরা 'ওমবুডস্ম্যান' এর সাথে সব ধরণের সহযোগিতা করতে বাধ্য। 'ওমবুডস্ম্যান' প্রতি বছর পার্লামেন্টে তার রিপোর্ট পেশ করেন। তবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ সম্ভবত জাতীয় পত্র পত্রিকার সাথে তার প্রাত্যহিক সাক্ষাৎকার এবং অবাধ তথ্য প্রদান। বাংলাদেশের গঠনতন্ত্র ৭৭ অনুচ্ছেদে 'ন্যায়পাল' (যা 'ওমবুডস্ম্যান' এর সমার্থক) নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত শাসনতন্ত্রে প্রস্তাবিত এ পদটি সৃষ্টি করা হয়নি। দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে এ পদটি সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরী।

(খ) **প্রশাসনে দুর্নীতি ঃ** বাংলাদেশে দুর্নীতি এত ব্যাপক যে, দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে সকল ব্যবস্থাই ব্যর্থ হচ্ছে। দুর্নীতি দমনের বিদ্যমান ব্যবস্থা পর্যালোচনা ও এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ভারতের সান্তানাম কমিশনের অনুরূপ একটি কমিশন গঠন করা প্রয়োজন।

এ বিষয়ে সকলে একমত যে, দুর্নীতির ব্যাপকতার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, উর্ধতন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের একটি বড় অংশ হচ্ছেন দুর্নীতিগ্রস্ত। এটাও মনে করা হয় যে, অনেক ক্ষেত্রেই নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা বাধ্য হয়ে উর্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে সহযোগিতা করে। দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য উচ্চপদস্থদের কঠোরতর শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিদ্যমান প্রশাসনিক কাঠামোতে সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মামলা দ্রুত ও যথাযথভাবে নিষ্পত্তি হয় না। এ ছাড়াও শাস্তির মাত্রাও প্রায়শঃই খুব লঘু হয়ে থাকে। তবে ইচ্ছামত অথবা বিধি বহির্ভূতভাবে কোন কর্মচারীকে শাস্তিদান, পদাবনতি অথবা বরখাস্ত করা গর্হিত। একজন সরকারী কর্মচারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মচারী, রাষ্ট্রপতি অথবা কোন উর্ধতন কর্মকর্তার ব্যক্তিগত কর্মচারী নয়। যদি আইন কোন কর্মচারীকে রক্ষা না করে তবে সে বাধ্য হবে দুর্নীতিবাজ উর্ধতনদের সাথে সহযোগীতা করতে।

দুর্নীতির ফলে আহরিত হয় আয় ও সম্পদ। যতক্ষণ একজন দুর্নীতিবাজ তার আয় ও সম্পদ গোপন করতে পারে ততক্ষণ দুর্নীতি দমনে সাফল্য অর্জনের আশা করা যায় না। এ জন্যই সকল সরকার প্রধান, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের আয় ও সম্পদ বাধ্যতামূলকভাবে জনগণের কাছে প্রকাশের আইনগত ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। যে কোন ধরণের গোপন ও অবমূল্যায়িত সম্পদ বাজেয়াপ্তসহ অপরাধীদের অতিরিক্ত শাস্তির ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যায়। এই আইন রাজনৈতিক দলসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া দরকার, বিশেষভাবে নির্বাচনের জন্য আয় ও ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণের ক্ষেত্রে। উপরোক্ত ব্যবস্থা গোপনীয়তার অধিকারের সাথে অসঙ্গত নয়। যিনি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন, তার সম্পর্কে সব তথ্য জানার অধিকার জনসাধারণের অবশ্যই আছে।

জবাবদিহির একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে একটি বিশেষ কাজের জন্য একজন বিশেষ ব্যক্তির দায়িত্ব। কমিটি পদ্ধতিতে এটি সম্ভব নয়। সেজন্যই সাধারণভাবে এই নিয়ম হওয়া উচিৎ যে, কমিটির সভাপতিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন এবং ফলে সিদ্ধান্তের দায়িত্বও তিনিই নেবেন, অন্যদের ভূমিকা হবে উপদেষ্টার।

(গ) **আর্থিক জবাবদিহি** ঃ সরকারী ব্যাংক ও অন্যান্য ঋণদান প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থাপনা দুর্নীতির একটি বড় উৎস। অনেকক্ষেত্রেই এই সব ঋণ দেওয়া হয় যথাযথ পরীক্ষা না করেই এবং যথেষ্ট জামানত ছাড়াই। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই এসব ঋণ দেওয়া হয় উর্ধতন কর্তৃপক্ষের মৌখিক নির্দেশে কিন্তু জবাবদিহির সাধারণ নিয়ম অনুসারে যে সব কর্মচারীরা এসব ঋণের আবেদন পরীক্ষা ও অনুমোদন করেন তারা এই ঋণ আদায়ে আইনগত ফাঁকের জন্য দায়ী। এসব ঋণের ক্ষেত্রে যদি সঠিকভাবে নিয়ম অনুসরণ করা না হয়ে থাকে তবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের কাছ থেকে অনাদায়ী ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা রাখা উচিৎ। এ ছাড়া, যিনি যথাযথ নিয়মে ঋণ শোধ করছেন না, তার অথবা তার পরিবারের সদস্যদের সম্পত্তি (তা জামানতের অন্তর্ভুক্ত হোক অথবা না হোক) বাজেয়াপ্ত করার বিধান সম্বলিত নতুন আইন প্রণয়ন প্রয়োজন।

(ঘ) **সরকার প্রধানের জবাবদিহি** ঃ বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র অনুসারে একমাত্র রাষ্ট্রপতিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপতি কার্যতঃ কারো কাছেই দায়ী নন। এর ফলে ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, আমলা, চোরাচালানী–সংক্ষেপে যাদের রাষ্ট্রপতির সাথে যোগাযোগ আছে তারাই সরকারী আনুকূল্য এমনকি নির্বাহী শাখার হস্তক্ষেপের সুবিধা পেতে পারতেন।

বর্তমান কার্যপরিচালনা বিধিটি প্রথমে জারি করা হয় ১লা নভেম্বর, ১৯৭৫ সালে সর্বশেষ সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে ডিসেম্বর ১৯৮৯ সালে। বিদ্রমান বিধি অনুসারে, "যে কোন গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত গৃহীত হবে না। এর ফলে রাষ্ট্রপতির সচিবালয় ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হয়েছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং দুর্নীতির পথ প্রশস্ত হয়েছে। বিধি অনুসারে একমাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ কোন সরকারী তথ্য পত্র–পত্রিকায়, এমনকি অন্য দফতরের সরকারী কর্মচারীদের দিতে পারেন না"। স্পষ্টতঃ, এ বিধানের সুযোগে সরকার সব ধরনের দুর্নীতি, সরকারী সম্পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি চাপা দিতে পারে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের জানার অধিকার আছে কিভাবে তাদের টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। গোপনীয়তা একমাত্র দুর্নীতিবাজ ও অযোগ্যদের আশ্রয় দেয়। বিধি অনুসারে, উন্নয়ন ব্যয় প্রস্তাবে পরিকল্পনা কমিশনের মতামত লিপিবদ্ধ থাকার কথা। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এ নিয়মভঙ্গ করে রাষ্ট্রপতি সরাসরি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করতে শুরু করেছিলেন এবং এর ফলে দুর্নীতির প্রসার ঘটেছিল। উক্ত বিধিতে রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার খাতিরে কোন সরাকরী কর্মচারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই বরখাস্ত, অপসারণ অথবা পদাবনতির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এটি যে শুধু ন্যায় বিচারের পরিপন্থী তাই নয়। এর ফলে সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতিতে লিপ্ত করানো সহজতরহয়েছে।

(ঙ) **অন্যান্য** ঃ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া ব্যাপক চোরাচালান সম্ভব নয়। শুধুমাত্র প্রশাসনিক কড়াকড়ির মাধ্যমে চোরাচালান বন্ধ করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে দুটো ব্যবস্থা যথাযথ হবে, (১) যে সব পণ্য ভারতে চোরাচালান হয় তাদের দাম বৃদ্ধি করা এবং (২) যে সব শিল্প খুবই উচু সংরক্ষণ পেয়ে থাকে, তাদের সংরক্ষণ সুবিধা না দিয়ে নগদ অনুদান দেওয়া অথবা ক্রমশঃ বন্ধ করে দেওয়া।

পরামর্শক নিয়োগ ও কন্ট্রাক্টরগণের বিষয়ে রাষ্ট্রপতি সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছেন। এ বিষয়ে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। বিশেষ ধরণের উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন ছাড়া প্রয়োজন এমন নিয়ম বাঞ্ছনীয়।

বাজেটের মাধ্যমে নির্বাহী শাখাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন জনপ্রতিনিধিগণ। কিন্তু বড় বড় থোক বরাদ্দ (যথা প্রতিরক্ষা খাতের জন্য) এই লক্ষ্যের সহায়ক নয়। অন্যান্য দেশের মত জাতীয় সংসদে সব বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করা অভিপ্রেত না হলেও জাতীয় সংসদ কমিটিসমূহ দ্বারা সব থোকবরাদ্দ পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পসমূহকে কেন্দ্র করে একটি কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এই অবস্থার কিছুটা নিরসন হবে যদি কোন জাতীয় সংসদ কমিটি সকল বৈদেশিক সাহায্য চুক্তির খুঁটিনাটি পরীক্ষার পর জাতীয় সংসদে তাদের সুপারিশ আলোচনার জন্য পেশ করে।

টাস্ক ফোর্স ঃ বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের সদ্ব্যবহার

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	ডঃ আর, এইচ, খন্দকার,	প্রাক্তন পরামর্শক ইউএনডিপি	আহ্বায়ক
২।	ডঃ এ, এইচ, শাহাদাৎউল্লাহ	প্রাক্তনসদস্য, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৩।	সৈয়দ শামীম আহসান	সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	ঐ
৪।	জনব এ, কে, এম, নাজমুল আহসান	বিভাগীয় প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন	ঐ
৫।	জনাব এইচ, টি, ইমাম	প্রাক্তন সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	ঐ
৬।	জনাব আবদুল মজিদ	পরিচালক, বৈদেশিক বাণিজ্য হিসাব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।	ঐ

বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের সদ্ব্যবহার

বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করার লক্ষ্যে একটি টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়। এই টাস্ক ফোর্স বৈদেশিক সহায়তাকে নিম্ন লিখিত চারভাগে বিশ্লেষণ করেঃ

(ক) প্রকল্প সাহায্য (খ) পণ্য সাহায্য (গ) খাদ্য সাহায্য এবং (ঘ) কারিগরী সাহায্য।

প্রকল্প সাহায্যের উপর টাস্ক ফোর্স নিম্নরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেনঃ

বাংলাদেশে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী। ১৯৭১ সাল হইতে জুন'৯০ পর্যন্ত প্রকল্প সাহায্য, পণ্য সাহায্য ও খাদ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ছিল যথাক্রমে ১৪.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৭.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ৪.৬ বিলিয়ন ডলার। প্রতিশ্রুতি হইতে বিগত ১৯ বৎসরের প্রকল্প সাহায্য, পণ্য সাহায্য ও খাদ্য সাহায্যের ব্যবহারের পরিমাণ যথাক্রমে ৬২.৫%, ৯৬.৭% ও ৯৫.৭% ছিল। স্পষ্টতঃই প্রকল্প সাহায্যের ব্যয়ন অন্য ২টি খাত হইতে কম হইয়াছে। প্রকল্প সাহায্যে ব্যয়নের পরিমাণ কম হওয়ার প্রধান কারণ স্থানীয় সম্পদের স্বল্পতা। এতদ্ব্যতীত টাস্ক ফোর্স সুপারিশ করিয়াছেন যে (১) পরিকল্পনা ও বাজেট ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাস করা, পরিকল্পনা কমিশন, মন্ত্রণালয় ও এজেন্সীর কাজকর্ম ঢেলে সাজানো, পরিকল্পনা কমিশনকে ম্যাক্রো পরিকল্পনার দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং সেক্টরাল মন্ত্রণালয়কে উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প প্রণয়নে অধিক কার্যকরী ভূমিকা রাখার জন্য শক্তিশালী করা।

(২) **প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনঃ** টাস্ক ফোর্স ১৯৯০ সালের ৬ই আগষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনের ব্যাপারে কতিপয় অসংগতি লক্ষ্য করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দাতা দেশের সংগে কথিত অসংগতি দূরীকরণার্থে একটি সর্বসম্মত সমঝোতায় উপনীত হইবে। (৩) **প্রকল্পের মালামাল সংগ্রহঃ** এই ব্যাপারে টাস্ক ফোর্স বিশ্বব্যাংকের সুপারিশমালা গুরুত্বের সংগে বিবেচনায় আনিতে বলিয়াছেন। (৪) **স্থানীয় ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের স্থানীয় ব্যবস্থাপকদের যখন তখন বদলী না করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া টাস্ক ফোর্স অভিমত প্রকাশ করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ না করাতে প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না বলিয়া মত প্রকাশ করা হয়। যেমন, প্রকল্প বাস্তবায়নে জড়িত কর্মকর্তা যাহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা আছে তাহাদের অবস্থান প্রকল্প এলাকা হইতে অনেক দূরে বিধায় প্রকল্পের কাজ বিঘ্নিত হয় বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

পণ্য সাহায্যঃ টাস্ক ফোর্স পণ্য সাহয্যের ব্যাপারে শিথিল শর্তযুক্ত পণ্য সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়াছে যাহাতে সাহায্যদাতাদের সংগে পণ্য মূল্যের বিষয়ে দর কষাকষির সুযোগ থাকে এবং বেশ কিছু সময়ের জন্য এস ই এম (Secondary Exchange Market) পদ্ধতি চালু রাখার সুপারিশ করিয়াছে। যেহেতু বাংলাদেশে অহরহ পণ্য ঘাটতি দেখা দেয়, সেইহেতু খাতভিত্তিক পণ্য সাহায্যের থোক বরাদ্দের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

খাদ্য সাহায্যঃ টাস্ক ফোর্স খাদ্য সাহায্যের বিষয়ে সিফাড (SIFAD) কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনকে অত্যন্ত উপযোগী বলিয়া অভিহিত করিয়াছে এবং নির্বাচিত সরকার সিফাড প্রতিবেদন বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে একটি উপযুক্ত ইউনিট স্থাপনপূর্বক সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনা কমিশনকে শক্তিশালী করার কথা উল্লেখ করিয়াছে। এই রিপোর্টটির প্রধান বক্তব্য এই যে খাদ্য সাহায্যকে উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্থ বরাদ্দের সহিত সম্পৃক্ত করিয়া ইহাকে উন্নয়নমূখী করা। কতিপয় দাতা সংস্থা বেসরকারী খাতকে অধিকতর খাদ্য আমদানী ও বিতরণের উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে। ইহার প্রেক্ষিতে বর্তমানে মন্ত্রণালয়/অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম আরো বেসরকারী খাতে হস্তান্তরের বিষয়টি নুতন সরকার বিবেচনা করিতে পারে। টাস্ক ফোর্স মনে করে যে খাদ্য সাহায্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ অনুন্নয়ন খাতে ব্যয় না করিয়া গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে অর্থ যোগানের জন্য ব্যয় করা উচিৎ।

কারিগরী সাহায্যঃ টাস্ক ফোর্স এই বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে সরকার গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক কঠোরভাবে কারিগরী সাহায্য ব্যবহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুসারে কারিগরী সাহায্য প্রকল্প পর্য্যালোচনার মাধ্যমে সরকার কারিগরী সাহায্য কর্মসূচী প্রণয়ন করিতে পারেন।

টাস্কফোর্সঃ অর্থ—খাত সংস্কার

নং	নাম	পদবী/সংগঠন	পদ
১।	ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর	অতিরিক্ত সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	আহবায়ক
২।	জনাব লুৎফর রহমান সরকার	ইসলামী ব্যাংক	সদস্য
৩।	জনাব হুমায়ুন হামিদ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক অগ্রণী ব্যাংক	ঐ
৪।	জনাব এ, কোরেশী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিএসআইসিবিলিঃ	ঐ
৫।	কাজী বাহারুল ইসলাম	প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক রূপালী ব্যাংক	ঐ
৬।	জনাব এস,এইচ, চৌধুরী	চেয়ারম্যান স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লিঃ	ঐ
৭।	জনাব এম,এম, নুরুল হক	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিএসআরএস	ঐ
৮।	জনাব এস,আর, কর্মকার	নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশব্যাংক	ঐ
৯।	খন্দকার রুহুল কুদ্দুস	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	ঐ
১০।	জনাব এ,বি,এম, মাহাবুবুল আমিন খান	বিআইবিএম	ঐ
১১।	খন্দকার ইব্রাহীম খালিদ	পিকেএসএফ	ঐ

অর্থ–খাত সংস্কার

১.০ পটভূমি

১·১ ষাটের দশকে অর্থ–খাত বিশেষ করে ব্যাংক–শিল্পের একটি ভিত্তি গড়ে উঠেছিল যদিও সেটা ছিল নগর কেন্দ্রিক। সত্তরের দশকে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ব্যাংক বীমা রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল গ্রামে গঞ্জে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিয়ে সেখানকার স্থানীয় অর্থনীতিকে সচল করে তোলা। অতিদ্রুত ব্যাংকের শাখা সম্প্রসারিত হয়ে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে ব্যাংকের পল্লী শাখার সংখ্যা শহর শাখার সংখ্যাকে বিপুলভাবে ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৭৭ সনে '১০০ কোটি টাকার কৃষিঋণ কর্মসূচীর' মাধ্যমে পল্লী ব্যাংকিং একটি শক্তিশালী কার্যক্রম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে যা পরবর্তীতে দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত হতে থাকে। কিন্তু আশির দশকে গিয়ে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। বিরাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাংকগুলো পল্লী শাখা কৃষি ব্যাংকের কাছে হস্তান্তর করে দেয় এবং সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিখাতের ব্যাংকগুলো পল্লী ব্যাংকিং–এ উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলোর ওপর প্রভাবশালী মহলের অস্বাভাবিক চাপ ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমকে অবাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করে। বিশেষ করে শিল্প ঋণের নামে উদ্যোগবিহীন এবং প্রভাবশালী মহলের ছত্র ছায়ায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের অতি নমনীয় শর্তে ঋণদান বৃদ্ধির ফলে, ফিনান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন প্রক্রিয়া থমকে যাওয়ার উপক্রম হয়। এছাড়াও ব্যাংকের প্রশাসনিক ও পরিচালনা বিষয়ে কর্মচারী ইউনিয়নসহ অন্যান্য মহলের বিরূপ প্রভাব ব্যাংকগুলোকে এক অসহায় অবস্থায় ফেলে দেয়।

১·২ এসব সহ অর্থ–খাতের সমস্যাদি পর্যালেচনা করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে টাস্ক ফোর্সের প্রতিবেদনে সুপারিশ রাখা হয়েছে। সার–সংক্ষেপে শুধুমাত্র কয়েকটি মৌলিক ও বিশেষ ধরনের সমস্যা ও সুপারিশের উল্লেখ করা হবে। প্রতিবেদনের যষ্ঠ অধ্যায়ে সুপারিশ–সংক্ষেপ রয়েছে–যেখানে প্রায় সবগুলো সুপারিশ সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

১·৩ প্রতিবেদনে চারটি সমস্যা–সংকুল দিক নির্দেশিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে (ক) আইন ও বিধিগত সমস্যাদি (খ) সদ্য–প্রবর্তিত ফিনান্সিয়াল সেক্টর রিফর্মের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও অবস্থা (গ) আর্থিক শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনা এবং (ঘ) অর্থবাজার এবং সিকিউরিটি বাজার সম্প্রসারণ।

১·৪ টাস্ক ফোর্স সর্বসম্মতিক্রমে মনে করে যে, অর্থনৈতিক বিশৃংখলাই ব্যাংক তথা অর্থ–খাতের মূল সমস্যা। অন্যান্য সমস্যাগুলো কতকটা বিশৃংখলারই প্রতিক্রিয়া। তবে বহু পুরাতন এবং সংস্কারবিহীন কিছু আইন ও বিধিমালার পরিবর্তন, পরিমার্জন ও নতুন ধারা/বিধির সংযোজন শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখবে।

২.০ অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা

২·১ ব্যাংকিংখাতে গড়ে ওঠা বিশৃংখলার কয়েকটি বিশেষ দিক হলো (ক) নির্দেশিত হয়ে ঋণ প্রদান (খ) সেক্টর কর্পোরেশন তথা সরকারী খাতে ঋণদানে সাধারণ নিয়মকানুন পাশ কাটিয়ে চলা (গ) বিশেষ করে আশির দশকে সরকারের প্রভাবশালী মহলের চাপে ব্যক্তিবিশেষদেরকে ঋণ প্রদান (ঘ) কর্মচারী ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়নসহ প্রভাবশালী মহলের প্রভাব বিস্তার (ঙ) ঋণ পরিশোধে গ্রহীতাদের ব্যাপক অনীহা ইত্যাদি।

২·২ এসব বিশৃংখলারোধের অন্যতম উপায়সমূহ হবে–(ক) ব্যাংকিং রীতি–পদ্ধতি প্রবর্তনে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে ব্যাংকগুলোর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং শিল্প–মন্ত্রণালয়সহ অন্য কোন মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার প্রবণতা রোধ করা (খ) শিল্প মন্ত্রণালয়

কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া ঋণঃ সমমূলধন হার (৮০ঃ২০), কোলেটারাল ও মার্জিন সংক্রান্ত বিধিমালা প্রত্যাহার এবং ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের নিরিখে এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির নিয়মে ঋণের শর্তাবলী নির্ণয়ে ব্যাংক ও গ্রাহককে সুযোগ প্রদান (গ) ঢালাওভাবে শিল্পঋণের সুদ বা ঋণ মওকুফ করে যে বিশৃংখলা তথা দুর্নীতির জন্ম দেয়া হয়েছে, তা অবিলম্বে গ্রহণযোগ্য শৃংখলার মধ্যে ফিরিয়ে আনা এবং শিল্পব্যাংকের বহুল আলোচিত ১০০ কোটি টাকা মওকুফ সহ অন্যান্য বড় অংকের মওকুফের বিষয়ে তদন্ত অনুষ্ঠান (ঘ) কোন ব্যাংকের ডিফল্টারকে অন্য কোন ব্যাংক থেকে ঋণ না দেবার সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহন (ঙ) ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি রাখার যে ব্যবস্থা পূর্বে ছিল, তা পুনঃপ্রবর্তন (চ) ঋণ আদায় ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান (ছ) সেক্টর কর্পোরেশন তথা সরকারী খাতের ঋণগ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধের জন্য সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ (জ) বস্ত্রকারখানার সুদ মওকুফ ও পাটকলের ঋণ সেগ্রিগেশন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পুনঃবিবেচনা (ঝ) ঋণ-সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মকর্তাদের দুর্নীতি সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহন ইত্যাদি।

২·৩ দেশীয় সঞ্চয় আহরণে, ব্যাংকগুলো যে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে বিগত কয়েক বছরে প্রবর্তিত কিছু বিধি। সঞ্চয়-সুদের উপর ১০% কর, ৪% লেভি, হিসাব প্রতি ১০ বা ১০০ কর্তন, চেক-প্রতি ১ ডিউটি এবং ঋণের উপর ১% উন্নয়ন সারচার্জ ব্যাংকিং কার্যক্রমে জনগণকে নিরুৎসাহিত করছে। পৃথিবীর কোন দেশে ব্যাংক-হিসাবের উপর এ ধরণের ব্যাপক ও বিবিধ করারোপের নজির নাই। দেশের অতি প্রয়োজনীয় সঞ্চয় আহরণের স্বার্থে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন।

২·৪ সুবৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দক্ষ ও মেধাসম্পন্ন কর্মকর্তা প্রয়োজন। এ প্রয়োজনে সহায়তার উদ্দেশ্যে সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও তদুর্ধ কর্মকর্তা শুধুমাত্র মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ এবং উপযুক্ত বেতন-ভাতাদি প্রদানের সুবিধার্থে ব্যাংকিংখাতে পৃথক বেতন-স্কেল প্রবর্তনের বিষয়েও চিন্তা করা যায়। পদোন্নতির নিয়মাবলী এমনভাবে পুনঃনির্ধারিত করা উচিত যাতে যোগ্য প্রার্থীই পদোন্নতি পায়। এছাড়া প্রশিক্ষণের উপর ও সবিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন।

২·৫ হিসাব খোলার সময় ফটো প্রদানের নতুন নিয়ম সকলকে বিশেষ করে গ্রামীণ গ্রাহককে দ্বিধান্বিত ও শংকিত করেছে। তাছাড়া ক্ষুদ্র সঞ্চয়ীর জন্য ফটো তোলা একটি অতিরিক্ত খরচা বিশেষ সঞ্চয় আহরণের স্বার্থে এই নিয়ম বিলোপ করা উচিৎ। উল্লেখ্য এ নিয়ম পূর্বে ছিল না এবং এটা অতি সাম্প্রতিক।

২·৬ কর্মচারী-ইউনিয়ন শক্তিশালী অথচ সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং তা দৃঢ়ভাবে রক্ষা করা প্রয়োজন। তাদের চিহ্নিত কর্মক্ষেত্রের বাইরে প্রভাব বিস্তার রোধ সবিশেষ প্রয়োজন। ঋণ মঞ্জুরীতে তদ্বির, কর্মচারীর বদলীতে বাধা প্রদান, নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ-এসব কাজ দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করে তাদের নিজস্ব কর্ম পরিমন্ডলে শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করতে হবে। এজন্য একটি 'কোড অব কনডাক্ট' প্রণয়ন করা যেতে পারে।

২·৭ রুগ্নশিল্প পুনর্বাসনে ঢালাও ঋণপ্রদান করলে জাতীয় সঞ্চয়ের বিপুল অবক্ষয় ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব রুগ্নশিল্প পুনর্বাসনে অত্যন্ত সুচিন্তিত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। টাস্ক-ফোর্সের মতে শুধুমাত্র ঐসব রুগ্নশিল্প পুনর্বাসনে ঋণদান যুক্তিসঙ্গত হবে, যে সব ক্ষেত্রে রুগ্নশিল্পের সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। অর্থাৎ মালিকবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা শ্রমিক এবং ঋণদাতা সকলেই অর্থ-শ্রম বিনিয়োগ করে নিজ নিজ অবদান রাখবেন। এই পদ্ধতি যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক কোডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ১৯৮৪ সনের ভারতীয় রুগ্নশিল্প পুনর্বাসন বিধির অনুরূপ।

২·৮ শিল্প ব্যাংক ও শিল্পঋণ সংস্থা অর্থ মন্ত্রণালয়ভুক্ত। আশির দশকের শেষভাগে এক অলিখিত নিয়মে শিল্প সচিবকে পদাধিকার বলে উক্ত ব্যাংক ও সংস্থার পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান নিযুক্তি দ্বৈত প্রশাসনের জন্ম দিয়েছে এবং এতে অনিয়মও বৃদ্ধি পেয়েছে যা তদন্ত করলে প্রতিভাত হবে। এই নিয়ম পরিহার করা যেতে পারে।

৩.০ আইন ও বিধি

৩·১ ব্যাংকিং সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহ পুরাতন। সম্প্রতি ব্যাংকিং কোম্পানী আইন সংস্কার করা হয়েছে। এটা একধাপ অগ্রগতি। তবে আরো কিছু আইন ও বিধি প্রণয়ন বা সংশোধন প্রয়োজন যা টাস্ক ফোর্স প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম অংশে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বিশেষ কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হলো।

৩·২ বাংলাদেশ পেনাল কোডের ৪১৯ ধারা সংশোধন করে হিসাবে টাকার ব্যবস্থা না করে চেক ইস্যু করা এবং উক্ত চেক অপরিশোধিতভাবে ফেরৎ হবার ঘটনাকে প্রতারণা হিসাবে গণ্য করে উক্তরূপ প্রতারণার জন্য জরিমানা সহ বা ব্যতিরেকে তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ডের বিধান রাখা যেতে পারে।

৩·৩ ব্যাংকিং লেনদেনের জন্য মর্টগেজ দলিল করা হলে, নিবন্ধীকরণ চার্জ বজায় রেখে ষ্টাম্প ডিউটি তুলে নেয়া যেতে পারে। ষ্টাম্প ডিউটি পূর্বে ছিল না।

৩·৪ পল্লী ঋণের সুবিধার্থে উপজেলা পর্যায়ে ইকুইটেবল মর্টগেজ স্থাপন করার বিধান রাখা উচিৎ। বর্তমানে এই সুবিধা শুধু পৌর এলাকায় সীমাবদ্ধ।

৩·৫ মর্টগেজ যেহেতু বিক্রয় নয় এবং ব্যাংক-ঋণের জন্য আবশ্যক, সে কারণে মর্টগেজ রেজিষ্ট্রী করার সময় আয়কর ছাড়পত্র (টিপি) প্রদানের বিধান রহিত করা যেতে পারে। ঋণ পদ্ধতি সহজিকরণের জন্য এ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

৩·৬ সদ্য প্রতিষ্ঠিত অর্থঋণ আদালত সকল জেলায় স্থাপন করা উচিৎ এবং ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বাণিজ্যিক শহরে মামলা সংখ্যার ভিত্তিতে একাধিক আদালতের সংখ্যা নির্ণিত হতে পারে।

৩·৭ ব্যাংকঋণ ডিফল্টারবৃন্দ স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন না। এই বিধি অন্যান্য জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হতে পারে।

৩·৮ বীমা কোম্পানীর পরিচালনা ও তদারকীর দায়িত্ব অর্থ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত হতে পারে। কারণ বীমা মূলতঃ একটি সঞ্চয় প্রকল্প। ব্যাংক ও বীমা একই মন্ত্রণালয়ে থাকার সুবিধা রয়েছে।

৩·৯ দেশে কয়েকটি ব্যাংক ইসলামী নীতিমালায় চলছে-যেগুলো পরিচালনার জন্য কোন বিধি নাই। মালয়েশিয়ার মত বাংলাদেশেও ইসলামী ব্যাংকিং রীতি-পদ্ধতি সম্বলিত একটি আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

৩·১০ ব্যাংকিং কোম্পানীসমূহের আয়কর হার সর্বোচ্চ ৪৫% এ সীমাবদ্ধ রাখা যুক্তিসঙ্গত।

৩·১১ বর্তমানে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ব্যাংকের অনেক কাজ চলছে। কিন্তু এগুলোর জন্য কোন আইনগত বিধান নাই। এভিডেন্স হিসাবে চিহ্নিত হওয়াসহ আইনগত মর্যাদা লাভের জন্য এইসব আধুনিক পদ্ধতিসমূহের জন্য বিধান প্রণীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪.০ অর্থ খাত সংস্কার

৪·১ বিশ্ব ব্যাংকের সমীক্ষান্তে সদ্য প্রবর্তিত "অর্থ খাত সংস্কার" সমূহ বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে। এর ফলে ৩১/১২/৮৯ পর্যন্ত সকল ব্যাংকের মোট ঋণের ২৭% অনাদায়যোগ্য বা "ক্লাসিফায়েড" ঋণ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকে এই হার ২৯% এবং দেশীয় ব্যক্তিখাতের ব্যাংকে এই হার ২৫%। উভয়ক্ষেত্রেই এই হার অতি উদ্বেগজনক। অনাদায়যোগ্য ঋণের জন্য যে প্রভিশন রাখা হয়, উক্ত প্রভিশনের হার ১৩% (রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের ১৪%-এবং প্রাইভেট ব্যাংকে ১২%)। শিল্পব্যাংকে প্রভিশনের হার ৪১%-যা আতঙ্কজনক।

৪·২ সংস্কার বিধিমালা অত্যন্ত কঠোর বলে টাস্ক ফোর্স মনে করেন। অনাদায়যোগ্য ঋণের জন্য যথাযোগ্য প্রভিশন করার পরও অতিরিক্ত ১% সাধারণ প্রভিশনের বিধান রয়েছে–এই অতিরিক্ত প্রভিশন আদায়যোগ্য এবং সুপরিচালিত ঋণের উপর পড়ছে। অতএব অতিরিক্ত ১% সাধারণ প্রভিশন তুলে নেয়া যায় কিনা তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

৪·৩ কিছু কিছু ঋণ সিকিউরিটি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যথেষ্ট গ্রহনযোগ্য। সেগুলোকে উৎসাহ দেয়া উচিৎ, যাতে করে ঐসব সিকিউরিটির বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ ক্লাসিফাই না করা হয়।

৫.০ অর্থবাজার ও সিকিউরিটি বাজার সম্প্রসারণ

৫·১ বিশ্বের অর্থবাজারে প্রবেশের উদ্যোগ হিসাবে "বাংলা ফান্ড" নামে একটি কনভার্টেবল্ কারেন্সী ফান্ড সৃষ্টি করা যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে ৫ কোটি মার্কিন ডলারের এই ফান্ড নিউইয়র্ক ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। ফান্ডটি "ইন্ডিয়া–ম্যাগনাম ফান্ড" বা "ইন্ডিয়া ফান্ড" ধাঁচের হতে পারে। ফান্ডের শেয়ার ওয়াল ষ্ট্রিটের কোন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক 'আন্ডার–রাইট' করার উদ্যোগ নেয়া যেতেপারে।

৫·২ ঢাকা ও চট্টগ্রামে "মানি–চেঞ্জার" বা 'অর্থ বদলীকারক' সংস্থার কার্যক্রম উৎসাহিত করা যেতে পারে।

৫·৩ ব্যাংক ও আর্থিক সংস্থাগুলোর প্রকল্প মূল্যায়নে তথ্য ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিখাতে "ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি" স্থাপন করা যেতে পারে।

৫·৪ রাজউক, টিএন্ডটি বোর্ড প্রভৃতি সংস্থা বাজারে বন্ড ছেড়ে মূলধন বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে পারে। এতে অর্থবাজার সৃষ্টিতে যেমন সহায়তা করা হবে, তেমনি সংস্থাগুলোতেও বাজারমুখী হয়ে গড়ে ওঠার প্রবণতাবৃদ্ধিপাবে।

৫·৫ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি 'সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ বোর্ড' গঠন করা যেতে পারে। এর কাজ হবে (ক) তালিকাভুক্ত কোম্পানীসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধায়ক–সহায়তা প্রদান (খ) রেজিষ্ট্রেশন প্রতিবেদন এবং অন্যান্য প্রতিবেদন পরীক্ষা (গ) সিকিউরিটি বাজারের মধ্যস্থতাকারীদের তদারকী ইত্যাদি।

৫·৬ ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে। একে নির্দিষ্ট গন্ডি থেকে বের করে বৃহত্তর ও স্বচ্ছ পরিবেশে কাজ করার উপযোগী করতে হবে।

৫·৭ শেয়ার বন্টনে সময়ক্ষেপন, ওভার সাবসক্রিপশনের ক্ষেত্রে অর্থ ফেরৎ প্রদানে বিলম্ব, ডিভিডেন্ড প্রদানে বিলম্ব প্রভৃতি রোধ করার জন্য "কন্ট্রোলার অব ক্যাপিটাল ইস্যু" এর অফিসকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেহবে।

৫·৮ সিকিউরিটি বাজারে চাহিদা সৃষ্টির পদক্ষেপ হিসাবে আয়করের ক্ষেত্রে 'বিনিয়োগ অব্যাহতির' পরিমাণ আয়ের ৫০% (সর্বাধিক ৭৫,০০০ টাকা) নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৫·৯ পল্লী এলাকায় আর্থিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র বিমোচনের জন্য গ্রামীণ ব্যাংককে যথাযোগ্য সাহায্য সহযোগীতা প্রদান করা উচিৎ। এর সম্প্রসারণ অথবা একই ধাঁচে অন্যান্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া উচিৎ। গ্রাম বাংলার অর্থনীতিতে এর সুফল প্রভাব আশা করা যায়।

৬.০ উপসংহার

৬·১ বাংলাদেশে একটি স্বচ্ছ (ট্রান্সপারেন্ট), সুষ্ঠু এবং বাজারভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে ব্যাংক তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিগত স্বৈরশাসনের আমলে প্রভাব দিয়ে স্বচ্ছতাকে ক্ষুন্ন করা হয়েছিল, বিপরীতধর্মী নিয়ম–কানুন দ্বারা মুক্তবাজার অর্থনীতিকে বিকৃত করা হয়েছিল এবং অনেকক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রসার ঘটেছিল অবারিতভাবে।

৬·২ টাস্ক ফোর্সের সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটির বিস্তারিত পর্যালোচনা করে সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত করা হলে স্বচ্ছতা পুনরুদ্ধারে সহায়ক হবে, বাজার অর্থনীতি নিজস্ব নিয়ম ও গতিতে চলতে শুরু করবে এবং দুর্নীতি অপসারনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। একটি সৎ দক্ষ ও বলিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এ জন্য অপরিহার্য্য। একটি গণতান্ত্রিক সরকার কাংখিত প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে টাস্ক ফোর্স মনে করে।

বাঃসঃমুঃ-৯০/৯১-৬২১৮ কম—১,১০০ বই।